বাজে লেখা

বাজে লেখা

গোপাল হালদার

পুথিঘর
২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্তী

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

'সূচীপত্র' লেখাটি বিশ্বভারতী পত্রিকায়, 'বাজে লেখা' শনিবারের চিঠিতে, 'কোদালি ও কলম' ('অর্কিড' নামে) আনন্দবাজার পত্রিকা দোলসংখ্যায় আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সব কয়টি লেখারই সংবন্ধে অন্যান্য কথা গ্রন্থমধ্যেই বলা হয়েছে।

লেখ-সূচী

'সূচীপত্র'।

৩

সূচীপত্র

প্রশ্নটা পুরোনো—লেখা কি, আর কিইবা লেখা নয়। এত পুরোনো যে, মহর্ষি বাল্মীকি নাকি প্রথম ছন্দ আবৃত্তি করেই চম্‌কে উঠেছিলেন,—তাই তো, এ আমি কি বল্‌লাম? বোধ হয় উত্তরাকাণ্ড শেষ করেও তিনি তার উত্তর পান নি—এ আমি কি বললাম? লেখকের দিক থেকে এই প্রশ্ন তাই বরাবর চলে এসেছে। কিন্তু অলেখকের দিক থেকেও কি প্রশ্নটা তখন থেকেই ওঠে নি—কেন আমার লেখা বাজে লেখা হল? আর সেই প্রশ্নটাও শুধু কি অলেখকেরই? হাজার হাজার শ্লোক লিখতে লিখতে মহর্ষি বাল্মীকিও কি এক একবার চমকে ওঠেন নি—তাইতো, এ আমি কি বাজে কথা বল্‌ছি? প্রশ্নটা তখন থেকেই উঠেছে—খুব পুরোনো প্রশ্ন। বোধ হয় ওর মীমাংসা নেই;—শুধু সময়মতো এক একটা উত্তর মিলে। তাতে লেখাও থেমে থাকে নি, বাজে লেখাও বহরে কমে নি। মানুষের পৃথিবীর রূপান্তর ঘট্‌ছে, নতুন ভাব মানুষের জুটেছে, নতুন কথা ফুটেছে, নতুন রূপ উঠেছে লেখায় ফুটে—এইতো মানুষের মনের একটা দিকের ইতিহাস। সঙ্গে সঙ্গে মানুষও নতুন করে ভেবেছে—তাই তো লেখা তা হলে কি? কেনই বা তা কখনো ফোটে, আর কখনো না ফুটতেই ঝরে যায়? এক যুগ যা উত্তর দিয়েছে, তা সে যুগের মতো করেই সে দিয়েছে; তা মিথ্যাও নয়। কিন্তু আর যুগের লেখা এল নতুন স্বাক্ষর লয়ে; পুরোনো উত্তরে তখন আর কুলোয় না। নতুন করে সে যুগ বস্‌ল তার উত্তর খুঁজ্‌তে। একটা উত্তর পেলও। পুরোনোর পুঁজি তাতে বেড়েই গেল—ফাঁকা হয়ে গেল না। কিন্তু তার পরে আবার আরো নতুন যুগ এল, নতুন কথা ফুটল; আবার

প্রশ্নটারও উত্তর তেমনি নতুন থেকে নতুনতর হয়ে চল্‌ল। পুরোনো বলে কোনো উত্তর মিথ্যা নয়, আর নতুন বলেও কোনো উত্তর শেষ কথা নয়। জীবন এগিয়ে চল্‌ছে, তার সাহচর্য রক্ষা করছে লেখা, তাই নাম তার সাহিত্য। এক এক নতুন কোঠায় জীবন পা দেয়; সাহিত্যেরও এক একটা নতুন রূপ দেখা দেয়। নতুন যুগের নতুন লেখা নিয়ে বিচারকরা বসে করেন বিচার,—একি লেখা না বাজে লেখা? কিন্তু লেখা হলে নতুন দেশের নতুন রূপকে তার আগে সহজেই স্বীকার করে নেয় জীবন-রসের রসিকেরা।

বিচারের পথে আলোকের অভাব নেই—পায়ে পায়ে নজির। হয়ত অত আলোয় চোখে ধাঁধাঁ লাগে—আলোচনাই আলোক-ধাঁধা হয়ে ওঠে,—তবু বিচারের দাম আছে।

সূচীতেই বলা দরকার—ওরূপ বিচারের ধার দিয়েও আমি এখানে যাইনি—পুরোনো নতুন কোনো আলোকের চিহ্ন এই বইতে নেই। তার জন্যে জানা দরকার এ বইএর সূচনা-কাল ও রচনা-কারণ।

আমরা তখন নিরালোক দেশের অধিবাসী। সেখানে সত্যই সূর্যও ওঠে কম, মেঘে থাকৃত আকাশ ঢাকা; আর বইএর আলো ঢুকৃত আরও সাবধানে। সেখানে লিখতে বসে আমি দেখলাম—যা লিখ্‌তে চাই তা লিখে উঠ্‌তে পারলাম না। সহজ কথা, খুব পরিষ্কার একটা কথা—কিন্তু লেখায় তা ফুটল না, হল 'বাজে কথা'। 'এ আমি কি বল্‌লাম?'—বাল্মীকির এ বিস্ময় আমার মনে এল না; এল এই জিজ্ঞাসা—কেন এ আমি বল্‌তে পারলাম না? প্রশ্ন আলোচনা রূপে দেখা দিল না—রইল আলাপ হয়ে। শুরু হয়েছিল তা ১৯৩৩এ বক্‌সার পাহাড়ে, আর চল্‌ল

তা ১৯৩৫এ আলীপুরের প্রেসিডেন্সি জেলেও। কখনো সে নিজের সঙ্গে নিজে আলাপ জুড়ে দিয়েছে, আর কখনো তার সেই আলাপের উপলক্ষ্য জুগিয়েছেন সেখানকার বন্ধু আর সতীর্থবা। কিন্তু মন ইচ্ছামত বয়ে চলেছে,—উপল কুড়োতে চায়নি। বইএর আলো না খুঁজে মন বয়ে চলছে আপনার নিয়মে, আপনার রীতিতে, আপনার গতিতে। আমিও তাতে বাধা দিই নি। তাই এ কয় পাতায় তার আঁকা বাঁকা গতিই বরাবর রয়েছে —তার লক্ষ্য নেই, আছে উপলক্ষ্য। এই সূচনার কথা মনে রাখলে এ লেখার রূপরীতি বোঝা যায়। কারণ, আমার কলম অনুসরণ করেছে মনের ধারা, যুক্তির ধারায় তা চলে নি। আলাপ logical নয়, psychological. তা ছাড়া, আমি আপনার সঙ্গেই আলাপ করেছি, রসিকদের সঙ্গে আলোচনা করবার কথাও ভাবিনি। এ লেখা প্রায় সবত্রই স্বগতোক্তি। সে আলাপ যে তাই বলে একেবারেই একান্ত ছিল, তাও নয়। তখনো আমি তা ভাবি নি, আজও ভাবি না। আমার মনে কত জানা-অজানার ঢেউ লেগেছে তার ঠিকানা নেই। তার মধ্যে বিলিতি লেখক আছেন, দেশী লেখকও কি নেই? তবে এই কথা বোধহয় ঠিক, প্রভাব যতই যার থাক্ এ লেখাগুলো চলেছিল আপনার স্বভাবে। অবশ্য স্বভাবের কতটা স্ব, কতটা পর, বলা শক্ত। তবে তা স্বভাব, আর তার রীতি স্বগতোক্তির। এর পদ্ধতি একান্তে আলাপের, সভায় আলোচনার পদ্ধতি এতে নেই। এই সূচনা-পত্রে তার কারণ নির্দেশের জন্য বলতে হল—এই লেখার সূচনা কিরূপে, আর এ লেখার রূপই বা কি।

কিন্তু কথা হল—যা স্বগতোক্তি তা পরিবেশের জন্য নয়, তাকে তবে প্রকাশ্যে পরিবেশন করা কেন? এই দ্বিধা আমারও মনে জেগেছিল। কাব্য-জিজ্ঞাসার পদ্ধতি এরূপ নয়, কাব্য-বিচার যুক্তি ও বিশ্লেষণের পথেই

করা প্রয়োজন, তার রীতি নৈর্ব্যক্তিক। সেখানে বিষয়টাই সব, আর তাই লেখককে দূরে রাখতে হয়। আমার মন কিন্তু লেখা থেকে লেখককে দূরে রেখে বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হয় নি। তার ফলে সে অনেক পাক খেয়েছে। তারপর, সেদিন সে ছিল ত্রিশোর্ধ্বে, আজ সে চল্লিশোর্ধ্বে চলেছে; আর ইতিমধ্যে আপনার গতিপথেই পুরোনো প্রশ্নের একটা উত্তর সে আবিষ্কার করেও ফেলেছে (কেউ ইচ্ছা করলে তাব মূল কথা দেখতে পাবেন 'সংস্কৃতির রূপান্তরের' 'নূতন সাহিত্যে', কিংবা তারও আগেকার একটি ইংরেজী প্রবন্ধে)। এ জায়গায় আমি পৌঁছুচ্ছি যখন, তখন আমার কাছে মন ও বস্তুর সক্রিয় সংবন্ধের কথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখ্‌ছি, বস্তুকে চিনেই মন আপনাকে চিন্‌ছে, আর আপনাকে যেমনি চিন্‌ছে অমনি আরও বেশি চিন্‌ছে বস্তুকে। এ ভাবেই মনের এলেকা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃতির রাজ্যে মানব প্রকৃতি করছে স্বরাজ-সাধনা। কিন্তু এ জায়গায় পৌঁছলাম যে পথে তা শুধু যুক্তির নয়, তা জীবনেরও পথ। সেই পথেরই একটা আধ-দেখা পুরোনো নিশানা রয়েছে এই সব লেখায়,—এ হিসাবেই তাদের যা কিছু দাম। নইলে এতে ধারাবাহিক আলোচনা নেই, একটা সুসংবদ্ধ কাব্য-জিজ্ঞাসা নেই, এমন কি কোনো উত্তরই নেই সেই পুরোনো প্রশ্নের—লেখা কি, কেন লেখা হয় বাজে লেখা। সেদিক থেকে আশ্চর্য দিগদর্শনী কড্‌ওয়েলের লেখা। এ বই ছাপ্‌তে দিতে দিতে আমি তা পড়ি। তাতে আমি বুঝেছি—আমার ১৯৩৩—'৩৫এর ভাবনাকে ঢেলে সাজিয়ে আর লাভ নেই—এগুলো পথের পুঁজি হিসাবেই দেখবার। তাই, পুরোনো লেখার গায়ে আমি আর নতুন করে সে ভাবে কলম ছোঁয়াতেও চাই নি। এ লেখা হচ্ছে পথ-চলতি পায়ের রেখা, তেমনি রইল তার দাগ—যে পথের লক্ষ্য ছিল না, পরিকল্পনাও মনে ছিলনা; মনে ছিল আবছা কল্পনা আর জল্পনা।

সূচনা-পত্রে এই কথাটিও আমার বলবার ছিল। সাহিত্য বিচারেও মানুষের নিজের পরিবেশের কিংবা তার যুগধর্মের মূল্যটা সামান্য নয় বলেই একথা বলা। তাই বলবার ছিল—এ যুগের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা এ যুগের মতো করেই ভাবতে বসেছে সাহিত্য কি, কিই বা সাহিত্য নয়। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, পুরোনো যুগের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা বা সে উত্তর সব বাতিল হয়ে গিয়েছে। রসাত্মক বাক্য যে কাব্য এ কথা কি মিথ্যা? না, মিথ্যা অ্যারিষ্টোটলের কথা যে, 'সাহিত্য অনুকৃতি'? কিংবা এই সেদিনকার ম্যাথু আর্নল্ডের কথা যে, সাহিত্য 'জীবনের ব্যাখ্যা'? এ সব কথা বাতিল হয় নি। কিন্তু তার পরেও অনেক যুগ গিয়েছে—অনেক লেখা লেখা হয়েছে, অনেক লেখা ঝরে গিয়েছে। কারণ, জীবযাত্রার রূপান্তর ঘটেছে, জীবনে অনেক জটিলতা জুটেছে, অনেক বিচিত্রতা ফুটেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও কত নতুন রূপ এসেছে, কত নতুন ভঙ্গি দেখা দিয়েছে। এই ঐতিহাসিক বোধই আজ আমাদের চোখে জীবন ও জগৎকে পর্যন্ত নতুন করে তুলেছে। তাই, আজ এ যুগে আমরা রসের ও জীবন রসের নিবিড়তর সংবন্ধ বিষয়ে সচেতন হয়েছি। যে অর্থে পুরোনো মনস্বীরা সাহিত্যকে অনুকৃতি বলেছেন তা আর আমাদের কাছে যথেষ্ট মনে হয় না। 'জীবনের ব্যাখ্যা' বললে যেন আমরা অনেকটা বলতে পারি নি, মনে হয়। আমরা দেখছি—সাহিত্যকে সৃষ্টি হিসাবে; দেখছি তাকে মানুষের সৃষ্টিশীলতার পরিচয় হিসাবে; দেখছি তাতে সৃষ্টির স্বাক্ষর আবার সৃষ্টির প্রেরণাও। এ যুগের সাহিত্য-জিজ্ঞাসার এইটিই গোড়ার কথা।

সূচনা-পত্রে এই কথাটিও আমার জানানো দরকার ছিল।

কিন্তু এ যুগের কাব্য-জিজ্ঞাসা যদি কেউ বুঝতে চান তবে তাঁর পক্ষে কডওয়েলের 'Illusion and Reality' ('কল্পনা ও বাস্তব') হবে

প্রধান দিগ্‌দর্শনী। আরও বই নিশ্চয়ই আছে—জিজ্ঞাসুর অভাব নেই, কডওয়েলের সহযাত্রী র‍্যাল্‌ফ ফক্‌সের 'Novel and the People', ('উপন্যাস ও জনগণ') এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিবোধে শুনেছি সমৃদ্ধ, তেমনি উজ্জ্বল আলোচনা। দেশী বিলিতি অনেক শিল্পী আর রসিকও আছেন—রবীন্দ্রনাথ থেকে রিচার্ড্‌স্ পর্যন্ত। তাঁরা অনেক দিকে এ যুগের বিচিত্র চিন্তার আলোকপাতও করবেন। কিন্তু এ ঐতিহাসিক বোধ তাঁদের সকলের মধ্যে স্পষ্ট নয়। জীবনের বিকাশের ধারার সঙ্গে সাহিত্যের ধারা মিলিয়ে তাঁরা অনেকেই দেখেন নি, দেখেননি এর বিকাশশীলতা, সৃষ্টির ধর্ম, এই জঙ্গমতা। তাই কড্‌ওয়েল প্রভৃতিদের দৃষ্টিকে মূল্য দিতে হয়—এই নতুন দৃষ্টির জন্য। কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা বোধহয় এই যে, এ যুগের কাব্য-জিজ্ঞাসা সত্য করে বুঝতে হলে এ যুগের জীবন-জিজ্ঞাসাই বুঝতে হয়, হয়ত সব যুগেই তা সত্যি করে বুঝতে হয় জীবনের সাক্ষ্য থেকে—স্যর ফিলিপ সিড্‌নীর মতো, কিংবা কডওয়েলের ও র‍্যালফ্ ফক্‌সের মতো।

সাহিত্য যে জীবন-জিজ্ঞাসা একথা মানতে অনেকেরই বাধে না। কিন্তু সবাই যে তা মানে তাও নয়। যারা মানে না, তাদের মধ্যে প্রধান এক দল হলেন তাঁরা, যাঁরা বলেন—'আর্টের জন্যই আর্ট', art for art's sake. আমাদের দেশে এই মত খুব জোর করে কেউ বলেন নি, কিন্তু কার্যত তবু অনেকেই এই মত মতো চলেন, এর প্রতিধ্বনিও তোলেন ; বলেন,—'আমরা আর্টিষ্ট। আমাদের দায়িত্ব আর্টের কাছে (দ্রষ্টব্য 'সাহিত্যের স্বরাজ')। তাই, আর্টের চাই স্বরাজ, রাষ্ট্রিকের কিংবা নীতিবিদের ফরমায়েসে চলবেন।

কলম।' কিংবা তারপরে বল্‌বেন—রসের প্রমাণ রস, তা 'সহৃদয় হৃদয়বেদ্য।' আবার ওই 'আর্টের জন্য আর্ট' এই যুক্তি থেকেই কেউ বল্‌বেন—আর্ট হচ্ছে রূপসৃষ্টি ; মানে, তাঁরা রূপকর্মের বা formএর কারুকর্মের উপর জোর দেবেন। আবার, 'রসের প্রমাণ রস', এই থেকেই কেউ উল্টো বল্‌বেন—রস হচ্ছে শব্দ, ধ্বনি প্রভৃতির ইন্দ্রিয়জ প্রতিক্রিয়া। এ ভাবে এক 'আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্' এই মত থেকে কেউ হন ইন্দ্রিয়বাদী, কেউ অতীন্দ্রিয়-বাদী, কেউ প্রায় রূপবাদী আলংকারিক, কেউ আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদী। এসব কথা যে মিথ্যা তা নয়, তবে আধা সত্য। তাই এগুলো মারাত্মক সত্য, এবং মারাত্মক মিথ্যাও। বিলাতে কিন্তু আর্টের এই ব্রহ্মবাদ বা অদ্বৈতবাদ খুবই জোর গলায় এক সময়ে নিজেকে জাহির করেছিল। সে মতবাদের রঙচঙে ঝুমঝুমি আমরাও দেখেছি, পেয়ে খুব খুশীও হয়েছিলাম ; অস্কার ওয়াইল্‌ডের চুপড়িতে তা ছিল। ওদের পক্ষে সেদিন ওরূপ মতবাদ তৈরী করা খুবই স্বাভাবিক হয়েছিল। সেটা ও শতাব্দীর শেষ, এ শতাব্দীর আরম্ভ।—ডাক্তার বাজে লোকের কথা শোনেন না, মিস্ত্রী বাইরের কথায় কান দেয় না—লেখকরাই বা দেবেন কেন? অন্য মানুষ কি জানে লেখার রহস্য? তারা ভিড়ের মানুষ ; চায় হাসি তামাসা খেলা উত্তেজনা। অতএব, লেখক জনতার ঊর্ধ্বে থাক্‌তে চাইবেন বৈকি—তিনিই জানেন সৃষ্টি কি রহস্য। আর্টের রাজ্য রসিকের রাজ্য ; তা জনতা থেকে দূরে, দশ জনের পৃথিবী তা নয়। তার নিয়ম-কানুনও আলাদা। যেমন ডাক্তারীর আছে বিশেষ টেক্‌নিক্, মিস্ত্রীরও আছে বিশেষ টেক্‌নিক্, তেমনি শিল্পেরও নিজস্ব টেক্‌নিক্ আছে বৈকি।—এই মতবাদ থেকে এখনি দেখেছি দুটো ধারা দেখা দেয়—এক দল যারা মনে করে আর্ট হচ্ছে জনতার ঊর্ধ্বে, জীবনের ঊর্ধ্বে—তার রহস্য

একমাত্র রসিক জানেন, মানে আর্টিষ্টই জানেন। অর্থাৎ তাঁর একান্ত রসানুভূতিতেই তিনি বিশ্বাসী—অন্যে তা বুঝুক আর না বুঝুক। অন্য দল আবার 'আঙ্গিকবাদী'—মানে সৃষ্টিতে টেক্‌নিক্‌টাই শেষ কথা, টেকনিকই আর্টের ধর্ম। এঁদের চোখে ফরমেই আছে সৃষ্টি-রহস্য। অতএব, এ দিক থেকে এই দল জুড়ে দেন নানা কস্‌রতি,--ভাষা নিয়ে, ভাষার কাঠামো উড়িয়ে দিয়ে; শব্দ নিয়ে, শব্দ ভেঙে গড়ে; ছন্দ নিয়ে, ছন্দ মেনে না মেনে। আবার ভাব নিয়েও এমনি ভানুমতীর ভেল্‌কি চলে, ভাবের ফানুস উড়িয়ে, ভাবকে হাল ছেড়ে দিয়ে, একই সঙ্গে দশটা ভাবের বল আকাশে ছুঁড়ে, লুফে নিয়ে, মনকে আবছা আলো-ছায়ার খেলাঘর করে তুলে। 'আর্ট আর্টের জন্য' এই মতবাদ এমনি করে হয়েছে আর্টের আত্ম-সংকোচনের প্রমাণ; আর তাই প্রমাণ তার আত্মদ্বন্দ্বের। তা একই সময়ে বক্রোক্তিজীবী, আবার রসাত্মবাদী। জনতার ছোঁয়াচে তার আসল ভয়—ভিড়ের চাপে প্রাণ বেরিয়ে যাবে, অতএব সদর রাস্তায় সে বেরুবে না। জীবনের রাজপথ ছেড়ে তাই পালাল আর্টের 'আইভরি টাওয়ারে'। যদি বা নেমে এল, এল খেলা করতে রং লয়ে, রেখা লয়ে, শব্দ লয়ে, ধ্বনি লয়ে; অর্থাৎ নেমে এল 'আঙ্গিকের' আঙ্গিনায়। নইলে বস্‌ল ধ্যানে, হল রসাত্মবাদী, তার পরে আত্মবাদী, 'সোহংবাদী'; কিংবা উল্টো দেহাত্মবাদী আর স্নায়বিক নিয়মবাদী।

আমাদের দেশে অবশ্য art for art's sake কেউ মতবাদ হিসাবে বড় জাহির করেন না—সে ধ্বনি তোলেনও না। কিন্তু যে কটি প্রতিধ্বনি এই 'আর্টবাদ' থেকে উঠছে তা আমাদের লেখকরা অনেকেই কম বেশী তোলেন—লেখার আঙ্গিক নিয়ে কস্‌রৎ সুরু হয়েছে, এদিকে আমাদের বেশি দৃষ্টি পড়ছে হয়ত বিলিতি লেখকদের লেখা দেখে, সে এলিয়টই হোন্ আর এজ্‌রা পাউণ্ডই হোন্, কিংবা হোন জয়েস। আবার

রসাত্মবাদ থেকে আত্মবাদে ও ব্যক্তি-সর্বস্বতায় গিয়ে লেখকরা ঠাঁই নিচ্ছেন। এদিকে বিলিতি লেখকদেরও প্রভাব হয়ত আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি আছে আমাদের অধ্যাত্মবাদী ও আদর্শবাদী দেশী লেখকদের জীবন্ত প্রভাব—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের। মোটের উপর তার মূল শুধু অধ্যাত্মবাদ নয়, হেতু জীবন-বিমুখীনতা ;—জীবিকার দায় থেকে, জনতার দাবি থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা। অথচ ঠিক এমনি 'পালানো' রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-দর্শনে কোথাও সমর্থন করেন নি; জীবনেও বারে বারে তিনি এটা অস্বীকার করতে চেয়েছেন। সাহিত্যকে তিনিও জীবন-জিজ্ঞাসাই মনে করতেন।

সাহিত্য যে জীবন-জিজ্ঞাসারই একটা রূপ, এই কথা তাই আমাদের লেখকরা অনেকেই মুখে মানবেন। কিন্তু তাঁরাও সকলে ওর এক মানে করবেন না: আর কার্যত দেখা যাবে, কথাটা কেউ মানছেনই না। সেখানে দেখব সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের একটা ছেদ পড়ছে—কোথাও বেশি কোথাও কম; কিন্তু ছেদ পড়ছে। এর কারণ আর কিছু নয়, —জীবন, জীবিকা ও সাহিত্য, এ তিনের মূল সম্পর্ক আমরা গুলিয়ে ফেলছি, তিনকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখছি। কিন্তু আসলে সেরূপ ছেদ টানা সম্ভব নয়। জীবনের গোড়ার কথা জীবিকা, এটা সাহিত্যিকরাও মানবেন। আর সাহিত্য জীবনেরই 'সহিত' চলে, তার সহযাত্রী, তার সহগামী, তার সহায়ক,—বোধহয় তাঁরাও মানবেন এই জন্যই আমাদের দেশে মানুষের এই মানস-সৃষ্টির নাম হয়েছিল 'সাহিত্য' (তত ব্যাপক অর্থে আজ আমরা সাহিত্য কথাটি ব্যবহার করিনা; সে অর্থে ব্যবহার করি 'সংস্কৃতি', তাতে শিল্প-বিজ্ঞানের সব বিভাগই বোঝায়)। কিন্তু রূপকর্ম বিশেষ করে মনের সৃষ্টি, জীবিকা অত্যন্ত বাস্তব ব্যাপার। আর মন ও বস্তুকে আমরা মনে করি একেবারে দুই জগৎ—পরস্পরের নিয়ত শত্রু। তাই

জীবিকার সঙ্গে সাহিত্যের এ তফাৎটা আমরা বড় করে দেখি, সম্পর্কটা ভুলে যাই। এমন কি মনে করি, জীবিকার সঙ্গে আর্টের বিরোধিতা আছে; —জীবিকা-প্রয়াস এক জিনিস, আর সাহিত্য-সৃষ্টি আর এক জিনিস; economics এক জিনিস আর art অন্য জিনিস।

জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে এরূপে তফাৎ কার্যত আমরা টেনে ফেলি। কিন্তু জীবিকাই জীবনের গোড়ার কথা। জীবন তারই উপর ফুটেছে, তারই বিকাশে ক্রমশ প্রকাশ লাভ করেছে। নইলে জীবন শুধু হত জীবযাত্রা, যেমন জীবজন্তুর জীবন। তাদেরও ক্ষুধার তাগিদ মেটাতে হয়—কিন্তু তা প্রকৃতির প্রসাদে তারা মেটায়। মানুষ প্রকৃতির হাত থেকে সে প্রসাদ আদায় করে নেয়, নতুন করে আপনার প্রাণধারণের উপায় আবিষ্কার করে—এইটাই হল জীবিকা। মানুষের এই নিজে গড়া জীবন-প্রণালীর নাম economics, আর জীবজন্তুর প্রকৃতি-ধরা জীবন-প্রণালীকে বলে ecology. এই জীবিকা-প্রণালী করায়ত্ত করতে পেরেছে বলেই মানুষ হয়েছে মানুষ—তার জীবন হয়েছে প্রকৃতির বন্ধন-মুক্ত। আর এই জীবিকার প্রণালী তার সাধ্যাতীত বলেই জীবজন্তু রয়েছে জীবজন্তু। জীবিকা তাই মানুষের আসল কথা, তাতেই তার সমাজের বিন্যাস হয়, জীবনের রূপ-রহস্য বিকশিত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগে মনে চেতনায়, দেখা দেয় মনের ফসল। জীবিকার বাস্তব অধিকার আয়ত্ত করাতেই মানুষের মনের এলেকাও বিস্তৃত হয়েছে—আবার এই বাস্তব অধিকার বিস্তৃত করতেও মানুষের মনের শক্তি সাহায্য করেছে—এই তাদের সম্পর্ক; মানুষের জীবন বস্তু ও মনের এই মিলন-বিরোধের সংগ্রাম-ক্ষেত্র, উৎসব-ক্ষেত্র। জীবিকা, জীবন ও সংস্কৃতির (সাহিত্যের) এই হল সংবন্ধ; economics আর artএর এমনি নিবিড় বন্ধন। মানুষের economic life আছে বলেই একটা art life বা cultural

life আছে ; আর এই cultural life আসলে economic life-এরই সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চলে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখ্‌লে তা বেশ বোঝা যায়।

কথাটা তবু ইতিহাসের নামেই আমরা স্বীকার করতে চাই না। তার কারণ বোঝা সহজ:—আমরা ভদ্রলোক—খেটে খাই না। অন্তত যাকে ঠিক 'জীবিকা' বলে তা আমাদের নেই—চাষও করি না, যন্ত্রপাতিও গড়ি না। আমাদের জীবিকা নেই, অর্জন নেই ; যা আছে তাকে বলব 'উপজীবিকা', আর যা করি তা 'উপার্জন'। অথচ এইরূপে আমরা ইতিহাসের দোহাই পাড়ব—এই আমরাই না চিরদিন কালচার গড়েছি, আর্ট সৃষ্টি করেছি, সাহিত্য রচনা করেছি। জীবিকার বোঝা যারা বয়েছে তাদের এই শক্তিই বা কই, সময়ই বা কই ? তারা উৎপাদনই করেছে, তা'ই দেহগত জীবনের ধর্ম ; আমরা করেছি সৃষ্টি, তা'ই মনোজীবনের ধর্ম। জীবিকাই যদি মানস-সৃষ্টির অলংঘ্য কারণ হত—তা হলে পৃথিবীতে এসব সুকুমার কলা সম্ভবই হত না, বিজ্ঞানেরও চর্চা বন্ধ থাকৃত।—আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তি অকাট্য। সত্যই আমরা এতে বিশ্বাসও করি। করব না কেন ? ইতিহাস যে আমাদেরই স্বপক্ষে।

কিন্তু ইতিহাস আমাদের স্বপক্ষে নয়, এইটাই আসল কথা। একদিন আদম মাকু চালাত হবা সুতো কাটত, সেদিন কেইবা ছিল ভদ্রলোক ?—এ গল্প সত্য, শ্রুতি হিসাবে নয়, স্মৃতি হিসাবে। গোড়ায় গণ-গোষ্ঠীর সমাজে সবাই ছিল সমশ্রেণীর, সমাজের সেটা সূচন কাল—ভ্রূণাবস্থা। তার পরে ভ্রূণের মধ্যে যেমন বিশেষ বিশেষ দেহকোষ বিভক্ত হয়, ব্যক্ত হয়, তেমনি সমাজও বিভক্ত হল, বিবিক্ত হল। এইটাও বিকাশেরই পথ,

আর এরও মূলে জীবিকার ব্যবস্থা। তত দিন পর্যন্ত কাব্য, গান, নাচ, সব ছিল একত্র ; তারও এলেকা ভাগ হয় নি—সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ দেশগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে নি। সেদিন সংস্কৃতিরও ভ্রূণাবস্থা, ক্রমশ তারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা দেবে। তা দেখা দিল—যেমন সমাজও ক্রমশ জীবিকার প্রয়োজনে এগিয়ে চল্‌ল। বর্ণভেদ দরকার হল, ক্রমে তাই হল জাতিভেদ—ক্ষমতা-বান্‌রা শাসন করে, অন্যেরা করে পরিশ্রম। যারা পরিশ্রম না করেও বেশ কর্তৃত্ব করতে লাগ্‌ল, তারা মনে করল শ্রম কিছুই নয়। এই দেখা দিল প্রথম বৈষম্য,—বৈশিষ্ট্যও তা বটে। একদিক থেকে দেখ্‌লে যা বৈশিষ্ট্য আর দিক থেকে তাই বৈষম্য। বৈষম্য এল বলেই তো যাদের বৈশিষ্ট্য আছে তাদেরও আত্মপ্রকাশের সুযোগ হল। নইলে যেখানে সবাই সমান সেখানে কে তার নিজের শক্তির খোঁজ পেত ? সমাজ ক্রমশই দলের পর দল ছড়িয়ে দিল, ব্যক্তিরও চেতনা দলের পর দল মেলে দিল। সমাজে স্তরভেদ বাড়ল, তাতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও বৈশিষ্ট্যের, বৈচিত্র্যের কত অবকাশ জুটল। এতদিন যা ছিল সৃষ্টি, একই সঙ্গে নাচ গান স্তব কাব্য, তা হল বিজ্ঞান হিসাবে, নাচ হিসাবে, গান হিসাবে, স্তব হিসাবে, কাব্য হিসাবে স্বতন্ত্র। তাতেই আবার যার বৈশিষ্ট্য যেদিকে সেদিকে সে পেল নিজের প্রকাশের পথ। কেউ হল বৈজ্ঞানিক, কেউ কবি, কেউ শিল্পী। তবু কাব্যের সঙ্গে শিল্পের সঙ্গে সে যুগের বিজ্ঞান পর্যন্ত মিশে থাকৃত—সে ম্যাজিকের বিজ্ঞান হোক, আর লজিকের বিজ্ঞানই হোক। তবু অদ্ভুত শক্তিশালী লোকদের অসামান্যতাও মানতেই হবে—আমাদের দেশে তারা উদ্গাতা হত, রাজকবি হত, রাজশিল্পী হত। ওদেশে প্রথম হয়েছে কোরাসের প্রধান উদ্গাতা, তার পর ঘটনা বর্ণনায় নাট্যকার, রঙ্গশিল্পী, কবিতা রচনায় বিশিষ্ট স্রষ্টা। সমাজ এগোলে কাব্যের নানা রূপ বিকাশ লাভ করল। মহাকাব্য, নাট্যকাব্য, গাথা, শেষে একেবারে খণ্ড কবিতা

যাতে ব্যক্তি সরাসরি আপনার কথা বলতে শুরু করলে। ওদিকে এল কথাশিল্প, উপন্যাস,—যাতে জীবনযাত্রার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের বিচিত্র চরিত্র ফুটে উঠ্‌তে পারে ('মুদ্রাদোষ')। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ এসে গেলে ব্যক্তির যার যা বৈশিষ্ট্য তা মুক্তি পেল, আবিষ্কৃত হল, প্রকাশ পেল। আর সে যুগের শেষ কোঠায় আজ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যই অস্বীকৃত হল, দরকার হল মজুরের। তাতে চাপা পড়ছে মানুষের বৈশিষ্ট্য ; মানুষ হতে চলছে প্রমাণসই মানুষ, বর্গ-চরিত্র। এই হল ইতিহাসের এক নিঃশ্বাসে বলা কাহিনী।

কিন্তু কোন শ্রেণী থেকে এসেছেন তাঁরা যাঁরা এই অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ? সত্য কথা, প্রায়ই এসেছেন শাসকশ্রেণী থেকে, উচ্চ শ্রেণী থেকে। তাঁদেরই যে বৈশিষ্ট্য বিকাশের সুযোগ ছিল। অ্যাথেনসের দাসদেরতো বোঝা বইতেই সময় গেছে। ভারতবর্ষেও শূদ্রদের যে সেবাই ছিল ধর্ম। অবশ্য সেবার প্রয়োজনে নটনটী তারা হতে পারত, রঙ্গ শিখ্‌ত, নর্মের উপকরণ জোগাত, হয়ত গান গাইত, হয়ত মূর্তিও গড়ত। অসামান্য শক্তিসম্পন্ন গ্রীক্ দাসদেরও রোমানরা এমনি ভাবে নিযুক্ত করত নিজেদের সেবায় গ্রীক্-সংস্কৃতি লাভের জন্য। ইতিহাস বল্‌বে—সৃষ্টির যত প্রয়োজনই থাক্ স্রষ্টারা কিন্তু সকলে সেজন্য খুব বেশি সম্মান পায় নি। কবিরা তবু কিছু সম্মান পেত। অন্যরা, নটনটী শিল্পী, এরা ছিল রাজা-রাজড়ার প্রসাদ-জীবী। সম্মান ছিল তখন জন্মগত, শাসক শ্রেণীর একচেটে—যাই হোক তাদের সন্তানদের গুণাগুণ। তাই সমাজে যখন সামন্ত শ্রেণীর কর্তৃত্ব ছিল, তখন কবিরা সামন্তদের ছিল পারিষদ—কালিদাস থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত তাই দেখি—কবিরা গুণীরা প্রায়ই পারিষদ। সেই যুগ শেষ হল, কবিরা হলেন গণতন্ত্রের কবি, মানে যারা কিনতে পারে তাদের কবি। তবু,

জীবিকার অবসর যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাই বেশি হয়েছেন এতদিন সংস্কৃতির স্রষ্টা,—এই ইতিহাসের মোটামুটি সাক্ষ্য। অর্থাৎ যে শ্রেণী থেকেই শিল্পী আসুন তিনি এই শাসক শ্রেণীর জন্যই লিখবেন। কিন্তু এই সাক্ষ্যই অন্য দিকে আবার বল্‌বে—এই সৃষ্টির জন্য শিল্পী তাহলে রূপ খুঁজবেন কোথায় ? জীবিকা-ধর্মে কৃষি দেখা দিলে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তব ফোটে। গোষ্ঠী-যুদ্ধের দিন যখন, তখন মহাকাব্যের আখ্যায়িকা মুখে মুখে গড়ে ওঠে। রাজা রাজচক্রবর্তীরা যখন দেখা দেন তখন রাজসভায় সেই গাথা হোমর ব্যাস গেঁথে দেন, ভার্জিল কালিদাস লেখেন নতুন মহাকাব্য। পরবর্তী জীবন-যাত্রা জটিল হয় ; তখন দেখা দেয় 'বর্গ চরিত্র' বা টাইপ ;—ক্রমে ঘটনার সংঘর্ষে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ফোটে, চরিত্র অঙ্কন হয় লেখকের লক্ষ্য।

কিন্তু এও হল বাইরের কথা—সাহিত্যের রূপ, বিষয়বস্তু, ভাববস্তু সব সমাজেই শাসকশ্রেণীর অর্থাৎ রসিক শ্রেণীর মনমতো হয়। কিন্তু এভাবে বিষয়বস্তু দিয়ে সাহিত্যের রূপ বা স্বভাব নির্ণয় করা মোটেই ঠিক নয়। এই কথাটা ঠিক যে, রাজা-রাজড়ার দিন সাহিত্যে ফুরিয়েছে, এসেছে মধ্য-বিত্তের আর সাধারণ মানুষের দিন। আর তার মানে সমাজে এদের প্রাধান্য হয়েছে ; তাই সাহিত্যও পরোক্ষে এদেরকে প্রধান বিষয়বস্তু করে ফেল্‌ছে। এতে শিল্পের খানিকটা বিষয়-ঘটিত পরিধিও বেড়েছে ; তার সেদিকে স্বাধীনতা বেড়েছে। তিনি যে শ্রেণীরই হোন্, সাহিত্যিক এখন সৃষ্টি করেন পাঠক সাধারণের জন্য, মানে, ক্রেতা সাধারণের জন্য—মানে, যারা কিনতে পারে তাদের মনমতোই গল্প-কবিতা লিখতে হয়। এইরূপই শিল্পীর এই স্বাধীনতার স্বরূপ।

ইতিহাসের আসল সাক্ষ্য এইরূপ :—শিল্পী অবশ্য অসামান্য প্রতিভা জন্ম থেকেই পান—জীবে জীবে যেমন অফুরন্ত বৈশিষ্ট্য, তেমনি মানুষে মানুষেও বৈশিষ্ট্য। হয়ত তা মূলত জনিক-গত (genes), বর্ণজনিকের (chromosome) বিন্যাসের ফল। তারপরে ফল দৈহিক-মানসিক পরিবেশের। মোটের উপর অসামান্য মানসিক শক্তির মানুষ আছে, এটা ঠিক। তাঁদের সেই মানসিক শক্তি বিকাশ লাভ করে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কে এসে, তার ঘাত-প্রতিঘাতে। তাতেই অসামান্য মানুষদের শক্তি সৃষ্টিমুখী হয়, আবার তা পরিবেশকেও নিজের সৃষ্টি দিয়ে জোগায় নূতন বাস্তব সৃষ্টির শক্তি। পরিবেশ আসলে সমাজেরই নাম—জীবিকারই যা বিশেষ বিন্যাস। তাই পরিবেশের সঙ্গে শিল্পীর ঘাত-প্রতিঘাত হচ্ছে জীবিকা-বিন্যাসের সঙ্গে তার দেওয়া-নেওয়া, জীবিকার বাস্তব শক্তি থেকে শিল্পীর নিজের নেওয়া, আর জীবিকার শক্তিকে আবার তাঁর মানসশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া। আর যেখানে শিল্পী জীবিকার প্রধান শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ সেখানে সে নিতে পারে তত বেশি, ফিরিয়েও দিতে পারে তত বেশি ; সৃষ্টি করতে পারে তত বেশি, আর জীবিকাকে সৃষ্টিমুখীন করতে পারে তত বেশি (দ্রষ্টব্য 'সাহিত্যের স্বরাজ')। ইতিহাসে এই জীবিকার শক্তি বাড়ছে—শিল্পেরও সৃষ্টির এলেকা বাড়ছে। জীবিকার স্রষ্টারা যুগে যুগে পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই শিল্পীরও সঙ্গে সঙ্গে দরকার হয়েছে নূতন স্রষ্টাদের সঙ্গে সংবদ্ধ ঘনিষ্ঠ করে তোলার ; নইলে জীবিকাশক্তি সৃষ্টিমুখী হবে না ; নিজেও শিল্পী সৃষ্টি-সক্ষম হবেন না। একদিন জীবিকাক্ষেত্রে প্রধান ছিল সামন্তরা—সেদিন শিল্প সেই ক্ষত্রিয় ও সামন্তদের আশা আকাংক্ষার কথা বলেছেন। শেষ হল সেদিন ; এল বুর্গার্সের যুগ—কত বড় বিপ্লব সে! দেখি বিপুল প্রয়াস, সুমহৎ স্বপ্ন, অসম্ভব আকাংক্ষা—দেখি সেক্‌স্‌পীয়র! বুর্গারের ছেলে সে নয়—ষ্ট্রাটফোর্ডের

ছোটলোকের ছেলে, হরিণ চুরি করে চাবুক খেয়েছে; পালিয়ে গেছে শহরে, দেখল সেখানে বণিকদের। আর তাই সে বুঝল নতুন শক্তির মর্ম-কথা—এবং ছিল তাঁর অসামান্য প্রতিভা।—সে যুগের পর জীবিকা-ক্ষেত্রে সৃষ্টিশক্তি প্রবল হয়ে উঠল যন্ত্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে। তার জন্ম ও প্রসববেদনা আবার রোম্যান্টিক রিভাইভেলের কবিদের সহজ হওয়ার চেষ্টায়, তাঁদের উদ্দাম আকাংক্ষায়, তাঁদের বিপ্লবী স্বপ্নে প্রতিফলিত হল। আমাদের দেশে ঢিলে-ঢালা আয়েসি এই সামন্তযুগ হঠাৎ ঘা খেয়ে জেগে উঠল এই বিজয়ী বণিক-রাজের স্পর্শে, আর সেই বিজয়া ধনিক্ সংস্কৃতির স্পর্শে—মহাকাব্যের উন্মাদনায় মাতাল হলেন মধুসূদন, জীবন-রসে উন্মত্ত হলেন বঙ্কিম—কত বড় বিপ্লবের স্বপ্ন তাঁদের চোখে! কিন্তু জীবিকার ক্ষেত্রে দেশীয় বণিক্-শক্তির উদ্বোধন চাপা পড়ে রইল বিলাতী সাম্রাজ্যবাদের দাপটে। তবু সেই মুক্তির আশায় আমাদের আকাশ এতদিন মুখর রয়েছে। আজ আমরা নিরাশ হয়েছি, পালাতে চাই—থাক্‌তে চাই জীবনের দায়িত্ব থেকে দূরে। আর পৃথিবীতে আজ জীবিকা-শক্তির বণিক অধিকারীরা আর প্রগতির দায়িত্ব বহন করতে পারছে না—জীবিকার ক্ষেত্রে স্রষ্টা আজ শ্রমিক ও কৃষক। সৃষ্টির বাস্তবক্ষেত্রে তারাই প্রধান; অথচ এখনো তাদের হাতে আসে নি এই সমাজের প্রাধান্য, মুক্তি পায় নি জীবিকার নূতন শক্তি। মানস-ক্ষেত্রের স্রষ্টাদের তাই দরকার আজকের দিনে যারা বাস্তবক্ষেত্রের স্রষ্টা, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখা—তাদের বাস্তব শক্তি থেকে নেওয়া নিজের মানস-সৃষ্টির প্রেরণা, আর তাদের বাস্তব-সৃষ্টিতে জোগানো নিজের মানস-শক্তির দান; চাই পৃথিবীতে বিপ্লবী জনতাকে চেনা আর চাই এদেশে বিপ্লবী জনশক্তির ভাষা বোঝা (দ্রষ্টব্য 'সাহিত্যের স্বরাজ')। এইটাই ইতিহাসের মর্মকথা—সমাজের যে স্তর থেকেই আসুন

শিল্পী বা বৈজ্ঞানিক,—হোন্ তিনি বুর্গর্স যুগের সেক্‌সপীয়র, আর বাংলার বিপ্লব-কামী যুগের রবীন্দ্রনাথ,—জীবিকা-স্রষ্টাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অচ্ছেদ্য, তাঁদের আশা-আকাংক্ষায় তিনিই জোগান বাণী ; আর তা'ই জীবনের বাণীও।

শ্রম ও সৃষ্টি, কর্ম ও কল্পনা, বাইরের সৃষ্টিশক্তি আর মনের সৃষ্টিশক্তি, মানুষের ইতিহাসে এ দুই ধারাই বরাবর যোগাযোগ রেখেছে—জীবিকার 'সহিত' চলেছে 'সাহিত্য'।—কথাটা শুনেই তা হলে এক দল তাল ঠুকে বল্‌বেন,—অতএব, ওহে রবীন্দ্রনাথ তুমি **বুর্জোয়া** (? না আধা-সামন্ত 'জমিদার' ?), যতই গেয়ে থাক মানুষের গান,—তার জীবনের, মনের আশা-আনন্দের,—একদিন যখন আমাদের শ্রমিক-বিপ্লব সার্থক হবে তুমি হবে বরবাদ।—এ কথার মানে—"বিপ্লবটা" বিকাশ নয়, শুধুই বিনাশ ; সংস্কৃতির পরিণতি নয়, পরিনির্বাণ।

এ হল তাদেরই পাণ্টা জবাব—তোমরা শ্রমিক বিপ্লবে বিশ্বাসী, তোমরা কেহে এসেছ রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতে, কিংবা সেক্‌সপীয়রকে, কিংবা টলষ্টয়কে ? ওঁরা **আমাদের**—আমরা যাঁরা এ বুর্জোয়া সভ্যতা সৃষ্টি করেছি।—তার মানে—বণিকের একচেটে মালিকানার লোভ (monopolistic tendency) রবীন্দ্রনাথ, সেক্‌সপীয়র, টলষ্টয়কেও একচেটে (monopoly) সম্পত্তি করবার ফন্দি খুঁজছে।

বণিকের বর্বরতা ও অতি-বিপ্লবীর বর্বরতা ছাড়াও প্রশ্ন আছে। জীবিকা মানে জীবন নয়—জীবিকার বেসাতি বাসি হয়ে যায়, আজকের জিনিস কাল বিকোয় না। জীবিকাই যদি শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণ জোগাত, তা হলে সে যুগের লেখা এ যুগে কেউ বুঝত না। গ্রীক নাটক বুঝতো না ইংরেজ, চীনা চিত্রকলা বুঝতেন না লরেন্স বিনিয়ন্, সেক্‌সপীয়রই হতেন আমাদেরও কাছে

অগ্রাহ্য। অতএব জীবিকা নয়, জীবনের পরিবর্তমান পট নয়—সৃষ্টির প্রেরণা জোগায় জীবনের অপরিবর্তনীয় ভাবধারা, আত্মার আকুতি। সাহিত্য জীবিকার স্বাক্ষর নয়, আত্মার স্বাক্ষর।

কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু ওই আত্মা কথাটা গোল বাধায়—তা মনে রাখা দরকার। "আত্মা" তো মানুষের (বা পুরুষ মানুষের) একচেটে নয়—জীব মাত্রেরই আছে। তা'হলে ওই 'আত্মার স্বাক্ষর' জীবজন্তুর বেলা দেখি না কেন? তার কারণ জীব-জগতের শ্রমশক্তি নেই—জীবিকা সৃষ্টির শক্তি নেই—সৃষ্টিশক্তি নেই। 'জীবাত্মার' সঙ্গে 'মানবাত্মার' তফাৎ আছে—কারণ মানবাত্মা আপনাকে জানতে পারে, তা সচেতন। সে সৃষ্টি করতে পারে, তাতেই আত্মা সচেতন হয়। মানুষের সঙ্গে এইখানেই জীব জগতের তফাৎ—মানুষের জীবিকা আছে, তারই উপর সংস্কৃতি গড়া; আর মানুষ সৃষ্টি করতে পারে, জীবজন্তুর এই সাধ্য নেই। অবশ্য পাখীও বাসা বাঁধে, মৌমাছিও পরিশ্রম করে, আর তা দেখে আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হই: ভাবি কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি-নিপুণতা পাখীর আর সমাজ-সৃষ্টি মৌমাছির। বিস্ময়ের জিনিস বটে। কিন্তু এ সৃষ্টি হল জীবের জৈবীধর্ম। প্রকৃতি-বশেই পাখী তার বাসা বাঁধে, মৌমাছি মৌচাকে মধু সঞ্চয় করে,—এর নড়চড় করবার ক্ষমতা নেই তার, অন্ধ প্রাণাবেগের দাস সে। সে প্রাণাবেগ আমাদেরও আছে, কারণ আমরাও জীব—ক্ষুধার তাড়না আছে, বাঁচবার সাধ আছে, মরণের ভয় আছে, আছে বংশবৃদ্ধির কামনা, মিলনের বাসনা। এ সব আমাদেরও সহজাত, মৌলিক প্রাণাবেগ আমাদেরও সকলের একরূপ; তবে ঠিক তা অন্ধ নেই। আমরা তাকেও আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছি; তাই ঠিক

তার জৈবিক রূপও আর তেমন নেই। তবু তাকে প্রাণধর্ম বলে মানি। ক্ষুধা পেলে অনেকটা ক্ষেপে যাই—কিন্তু কাঁচা মাংস খেতে পারি না,—সেই শক্তিও নেই। পরস্পরের রুটি ছিনিয়ে নিই, কাড়াকাড়ি করি, মারামারি করি, খুনোখুনিও করি, ক্ষুধার তাড়নায় ঘাস খাই, পাতা খাই; সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকি, শুয়ে থাকি সারের জায়গা দখল করে; হয়ত সন্তানকে বিক্রী করে দিই, বিক্রী করে দিই দেহ, মান, ইজ্জত—এ সব আজ চোখের সামনেই দেখছি। বুঝছি প্রাণধর্ম কত দুর্বার। তবু দেখ্ছি—আমরা নিজেদের এই ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়ের রদ-বদলও করতে পারি, নূতন উপায় উদ্ভাবন করি। পুরোনো উপায় পুনর্গ্রহণ করি আবার—ঘাস খাই রেঁধে, চাল পেলে ফুটিয়ে নিই; দোকানে কিনতে না পেলে সারে এসে দাঁড়াই, দরকার হলে সারে এসে শুয়ে থাকি—প্রয়োজন বুঝে চলি, প্রয়োজন বুঝলে স্নেহও বিসর্জন দিই, বিসর্জন দিই মান আর ইজ্জত,—তাতেই জানি প্রাণ বাঁচবে। এ সব জৈবী প্রবৃত্তি আমাদেরও লোপ পায় নি। তবে তা মানুষের জীবন-যাত্রায় ও সমাজ-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভঙ্গিতে, নতুন রূপে প্রকাশের অবকাশ পেয়েছে। এইটাই বলতে পারি 'মানবাত্মার' আর 'জীবাত্মার' তফাৎ। 'জীবাত্মা' অনেকটাই অচেতন, আর 'মানবাত্মা' সচেতন,—আপনাকে জানতে পারে। কারণ প্রবৃত্তি একেবারে অন্ধ নেই, তাকেও আমরা একটু একটু করে এই জীবন-যাত্রার কাজে লাগিয়েছি, তা সমাজ-যাত্রার উপযোগী হয়ে উঠেছে—আর তা করেছি আমাদের সংস্কৃতির স্পর্শ দিয়ে, সৃষ্টিশক্তির সহায়ে, মানে, মূলত আর্থিক-সামাজিক জীবনের বিকাশে। এই ভাবেই আমাদের জৈবী প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছে প্রাণধর্ম, সবল আর সুন্দর; আর তার শক্তিতে সমাজও হয়েছে আবার আরও সবল ও সক্রিয়।

এই প্রাণধর্মকে যে সমাজ ঠেকাতে যায়, সেখানে প্রাণাবেগের (instinct) সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থার বাধে টক্কর। তাতে প্রাণাবেগ তার সামাজিক সৌন্দর্য হারায়, বিকৃত হয়ে ওঠে, জৈবী প্রবৃত্তি একেবারে পশু প্রবৃত্তি হয়ে পড়তে পারে। এই তো ক্ষুধার জন্য চাই চাল। পাচ্ছি না, তাই কত ভাবে প্রাণধর্ম আপনাকে মানিয়ে নিতে চাইছে—অখাদ্য খুঁজেও খাদ্য বার করি, সারে দাঁড়াই, রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি, গুণ্ডার লাঞ্ছনা সই, পুলিশের লাঠিও সই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করি, আবার ব্যবস্থা করে অবস্থা ফেরাই। যখন তা পারি না তখন মারামারি করি। আরও না পারলে হয়ত পশু প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠবে—anti-social প্রবণতা বেড়ে চল্‌বে,—বন্ধুত্ব ভুলব, স্নেহ তুলব, মমতা ভুল্‌ব—পশুর মতো হয়ে উঠ্‌ব। আসলে পশুর থেকেও বীভৎস হব। কারণ পশু চলে অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায়। আমরা মানুষ, আমাদের প্রবৃত্তি অন্ধ নয়, তার দৃষ্টি বিকৃত হয়, সে বিকৃত দৃষ্টির বশে আমরাও হব বিকৃত ও বীভৎস। প্রাণাবেগকে সমাজে ঠাঁই না দিলে এই হয় অবস্থা। প্রাণাবেগকে সমাজ তাই কাজে লাগিয়ে নেয়—তাকেই বলে sublimation। তার মানে, আবেগ সংবরণ নয়,—সংহার তো নয়ই, কারণ সংহার হয় না, সংহারের চেষ্টায় হয় বিকৃতি-সাধন; sublimationএর মানে হচ্ছে তার সংস্কৃতি-সাধন—তাকে সৃষ্টিমুখী করে তোলা।

মানুষের শিল্প ও সাহিত্য এই প্রাণাবেগেরই কথা, তারই সৃষ্টি। আবার সেই প্রাণাবেগকে পুষ্ট করে, সৃষ্টিমুখীও করে শিল্প ও সাহিত্য। এ জন্যই ক্ষুধা, জনন, মৃত্যু, কামনা, যৌবন, জীবন-পিপাসা, এ হল চিরন্তন বৃত্তি জীবনের, তার প্রাণধর্ম,—শিল্প ও সাহিত্য তাকেই পরিপুষ্ট করছে। আর নূতন নূতন অবস্থার মধ্যে এই সহজবৃত্তির যে নূতন নূতন বিচিত্র ভঙ্গি

প্রকাশ পায় শিল্পী তা'ই প্রকাশ করে—সেই জীবন-রসই 'পরিবেশন' করে—মানে নিজের জীবনোপলব্ধিকে, নিজের জগৎ ও জীবন-বোধকে 'পরিবেশের ভাণ্ডারে দান করে'।

হয়ত এও জৈব গ্রন্থিরস নিঃসরণের ফল। জীবের বেলা gland secretions দেহগত প্রকাশেই তৃপ্ত হত। জীব তা তৃপ্ত করত মারামারি করে, খাওয়া-খাওয়ি করে, আর দেহ-মিলনে। তারপরে উন্নত জীবেরা তা তৃপ্ত করত ছুটে, দৌড়ে, খেলে—পাগল হয়ে বনে বনে ফিরে। মানুষের বেলা সে রসশক্তি আরও চায়—দেহগত প্রকাশ থেকে তা মানসিক প্রকাশের ক্ষেত্রে উঠে এল—তাই রসের পিপাসা; চাই সে রসবোধ তৃপ্তি করা, সমৃদ্ধ করা, সৃষ্টিতে প্রবুদ্ধ করা। এই জন্যই এই বাক্য, ধ্বনি, রূপ, রেখা রসাত্মক হলে হয় কাব্য, সংগীত, ভাস্কর্য, চিত্রকলা—মানে সৃষ্টি।

কিন্তু সংস্কৃতির একটা এলেকা মাত্র শিল্প—সবটা নয়। বিজ্ঞানও সংস্কৃতি। মানব প্রকৃতির মৌলিক ভাবাবেগ নিয়ে কারবার করে শিল্প; কিন্তু বিজ্ঞান কারবার করে বিশেষ করে বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়ম নিয়ে। এ দুটিও একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ অবশ্য নয়। অনেকটা অ্যাটলান্টিকের এপার-ওপার, New World আর Old World—যদিও বিজ্ঞানের নূতন পৃথিবীই আজ খুব শক্তিশালী হয়ে উঠ্ছে, একই ভূমণ্ডল তবু;—আর প্রথম দিকে এপার-ওপারও ছিল সংলগ্ন, সংযুক্ত, এদেশে-ওদেশে গতায়াত চল্ত। প্রথম দিক্‌কার মানুষ ম্যাজিক দিয়ে শক্তিকে বশ করতে যেত, পারত না, খুঁজত প্রকৃতির নিয়ম। ম্যাজিকের রাজ্য শিল্পও বটে, বিজ্ঞানও বটে,

ধর্মও বটে। পাথরে পাথরে ঘস্‌লে একদিন আগুন জ্বলে উঠল—অমনি ম্যাজিকের একটা প্যাঁচ ফুরিয়ে গেল ; আবিষ্কার হল আগুনের নিয়ম,—প্রকৃতির একটা বন্ধন থেকে মানুষ মুক্ত হল। নিয়ম যেমনি আবিষ্কার হল অমনি মুক্তি পেল তার দৃষ্টিশক্তি। এইভাবে সেদিন বিজ্ঞানের দৃষ্টি আর শিল্পের সৃষ্টি একসঙ্গে চলেছে। দুইই ছিল প্রায় অভিন্ন। জীবিকার প্রয়োজনে দুইই ছিল সমান দরকারী—দুইই আজও তা আছে। দুইই শ্রম, দুইই কর্ম ; সংস্কৃতি এ দুই পৃথিবী নিয়েই গড়া। জীবিকার দাবি ভালো ভাবে মেটাবার দায়েই দু-এর বিশেষ প্রয়োগ দরকার হয়েছে। বিজ্ঞান বিশ্ব-প্রকৃতিকে দেখে, তার নিয়ম খোঁজে, মানুষের মুক্তির পথ বাৎলে দেয়। আর শিল্প মানব-প্রকৃতিকে নতুন নতুন অবস্থার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে, নতুন ব্যবস্থায় জন্য উদ্বুদ্ধ করে, নতুন সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ করে, অবস্থাকেই এরূপে বদ্‌লে দেয়। দৃষ্টিশক্তি আর সৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান আর কল্পনা, বাৎলানো আর বদ্‌লানো, বিশ্বপ্রকৃতিকে চেনা আর মানব-প্রকৃতিকে গড়া, —"Science knows". "Art knows to do"—খুব মোটা করে দেখ্‌লে এই হল বিজ্ঞানের আর শিল্পের নিজ নিজ কাজ।

এই মোটা করে দেখাটা অবশ্য খুব পরিষ্কার দেখা নয়। কারণ, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিও তার মনকে একেবারে সরিয়ে রাখতে পারে না ; আর প্রকৃতির নিয়ম খুঁজতে বসেও একটা পৃথিবীর ছবি বৈজ্ঞানিকের মনে থাকেই, —সে ছবিটাও সৃষ্টি-কল্পনা। আবার বৈজ্ঞানিকরা নিয়ম আবিষ্কার করতে করতেও ভাবাবেগে মশ্‌গুল হন। এদিকে শিল্পীরাও বিজ্ঞানের নিয়ম বুঝ্‌লে নতুন অনুভূতিতে আকুল হন। মানুষের মুক্তিতে মৌলিক ভাবাবেগ গুলিতেও নূতন রং ধরে—আর তাতে আবার শিল্পের নতুন নতুন প্রকাশ-পথ

খুলে যায়। গুহাচিত্র হয়ত পাথর দিয়েই খোদাই চল্‌ত। কিন্তু তার পর লোহার ছেনিতে পাথর কাটা গেল, ভাস্কর্যের পথ খোলা হল। খোদাইএর শিল্প উড্‌কাট্‌, লিনোকাট বেয়ে কোথায় চল্‌ল ঠিকানা নেই। নূতন নূতন বস্তু পেয়ে চিত্রকলা তৈলচিত্র, লেকুইর থেকে কোথায় এল। এরূপে নূতন উপকরণ নিয়ে শিল্প-শক্তি আজ ফটোগ্রাফ্‌, সিনেমা, রেডিয়োকেও প্রকাশের পথরূপে আয়ত্ত করতে চল্‌ছে। আবার তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে আর দিকে শিল্পেরও অসম্ভব ভঙ্গি। জীবিকার টেক্‌নিকাল উন্নতি হচ্ছে, শিল্পকর্মেরও নূতন টেক্‌নিক্‌ বা রূপকর্ম দিন দিন দেখা দিচ্ছে। তবু কথাটা মোটামুটি ঠিক—বিজ্ঞানের আসল কারবার বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে, আর শিল্পের কারবার বোধশক্তি নিয়ে। মানুষের মৌলিক ভাবাবেগই হল শিল্পের পথ ও লক্ষ্য, সেগুলোকেই আমরা বলি প্রাণাবেগ—instinct। তা নিয়েই 'প্রাণলীলা'। আর বিজ্ঞানের পথ হল বুদ্ধিবৃত্তি, লক্ষ্য নিয়ম-স্থাপনা। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিও বৃত্তি, তা মৌলিক সহজ বৃত্তির বিরোধীও নয়। তা যদি সহজ প্রকৃতির সঙ্গে তাল রাখতে না পারত—তা হলে বুদ্ধি ফুটতেই পারত না, মানুষ থাকৃত পশু।

সংস্কৃতির একটা মহাদেশ হল শিল্প। সাহিত্য আবার এই শিল্পেরও একটা দেশ। তাও ক্রমশ বিবিক্ত হয়েছে, আবার হয়েছে বিভক্ত; আর তারও সীমান্ত একেবারে অলংঘ্য নয়। মানে তাতেও যথেষ্ট সংকর আছে। উপাদানের সংকর হয়, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর মেশাল হয়। ইতিহাস বলছি, সঙ্গে সঙ্গে চিত্র আঁকছি; লিখছি কবিতা—

হয়ত একই সঙ্গে কোনো মহাকাব্যে (রামায়ণে, মহাভারতে, রঘুবংশে), কিংবা গাথায় (ময়মনসিংহ গীতিকায়), কিংবা গল্পে (চতুরঙ্গে) লিখছি কবিতা ও তত্ত্ব-কথা। ভাবের সঙ্গে ভাবের মেশাল চলে অমনি; তাতে বীররসের সঙ্গেও করুণ রস, হাস্যের সঙ্গেও বেদনা-বোধ জাগে। সভ্যতার বিষয় বা কাজের দিকটাও এমনিতর জাতি-মারা জিনিস—ওতে reserved for Europeans নেই, 'বিশুদ্ধ পবিত্র হিন্দু হোটেল'ও নেই, ছত্রিশ ভাবেরও সেখানে শ্রীক্ষেত্র।

কিন্তু সেই কথাটা বোঝার থেকেও বেশি বোঝা দরকার—সাহিত্যের সবটা নিছক শিল্পও নয়, আর সব সাহিত্য মৌলিক বৃত্তিগুলোর প্রকাশও নয়। তার কারণ সাহিত্য ভাষা দিয়ে তৈরী। সাহিত্যের দেশ হল ভাষার দেশ—শব্দের বা পদের পাচিল দিয়ে বাঁধা। ভাষা হচ্ছে সমাজের বড় আবিষ্কার, সব চেয়ে বড় এক সামাজিক উপকরণ। তার সাধারণ কাজ হল বস্তুর লেন-দেন; তাতে অন্তরাবেগ ও মৌলিক বৃত্তি দূরে রাখলেই ভালো হয়। অতএব, সাধারণ কারবারে শিল্পের বা সাহিত্যের দরকার নেই। তাই সব কথা সাহিত্য নয়—শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র বা ধোপার হিসাব সাহিত্য নয়; এমন কি হাজার হাজার প্রেমপত্রও সাহিত্য নয়—যদিও মৌলিক হৃদয়াবেগেরই তা ফল। অবশ্য সব কথা থেকেই সাহিত্য রচনা হতে পারে, হয়ও। কিন্তু সব কথা বা লেখা সাহিত্য নয়। সে উদ্দেশ্যও অধিকাংশ লেখার থাকে না। অবশ্য মুখ্য না হোক গৌণ উদ্দেশ্য ও-রূপ থাকতে পারে, আর ভাষার গুণে, লেখার গুণে তাতে রসসৃষ্টিও হতে পারে। তার প্রমাণ উপনিষদের অনেক কথা, কিংবা দর্শনের বা ইতিহাসের অনেক বই। যেমন, প্লেটো, বার্কলে, হব্‌স, বের্গসঁ, গিবন, কার্লাইল, মমসেন ইত্যাদি। এইটাই গদ্যের বিশেষ কাজ—জীবিকার লেনদেন চালানো। এজন্যে দরকার

ভাষার স্পষ্টতা, প্রাঞ্জলতা, প্রসাদ গুণ। এই 'কাজের গদ্য' ইংরেজিতে অষ্টাদশ শতাব্দে সৃষ্টি হয়েছিল, আমাদের ভাষায় উনবিংশ শতাব্দে সৃষ্টি হতে হতে তা থেমে গেছে। বাংলা গদ্য রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে হয়েছে অতিরিক্ত literary, মানে বক্রোক্তিজীবী, রসলোভী। 'কাজের গদ্যে'ও বেশ রসসৃষ্টি হতে পারে—গদ্যের প্রসাদগুণ থাকলে, যেমন 'পঞ্চভূত', 'বিশ্বপরিচয়', রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলি, বিশেষ 'যজ্ঞকথার' শেষদিক, 'অভয়ের কথা'। কিন্তু তাদেরও আসলে উদ্দেশ্য সাহিত্যিক নয়—মানে, মৌলিক ভাবাবেগগুলি মন্থন করা বা উদ্বোধন করা গদ্যের কাজ নয়। সে কাজই শিল্পের; ভাষার শিল্পই হল সাহিত্য। ভাষার মারফতে একাজ বিশেষ ক'রে করে কাব্য—মানে রস-রচনা; শুধু কবিতা নয়, নাটকও; গল্প এবং অন্য গদ্য লেখাও। এদিক থেকে সংস্কৃত 'কাব্য' কথাটাই ঠিক কথা, তারই একালের উপযুক্ত নাম হয়ত 'সাহিত্য'। কিন্তু সেই 'সাহিত্য' কথাটায়ও আজ গোল বেঁধে যায়—সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আরও তার নানা বিভাগের বিচিত্রতা ও জটিলতা স্পষ্ট হচ্ছে। প্রবন্ধ-সাহিত্য একটা বড় জিনিস—আলোচনা, সমালোচনা এসব। চিন্তাশীলতা ও যুক্তিশীলতা তার বড় লক্ষণ; মৌলিক বৃত্তি তার লক্ষ্য নয়। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জনা করা হয়ত তার কাজ; আর হৃদয়বৃত্তিকে হয়ত তাতেও তৃপ্ত করে। কিন্তু প্রবন্ধ-সাহিত্য প্রধানত রসরচনা নয়—অথচ ভাষা যদি প্রাঞ্জল হয়, তাতে 'প্রসাদগুণ' থাকলে তাও এক জাতীয় রসের সৃষ্টি করে; literature of *enlightenment*ও literature of *entertainment* হয়ে ওঠে। আসলে জীবনের নিয়মই এইরূপ:—জীবনের সকল বিভাগে বিভাগে লেন-দেন চলে; বুদ্ধি ও বোধশক্তি এ দুই এলেকায়ও লেন-দেন চলেছে—তাই তফাৎ থাকলেও মিলন চলছে বরাবর। আর তারই জন্য সংবাদপত্রের আওতায়ও

আজ সাহিত্যের একটা নতুন রাজ্য খুলে যাচ্ছে—literary journalism. তার মুখ্য উদ্দেশ্য জীবন-রসকে এই যুগের জীবিকার বাজারে কাগজের ঠোঙায় ঢেলে বিক্রি করা—কাগজের ঠোঙায় ice-cream জোগানো। সংবাদপত্র আর সাময়িক পত্রের বিশেষ লক্ষ্য হল এ যুগের জীবনযাত্রার কাজের তাগিদ মেটানো। অলেখকরাও ওর মারফৎ লিখতে শেখেন, তাদের লেখার ওজর—খেতে-পরতে হবে। কিন্তু সংবাদপত্র বুঝেছে লেখায় একটু ভেজাল দিতে হবে : শুধু সংবাদ নয়,—সংবাদ জীবনের নীরস তথ্য, জীবনযাত্রার কঙ্কাল। জীবনরসের একটু বর্ণ গন্ধ তাতে পেলে মানুষ আরও খুশী হয়। তাই সংবাদপত্র লেখকদেরও হাতের স্পর্শ চায়—অলেখকদের বলে ওই কৌশল শিখে নিতে (দ্রষ্টব্য—'মুদ্রাদোষ')। কিন্তু বলেছি জীবন-রস নূতন নূতন বস্তুর আধারে ঢালাই হলেও রস রসই থাকে। তাই সংবাদপত্রকেও রসস্রষ্টারা অবজ্ঞা করেন নি—বরং রাজার আসর ছেড়ে এখানেই পেলেন তাঁরা মুক্তি। সাময়িকপত্রকে বাহন করতে রস-সাহিত্যের একটুও বাধছে না। সাময়িক পত্রের সুবিধায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রতিভাও আরও প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে—এই বলাই এ বিষয়ে যথেষ্ট।

কিন্তু এবার রস-সাহিত্যেরও আসল দিকটার কথা বুঝে নেওয়া যাক। ভাষার খাঁটি রসসৃষ্টি হয় কবিতায়—তা আমরা জানি। বুঝতে দেরী হয় না—কোথায় তা গিয়ে আঘাত করে। অবশ্য তা বুঝবার জন্যও ভাষার সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার। সব শিল্প সম্বন্ধেই এই কথা খাটে—তা সঙ্গীতে হোক—ধ্বনি যার ভাষা ; কি আলেখ্য হোক—রূপ, রেখা ও রং

যার ভাষা ;—মোটের উপর অক্ষরজ্ঞান দরকার। তা থাক্‌লেই ঠিক রসের উদ্বোধন হয়—সেই মৌলিক আবেগের তৃপ্তি ঘটে। অবশ্য সব পাঠকের সে জ্ঞান সমান নয়। আর কারুর যদি বা একটা শিল্পের ভাষাবোধ সহজ হয়, অন্য শিল্পের ভাষা আবার আয়ত্ত হয় না। তা ছাড়া, এই যে শিল্পের ভাষা এটা শিল্পীরও মনগড়া ভাষা হলে চলে না। তাঁকে নিতে হয় সেই ভাষার ভাণ্ডার থেকে যা দশজনের জিনিস, সমাজের সাধারণ সম্পত্তি। অবশ্য তাঁর সৃষ্টির গুণে সে ভাণ্ডারও আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু ঐ সাধারণ সম্পত্তি নিয়েই তাঁব সৃষ্টি করতে হয়—উপায় নেই। কবিও সেই চেনা কথা দিয়েই তাঁর নতুন কথা বলেন—নতুন করে মৌলিক অন্তরাবেগে সাড়া জাগান। এইখানেই কবিতার বৈশিষ্ট্য—শব্দের মধ্যে দুদিকের সূতো গাঁট বাঁধা থাকে। একটা শব্দেব মানের দিকের সূতো, আরটা আবার অন্তরাবেগের দিকের সূতো : একটার মুখ বস্তুর দিকে, আরটার ভাবের দিকে। আবাব একটা শব্দে হয়ত দশটা মানের সূতা আছে, আছে দশটা ভাবের সূতো গ্রন্থি পড়ে। তাতেই লিখতে বসে ('বাজে লেখা') শব্দ বাছা শক্ত হয়। কিন্তু এই সব মানে ছাড়িয়ে আবেগেব দিকে এগিয়ে যায় কবিতাব শব্দ—এইটাই হল কবিতার যাদুকরী, যাতে ঘটে অনেক শিল্পরসিকের মতে "transformation of the real." আব এই যাদুকরী সম্ভব হয়, বোধ হয় দু' কারণে—শব্দের সঙ্গে কল্পনার সমন্বয়ে, আর শব্দের সঙ্গে সংগীতের সমন্বয়ে।

কল্পনা অবশ্য বাস্তবের প্রতিলিপি,—অথবা শুধু প্রতিলিপিও নয়, প্রতিমা ; বাস্তবের উপকরণ তারও বনিয়াদ, তার খড়-কুটো, কাঠামো। স্মৃতি এই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। কিন্তু শিল্পীর চেতনার মধ্য দিয়ে যখন বাস্তব রূপ নেয়,—সে চেতনায় বুদ্ধিও আছে, কিন্তু আবেগ ও পূর্বাভিজ্ঞতা বা জানা-

অজানা স্মৃতিই মূলত প্রবল সেই চেতনায়; তখন আবার চেতনায় আর বাস্তবে, একটা নূতন সমন্বয় হয়, নূতন সৃষ্টি হয়, তা'ই কল্পনা—তা'ই illusion
—the gleam
The light that never was, on sea or land,
The consecration, and the Poet's dream.

কিন্তু কল্পনা 'স্বপ্ন' নয়—কবির সৃষ্টি। স্মৃতি ও হৃদয়াবেগ নিজ খুশীমত স্বপ্ন দেখে, বস্তুর বাধা সেখানে কম। কল্পনায় এই খুশী-মাফিক চলবার শক্তি স্মৃতির ও অন্তরাবেগের নেই—সেখানে বস্তুকেও মানতে হয়; না মানলে সে কল্পনা হয় জল্পনা, শেষ পর্যন্ত তা হয় উন্মাদের ছিন্নসূত্র delusion—বাস্তবের থেকে সব রকমে বিচ্ছিন্ন তা। কল্পনা সবারই আছে, কিন্তু শিল্পীর আছে তা অসামান্য রকমে। আর তেমনি শিল্পীর আবার জানা আছে শব্দের সঙ্গে সংগীতের যোগ। অর্থবান্ পদের সেই সংগীতকে কবি গেঁথে তোলেন ছন্দ দিয়ে, মাত্রা দিয়ে।—তাও হয়ত মূলত বস্তুজগতেরই একটা দান—রক্তের দোলা থেকে, প্রাণছন্দ থেকে, প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তন থেকে, দিনরাত্রির আসা যাওয়া থেকে হয়ত মানুষের চেতনায় স্মৃতিতে এর ছাপ প্রথম পড়েছে। কিন্তু এই ছন্দের গুণে কবিতা অন্য রকম ভাষা থেকে বিশিষ্ট হয়ে উঠ্ল—মন আকৃষ্ট হল, অন্তরাবেগ জম্বার সুযোগ পেল, কল্পনাও আবার বাস্তব থেকে আরও একটু আড়াল পেল,—আর তাতে খুলে গেল বাধার অভাবে অন্তরের কবাট—রসের সমুদ্র সাম্নে, মথিত সমুদ্র থেকে ওঠে প্রাণলক্ষ্মী,—অথবা প্রাণ-উর্ব্বশী;—সুধার ভাণ্ড নিয়ে সৃষ্টির দেবতা, বিষের ভাণ্ড নিয়ে সৃষ্টির মোহিনী;—বিপ্লবের বাণী নিয়ে Creative Poetry, অন্ধ প্রতিক্রিয়ার পসরা নিয়ে Escapist Poetry.

কিন্তু তার আগে জানা দরকার গদ্য-কাব্য তা' হলে করে কি? এই অন্তরাবেগের বোধন ও বরলাভ তার মধ্য দিয়ে কি সম্ভব? গদ্যেও

যে কাব্য হয় তা সংস্কৃত কবিরা জান্‌তেন—অর্থাৎ গদ্যের মধ্য দিয়েও অন্তরাবেগের আলোড়ন তোলা যায়। মানে, কাব্যরসের জন্য মিল, মাত্রা ওসব অনিবার্য উপকরণ নয়। তা যে কতটা নয় তা নতুন করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন—'পুনশ্চ'তে। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই সাবধান করে দিয়েছেন যে, তাঁর সেই গদ্যকাব্য বিষয়-নিরপেক্ষ নয়। এ কালের সভ্যতায় এরূপ বিষয় বস্তু আমাদের বেশি জুটছে; অনুভূতির এক বিশেষ ভঙ্গিমা তাতেই ফুটে উঠ্‌ছে; আর এদেরই প্রয়োজনে এই গদ্য কবিতার পুনর্জন্ম হল। তার জন্য সব বিষয়ই গদ্যকাব্যের বিষয় হবে না, আর সব কবিতা পুরোনো মাত্রা-জ্ঞান ছাড়বে না। অবশ্য গদ্য আর পদ্য সব কাব্যেরই চাই কল্পনা—সেই সৃষ্টিময়ী সৃষ্টি। তা'ই কাব্যের প্রাণ।

কিন্তু গদ্যকাব্য ছাড়াও তো গদ্যে রস-রচনা হয়—কল্পনাও যেখানে প্রাধান্য পায় না। যেমন উপন্যাস। এককালে মহাকাব্য ছিল—জীবনের চিত্র। আজ কথাশিল্প এই জটিল যুগের মহাকাব্য হচ্ছে, গাথা রচনা হচ্ছে গল্পে।—তবে আগেকার যুগে মহাকাব্যে, গল্পে বা গাথায় কবি-কল্পনা থাক্‌ত কম। কবি অনেকটা ছন্দ দিয়েও লিখতেন কথা ও কাহিনী। এমন কি তা ছন্দের জন্যই একঘেয়ে ঠেক্‌ত—সপ্তকাণ্ড লিখতে লিখতে বাল্মীকিরও মনে হয়েছে,—একি বাজে লেখা লিখেছি; এসব গদ্যে বললেই ঠিক হত। সেই কথাশিল্পের বাহন আজ গদ্য—যদিও কবিতাও আছে।

গদ্যে লেখা কথাশিল্পেরও উদ্দেশ্য আসলে রস সৃষ্টি অর্থাৎ অন্তরাবেগকে স্পর্শ করা, আর তেমনি করে জীবনের সৃষ্টিতে নতুন শক্তি জোগানো।

কিন্তু তার পথ বা টেক্‌নিক আবার স্বতন্ত্র। শব্দের কল্পনা ও সংগীত দিয়ে কবিতা অন্তরলোকের দুয়ার খোলে। শব্দ সেখানে প্রায় মন্ত্র, তার ইঙ্গিত সেখানে অর্থ ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু কথাশিল্পে শব্দ সামান্য কাজ করে,' সেখানে অর্থের সীমানা ছাড়ানো তার পক্ষে দরকার হয় না। আবেগকে টেনে আন্‌লেই বরং ভুল হয়। অর্থবান শব্দ দিয়ে বল্‌তে হয় কথাবস্তু; সেই কথাবস্তুই কথাশিল্পের আসল উপকরণ। জীবনের পরিবর্তমান স্রোতে মানুষের চরিত্র ঘাতে-প্রতিঘাতে ফুটে ওঠে—তা' আমরা দেখি। উপন্যাস এই চরিত্র-চিত্র, বা ঘটনা-চিত্র—মানে, পরিবর্তমান চরিত্রের ও মানুষের কথা।

উপন্যাসিক যে চিত্র আঁকেন তা অনেকটা তাই চলচ্চিত্র। ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিশেষ মানুষের মন কেমন করে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, কিরূপে প্রত্যেকটি চরিত্র ফোটে—ভাষায় এই চলচ্চিত্র ফোটানো হল কথাশিল্পের কাজ। সেখানে তাই বড় কথা 'ঘটনা',—একটা অচল জগৎ নয়, কাব্যের মত একটা mood বা অনুভূতি-নিমেষ নয়—বরং অত্যন্ত চলন্ত, অত্যন্ত জটিল জগৎ ও জীবন। 'জটিল' একথাটাও মনে রাখা দরকার, শুধু একটা মাত্র ঘটনা-সংঘাতের অবস্থা নয়। তেমন ঘটনা-সংঘাতের situation হচ্ছে বিশেষ করে নাটকের এলেকা—সে হচ্ছে ইতিহাসের সরলতর crisis কালের জিনিস। কিন্তু ইতিহাসের জটিলতর কাল হল উপন্যাসের জিনিস—যত জটিল, যত চলন্ত সে যুগ ততই চরিত্রের বিকাশের ও বৈশিষ্টের স্ফুরণের সুযোগ বেশি। কথাশিল্পের জগৎ তাই যা 'আছে' তা নয়, যা 'হচ্ছে' তা'ই। এমন কি, এমন উপন্যাসও আছে যাতে এই চিত্রই ফুট্‌ল—কিছু হচ্ছে না, nothing happens। যেমন হয়ত Thomas Mannএর "Magic Mountain". কিন্তু তারও মানে পরিস্কার। সে মানে এই

যে, সমাজ ঠেকে গেছে, মানুষ পাক খাচ্ছে—পৃথিবী অপেক্ষা করছে একটা বিপ্লবী ধাক্কার জন্য।

কথাশিল্পেরও মধ্যে এমনি একটা আভাস থেকে যায়—সে আভাসটাও বহন করে আনে সেই কথাবস্তুই। তাতে চরিত্রের আর পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাত দেখে দেখে আমরা সেই চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের এক করে লই। তাই অনুভূতি জাগে, তেমনি একটা বোধ তাতে জন্মে, রসও তখন জমে। কিন্তু তবু কথাশিল্পের রস কবিতার রসের মতো তীব্র হয় না। কারণ তা জীবনের চলচ্চিত্রে ছড়িয়ে থাকে ; কাব্যের রস একটি অনুভূতি-ক্ষণকে আশ্রয় করে ঘনায়িত হয়। তা ছাড়া কথাশিল্পের বোধন হয় কথাবস্তু থেকে—শব্দ সেখানে মাত্র মধ্যস্থের কাজ করে। ভাষার পরিচ্ছদ সেই সভায় আটপৌরে হলেও চলে, ভদ্রগোছের হলে তো কথাই নেই, দু'এক সময়ে বরযাত্রীর পোষাক পর্যন্তও বরদাস্ত হয়। কিন্তু তাই বলে সে বরের পোষাক বা কনের চেলি পরে কাব্যের বরবধূর আসন দখল করতে পারে না। কথাশিল্পে সে আসন কথার—ঘটনার ও চরিত্রের। এ কথা না জানলেই আমরা তালগোল পাকাই, কথার আয়ুধ ছাড়ি কাব্যরসের উদ্বোধন করতে, কাব্যের রং ঢালি কথাবস্তুর কালিতে—আর লেখা হয়ে ওঠে 'বাজে লেখা'।

অবশ্য একটা কথা—কথাশিল্পেরও ফাঁকে ফাঁকে কাব্যময় ভাষা থাকে—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস মনে করলেই হবে, বঙ্কিমেরও মাঝে মাঝে আছে, বিদেশে ডি. এচ. লরেন্সের তো কথাই নেই, জয়েস, প্রুস্ত ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফেও তার নিদর্শন মেলে। সে সব ক্ষেত্রে সত্যই গদ্যের ছাঁদে কাব্যই তাঁরা লিখেছেন—যেমন আগেকার যুগে গাথায় মহাকাব্যেও মাঝে মাঝে লেখা হত খাটি কবিতা। আর তা ছাড়া, ছোট গল্প আরও বেশি কাব্যধর্মী। তার

মধ্য দিয়ে অনুভূতিকে স্পর্শ করার চেষ্টা এত স্পষ্ট যে, এ বিষয়ে না বল্‌লেও চলে। মনে করি 'ক্ষুধিত পাষাণ,' 'ছুটি', 'পোষ্টমাষ্টার';—নিশ্চয়ই 'পলাতকা' বা 'কথা ও কাহিনী'র কোনো খণ্ড কবিতা এর চেয়ে বেশি রসসৃষ্টি, করতে পারত না, এর চেয়ে বেশি কাব্যধর্মী নয়। রসলোকে ছোট গল্প হচ্ছে উপন্যাস ও কবিতার মধ্যেকার buffer state. এমনি আর এক জিনিস ইংরেজি essay. খণ্ড কবিতা ও প্রবন্ধালোচনার,—মানে বোধশক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির, খাঁটি কাব্য ও খাঁটি গদ্য,—এই দুয়ের বর্ণসংকরের ফল অনেক সময়ে দেখি ল্যাম্বের বংশধরদের লেখা এরূপ essayতে—বাংলায় যাকে বলি নিবন্ধ। এদিকে এ জন্যই লেখকেরও ভুল হয়, দু'এর মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না।

কিন্তু ছোট গল্প হোক্ আর নিবন্ধ হোক্, কাব্যধর্মী লেখায় কল্পনার রসান থাকবেই—কাব্যধর্মের সঙ্গে কল্পনার সংবন্ধ প্রত্যক্ষ। কিন্তু কথাশিল্পে সেই কল্পনাও আবার পরোক্ষ হয়ে পড়ে। সেখানে বাস্তব থেকে কল্পনা নিজেকে ততটা আড়াল করে নিতে পারে না। কারণ দেখেছি, সেখানে কথাবস্তুই যে আসল জিনিষ, শব্দ ও আবেগ লক্ষ্য নয়। তাই কল্পনাকে সেখানে মেনে নিলেও কথা আপন আসনে এসে বসে—যেমন বঙ্কিমের রোম্যাণ্টিক উপন্যাস,—তাতেও জগতের চিত্র দিয়েই রসের উদ্বোধন। বরং উপন্যাসে কল্পনার দরকার পরিবেশ মেনে চলার, তাই তাকে বলি পরিকল্পনা, plot ও characteristation—মানে, জগতের অসংখ্য জটিলতা থেকে প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ significant বা relevant ঘটনা ঝারাই-বাছাই

করা যাতে চরিত্র ফুটবে,—এই হল plot। আর, জীবন্ত পরিবেশের মধ্যে মানুষের বিশিষ্ট দেহযাত্রার ও মানসযাত্রার তেমনি প্রাসাঙ্গিক জিনিস ঝাড়াই বাছাই করা যাতে জীবনের চিত্র ফুটবে,—এই হল character painting আর এই দুয়ের ফলেই চিত্তে রসানুভূতি জাগে। এই খানেই তাই কথাশিল্পীরও পরীক্ষা—এই বাছাই করায়। কি পরিকল্পনা, কি আভাস তিনি জীবনের এই ফেনায়িত সমুদ্রতলে পেলেন? কারণ তারও মন্থনে উঠবে তদনুযায়ী—রস-লক্ষ্মী বা বিষ-কন্যা।

এই কল্পনা শক্তিই সৃষ্টির সব চেয়ে বড় শক্তি, সৃষ্টির মূল রহস্য। আর তার সবচেয়ে বড় বিপদেরও কারণ। সকল শিল্পেই কল্পনা কিছু-না-কিছু চাই, চাই একটা রূপায়ন, চাই রূপান্তর, কারণ শিল্প মাত্রই সৃষ্টিধর্মী। শিল্প শুধু creation নয়, সে creative; আবার re-creative, এবং re-creational, অবকাশ রঞ্জনী। literature of entertainment যা তাতেও রস থাকে, তাতেও মানুষের বোধশক্তি সঞ্জীবিত হয়, প্রাণাবেগ পুরোপুরি না হোক্ খানিকটা তৃপ্ত হয়, মানুষ আনন্দ লাভ করে, আর তার ফলে আবার শ্রমে ও বাস্তব সৃষ্টিতে নতুন শক্তি সঞ্চার হয়। তাই recreation কথাটির এই ইঙ্গিত ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এমনি রস থাকে চুটকি গল্পে লেখায়, সাধারণ হাসির গল্পে, নিবন্ধে। অবশ্য হাস্যরস খুব বড় জীবনানুভূতিরও পরিচায়ক হতে পারে। কারণ, যা সত্যকার creation সে শুধু recreational নয়, রঞ্জনীবৃত্তির লীলাখেলা নয়, তা creative, এবং re-creative, সৃষ্টির উৎসব, সৃষ্টির আভাস।

এই খানে তাই ভুলেরও সম্ভাবনা। সৃষ্টিধর্মী বলেই কবিকর্ম, রস-রচনা বিপ্লবের (progress) বড় শক্তি। তা সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়, সৃষ্টির পূর্বাভাসও জোগায়। আর তা না হলে সে শিল্প জোগায় অতীত সৃষ্টিতে প্রত্যাবর্তনের (regression) প্রেরণা, জোগায় মন-গড়া অতীতের মিথ্যাভাস—অর্থাৎ তা হয় প্রতি-বিপ্লবের (counter-revolution) শক্তি। প্রতি-বিপ্লবী শিল্প আর সাহিত্য অন্তরাবেগকে মুক্ত করে না, মৌতাত করায়। কল্পনা সেখানেও কাজ করে, কিন্তু সে সেখানে স্বচ্ছন্দ হতে পারে না। তাই, প্রতি-বিপ্লবী শিল্পের কল্পনা বর্তমানকে (বা অতীতকে) তার হাজার-পাকে জড়ানো বাস্তব-সংবন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, স্থাপন করে একটা মায়ার জগতে। সে অতীত বা বর্ত্তমান হল abstraction ; এজন্যই তার সেই জীবন মিথ্যা, আর তার সামনে কল্পনা যে আভাস ফুটিয়ে তোলে তা মিথ্যাভাস। বোঝা দরকার—কল্পনার এই দুই ধারাই অনেক সময়ে একই শিল্প নিদর্শনে থাকতে পারে, সেখানে শিল্পী সচেতন নন। যেমন, সাধারণ মানুষ জীবনের গতি সংবন্ধে সচেতন নন—কখনো তাঁরা জীবনের অগ্রগতির শক্তিকেও হয়ত এগিয়ে দিচ্ছেন, আবার পিছুটানেও কখনো থেমে থাকেন। অচেতন শিল্পীও তেমনিতর। এক সময়ে করেন দান 'বিপ্লবী' সৃষ্টি, আবার অন্য সময়ে প্রতি-বিপ্লবী লেখা, লিখতে থাকেন। কারণ, তাঁরা ভাবেন সবই সৃষ্টি। কিন্তু সত্যই কি তাই ? সব শিল্পই অবশ্য এক অর্থে creation, সৃষ্টি। কিন্তু প্রতি-বিপ্লবী শিল্প হচ্ছে বাধা-সৃষ্টি, regressive ; তাতে পুনরাবৃত্তির কিংবা বর্তমানকে পরিক্রমণের প্রেরণা থাকে, তা হতে চায় স্থিতিধর্মী (static) ; অথচ সৃষ্টি আর স্থিতি এক নয়। তাই প্রতি-বিপ্লবী শিল্পও থেমে থাকে না, সে-ও চলে—চলে নেতি-মূলক নিয়মে, চলে জীবনের উল্টোরথে। জীবিকা থেকে, বাস্তব সৃষ্টি-ক্ষেত্র

থেকে বিচ্যুত হলে শিল্পের এই দশা ঘটে—কল্পনাকে সে মিথ্যার কাজে লাগায় —কল্পনাও হয়ত তাকে ছলনা করে, জোগায় মিথ্যাভাস। আবার বিপ্লবী শিল্পও বাস্তব ক্ষেত্র থেকে, জীবিকা-ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হলে এমনি কল্পনাকে মিথ্যার কাজে লাগায়, objectivity বা বাস্তবতা হারায়, দেখে আজগুবি স্বপ্ন (abstraction), অলীক ভবিষ্যৎ, আর আকাশে পাখা ঝাপটিয়ে মরে। আসলে এই ধরনের বিপ্লবী শিল্প—বিপ্লবীই নয়,—অতিবিপ্লবী, যারা হচ্ছে বর্ণচোরা প্রতিবিপ্লবী।

রোমান্টিক সাহিত্যে আমরা এরূপ দুই দিকই দেখতে পারি। এক দিক থেকে রোমান্স সেই বিপ্লবের পূর্বাভাস ; বিস্ময়ের রসে পরিপূর্ণ, আনন্দে বিভোর ; তাতে অপূর্ব প্রেরণা থাকে, অসম্ভব আশা থাকে, থাকে আনন্দ ও আশ্বাস—Renaissance of Wonder. এইটাই বিপ্লবী রোমান্টিক সাহিত্য Creative Romanticism। কিন্তু এই কল্পনার রাজ্যে জীবন ও জীবিকার থেকে পালিয়ে গিয়েও আবার শিল্পী আশ্রয় নিতে পারে —নেয়ও। আর তেমনি পলাতকই সাধারণত রোমান্টিক সাহিত্য—সে 'জেলের চাঁদ' দেখে জেলখানা ভুলে থাকতে চায়। এমন কি বিপ্লবের ভাবী স্বপ্ন-বিলাসে বাস্তবের জটিলতা থেকে বাঁচতে চায়। এই হল Escapist Romanticism। তবু রোমান্টিক মনোভাব সব সময়ে প্রতিবিপ্লবী নয়। আর রোমান্সের প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে কল্পনা। মানে, রোমান্স মূলত কাব্য-প্রাণ—সে 'ক্ষুধিত পাষাণই' হোক্, 'কপালকুণ্ডলাই' হোক্, আর হোক্ বঙ্কিমের 'আমার দুর্গোৎসব' বা 'কে গায় ওই'।

এরূপ দু দিকই 'প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায়ও' (Nature Poetry) থাকতে পারে। মানব প্রকৃতিও আসলে প্রকৃতিরই একটা অংশ। সেই নাড়ীর যোগ আমাদের টানে। জীবনের জটিলতা থেকে পালিয়ে আমরা বলি—, Back to Nature, Back to Village (তাই রেডিওতে ভাটিয়ালী, সিনেমায় পল্লীগীতি), Back to a life of instincts (যেমন ডি, এচ্ লরেন্স) ইত্যাদি। কিংবা, কি তুচ্ছ মানুষ নিয়তির কাছে (হার্ডির রিটার্ন্ অব্ দি নেটিব্)। Nature এর এই idealisation আর instinct এর ওই idealisation রুশোর আমল থেকে চলছে—ফ্রয়েড্ পর্যন্ত ('সাহিত্যের স্বরাজ')। যেন পশুই সব চেয়ে মুক্ত জীব, মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ Ariel, আর instinct সমাজের দায়ে রুদ্ধবাক্ Caliban ; যেন সমাজ instinct-এর প্রকাশ-পথ নয়। কিন্তু সব সময়ে প্রকৃতি-পূজাও অমন 'পলায়ন' নয়—তা জীবনের গূঢ় সত্যকেই স্বীকার করাও হতে পারে, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সক্রিয় সংবন্ধের অনুভূতিও হতে পারে। আর তা হলে মানুষ তাতে পায় নূতন চেতনা ও প্রেরণা, যেমন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভালো কবিতায় পাওয়া যায়, পাওয়া যায় হাডসনের গদ্যে ও গল্পে, মেসফিল্ডের সমুদ্রস্নাত কথায় ও কাব্যে। আকাশ, আলো, সমুদ্র, এই সব থেকেই সৃষ্টির আরম্ভ, এমন সৃষ্টিধর্মী আর কি আছে—আকাশের মতো, সমুদ্রের মতো, হিমালয়ের মতো ? তাই না শ্রান্ত মানুষও তার কোলে গিয়ে জীবনীশক্তি বারেবারে নিয়ে আসে। সত্যই Nature Poetry সাধারণতঃ হয় ওরূপ Escape Poetry. 'কয়েদির আকাশ' তবু "সমুদ্র, আর সেক্‌সপীয়র"—শুধু বিপ্লবী হিউগোর প্রেরণা নয়,—সর্বকালেই তা বিপ্লবের প্রেরণা।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমাদের জাত-সাহিত্যিকরা অধীর হয়ে উঠেছেন—'গেল রাজ্য, গেল মান'। 'বিপ্লবের ঠিকেদারী করবার জন্য তোমরা চাও সাহিত্য? ফরমায়েস মত লিখ্‌ব আমরা কবিতা? প্রেরণা ছাড়া আমার হবে সাহিত্য সৃষ্টি?' সসম্মানে জানাচ্ছি—ফরমায়েসেই আজ লিখিতে হয় কবির ও আঁকতে হয় শিল্পীর। সে ফরমায়েস হচ্ছে এই বাজারের ফরমায়েস—কখনো একটু সূক্ষ্ম কখনো বা খুব রূঢ় তার ফরমায়েস। হয়ত কেউ তারই দক্ষিণা নিয়ে আজ ইংরেজের রেডিওতে কথা বলেন, আর কাল তারই দাক্ষিণ্য যেচে কথা বল্‌লেন জাপানী রেডিওতে—জাপান যদি আসে। তা ছাড়াও ফরমায়েসি লেখা এখনো লিখ্‌তে হয়, এখনো ফরমায়েসি প্রেরণাতেই মাত্‌তে হয়। সাহিত্যিককেও দেখ্‌তে হয় পরীক্ষার কাগজ, কবিকেও লিখ্‌তে হয় টেক্‌স্‌ট্‌ বই। এ ফরমায়েস অবশ্য প্রতিক্রিয়ার। বিপ্লবের শক্তি আজও তো এত প্রবল নয়—তার ফরমায়েস করবার শক্তি কোথায়?

আর একবার বলে লাভ আছে কি—'সাহিত্যের স্বরাজ' বিপ্লবেই বরং সম্ভব, তখনি বিনা ফরমায়েসে লেখা যেতে পারে। ঠিক মত দেখ্‌লেই দেখব—আজ সাহিত্যেরও স্বরাজ নেই, বিজ্ঞানেরও স্বরাজ নেই—স্বরাজ আছে আজ পুঁজিওয়ালার। আমাদের দেশে তা একমাত্র আছে বিলিতী পুঁজিওয়ালার। বাদবাকী শতকরা পঁচানব্বুই জন সেই পুঁজির পদানত—মানে, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম। কিন্তু সবাই বাজারের বশ—লেখকও, পাঠকও। তাই স্বরাজ বরং লেখকের তখনি সম্ভব যখন পঁচানব্বুই জন মুক্তি পাবে, বাকী পাঁচজনের স্তরে উঠে আস্‌বে—তখনই সমাজে স্বরাজ হবে, আর লেখকও স্বরাজ পাবেন। তার আগে এখনকার 'স্বরাজ' হচ্ছে যেন কালা-চামড়ার সাহেব সাজা; কালা চাকুরের মনে করা সেও বুঝি ব্যুরোক্র্যাসি। এ ধরণের 'স্বরাজের' মোহেই লেখকদের আরও মারাত্মক ভুল জন্মে—এটা

Art for Art's sake বুলিরই প্রকার ভেদ। প্রথমত স্বরাজ তো নেইই। দ্বিতীয়ত, এঁরা মনে করেন—স্বরাজ মানে বুঝি লেখকের, বৈজ্ঞানিকের, সংবাদিকের প্রত্যেকের স্ব-স্বরাজ। অনেককাল ধরে এঁরা ভাবতে শিখেছেন যে—সমাজের নিয়ম আল্‌গা হলেই মানুষ স্বাধীন। দেখেছি, রুশোর আমল থেকে এই ভুল চলছে, ফ্রয়েড্‌ও এই ভুল করেছেন—যেন পশুই ছিল স্বাধীন, jungle law ই হল স্বাধীনতা ; মানে প্রকৃতির হাতে পুতুল থাকলেই হয় স্বাধীনতা লাভ, মোক্ষ। স্বাধীনতার মানে হল বরং—প্রকৃতির নিয়ম জানা, জীবনের দাবি বুঝে জীবন চালানো—বনে ফিরে যাওয়া নয়,—এই কথাও সাহিত্যিক ভুলে গেছেন।

বিপ্লব সংবন্ধেও তাঁদের এরূপ ভুল ধারণা আছে। বিপ্লবের দাবি সৃষ্টির দাবি—মুনাফার লোভ নয়। বিপ্লব অত হাতে হাতে ফললাভের ব্যবসা করে না। সেরূপ ব্যবসা প্রতিক্রিয়ার। সুবিধাবাদিতা তারই ব্যবসায়ের নীতি। তাই বিপ্লব জানে—দু একটা কথার মার-প্যাঁচে, ভাষার ও ভাবের ম্যাজিকে রস সৃষ্টি হয় না ; এখানে-ওখানে 'বিপ্লব' 'মজুর' 'সর্বহারা' ঢুকিয়ে দিলেই রস জন্মে না। খুব কড়া পাকে শ্রমিক কাহিনী লিখতে বস্‌লে বা চড়া সুরে শ্রমিক মার্চের তাল ঠুক্‌লেও রস জমে না। এসব দিয়েও বিপ্লবী শিল্প সৃষ্টি হয়, কিন্তু এসব ছেড়েও বিপ্লবী শিল্প সৃষ্টি হয়—অজস্র সৃষ্টির উপকরণ আর অজস্র তেমনি তার পদ্ধতি! কিন্তু সব বিপ্লবী সৃষ্টিই বহন করবে অন্তত একটি স্বাক্ষর—বাস্তবক্ষেত্রে যাঁরা আজ স্রষ্টা তাঁদের স্বাক্ষর, তাঁদের নূতন কথার আভাস, নূতন মূল্যবোধের আভাস, নূতন জীবন-সত্যের আভাস। তাই হবে নূতন সাহিত্য।

কথাবস্তু দিয়ে নয়, শুধু ভঙ্গি দিয়ে নয়—এ যুগের জীবন-সত্যের সঙ্গে নিজে পরিচয় করে, নিজের অনুভূতিকে তারই সঙ্গে সম্পর্কে উদ্দীপ্ত করে,—তার

পরে—শক্তি থাক্‌লে—তাকে আবার প্রকাশ করে, প্রকাশ করে কথায় ও কবিতায়—তবেই হতে পারে সাহিত্য সৃষ্টি। আর সে সৃষ্টির মানে মানুষের মৌলিক হৃদয়াবেগকেই প্রকাশ করা, তাকে প্রেরণায় প্রবুদ্ধ করা—সৃষ্টিতে উন্মুখ করে তোলা। জন্ম মৃত্যু জীবন যৌবন—প্রকৃতির সংগে সংগ্রাম, জয়-পরাজয় আর অভিযান জীবনের,—অভিযান মৃত্যুর পথেই, মৃত্যুর দিকেই—এই জীবন-সত্য চিরদিনের, কখনো মিথ্যা হবে না। গাক্ না আজ শিল্পী এই গানই? চিরদিনই এ গান সুন্দর, চিরদিনই এ গান সৃষ্টিধর্মী ('কোদালি ও কলম')।

অবশ্য এ যুগের এই মৌলিক আবেগের বিশেষ দাবি ও বিশেষ ভঙ্গি যদি কেউ আবার ধরতে পারেন—তবে তাঁর সৃষ্টি এ কালেও আরও বেশি সমাদর পাবে—অন্য কালেও ম্লান হবে না। শক্তি যদি তাঁর অপেক্ষাকৃত কম হয়, তবু সমকালের প্রাণে সাড়া জাগানো, সমকালের প্রাণ-প্রয়াস উদ্বুদ্ধ করা হবে তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। হাঁ, সাময়িকের পিছনে যে মৌলিক অন্তরাবেগ রয়েছে তাতো অস্বীকার করবার নয়। কাজেই অভাব কি শিল্পীর খাঁটি প্রেরণার—যদি শক্তি থাকে? আর অতবড় 'প্রেরণা' যদি নাও আসে, শক্তি থাক্‌লে তো বাংলা লেখকের করবার কাজের অভাব নেই—এ যে পতিত জমি, 'কাজের গদ্যও' তো তৈরী হয় নি আজ পর্যন্ত। শিল্পের বিষয়বস্তু সাঁওতাল পরগণাও পার হতে পারে নি। তার টেক্‌নিক্‌ও অনেক পিছনে পড়ে আছে—যদিও শব্দ নিয়ে প্যাটার্ণ বুনবার চেষ্টা হচ্ছে,। আর কোথায় নাটক, কোথায় উপন্যাস বা এ যুগের মহাকাব্য? এ মুহূর্তের কথা তো সামান্য কথা নয়—এক-এক মুহূর্তে আজ ইতিহাস মোড় ফিরছে। চোখের সাম্‌নে আমার দেশ মরছে—বাচবেও, বাচছেও,—পৃথিবীর দেহান্তর হচ্ছে। বৃহন্নলা-বৃত্তি করতে তো আজ শিল্পী বাধ্য নন—তাঁর সাম্‌নে যে

আজ কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রাঙ্গণ,—যাচ্ছে বটে ক্যাপিটালিজমের কুরুপাণ্ডবের গৃহ বিবাদে শূন্য হয়ে তাঁর সংসার, হারাচ্ছেন তিনি তাঁর শাসক আত্মীয় শ্রেণীকে—কিন্তু দেখছেন না কি—মানবাত্মার বিশ্বরূপও এই মহাকুরুক্ষেত্রের মধ্যখানে —অনেক বাহু, অনেক পাদ, অনেক বক্ত্র-নয়ন সেই মহামহীয়ান্ রূপ দেখছেন না শিল্পী মানুষের? প্রেরণার অভাব কি আজ? বৃহন্নলাবৃত্তির প্রয়োজনই বা কোথায়? বরং ভাগ্যবান্ যদি কেউ থাকেন—শক্তিমান্ আর প্রাণবান্—যিনি এ যুগের জীবন-সত্য বুঝেছেন,—বুঝেছেন জীবনের গতিশীলতা, বুঝেছেন তার নবায়মানতার মর্ম কথা, বুঝেছেন তার ছন্দ ও রহস্য—আর দিতে পারেন তাঁর উপলব্ধিকে সমুচিত রূপ—তাঁর স্থান? তাঁর স্থান সেক্‌সপীয়রের সঙ্গে। তিনিই হবেন বিপ্লবের মহাকবি।

সে কবি বোধহয় আজও জন্মেননি—বিপ্লবের সত্যকার কাব্য আজও লেখা হয় নি। অনেকে লিখ্‌ছেন বিদ্রোহের কাব্য, অনেকে লিখ্‌ছেন সংঘর্ষের ভাষ্য। তাঁরা অনেকে বিপ্লবের সত্যকার সহমর্মীও। কিন্তু বিপ্লবের ভাবী রূপ সংবন্ধে কল্পনা আজও অনেকটা অবাস্তব। শ্রমিকের মুক্তি হলে—সে যখন একটা মুক্ত জীবন সহজ ভাবে গড়ে তুল্‌তে পারবে—বিপ্লবের সম্পূর্ণ সত্য লেখকের হাতে তখন সহজে আস্‌বে, সে-ও তখন বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করতে পারবে। এখন? এখন সে পারে বিপ্লবের পথের সংঘাতকেই প্রকাশ করতে, জীবন-মরণ সংঘর্ষকে মৃত্যুহীন রূপ দিতে; আর পারে তার নতুন সম্ভাবনাকে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিকট-সত্যে পরিণত করতে—পারে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে শিবকে সত্য করতে, আর রস-সত্যের মধ্য দিয়ে বাস্তব-সত্যকে করতে স্বাগত।

এ যুগের সে শিল্প জন্মাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু তারই পূর্বে এ যুগের সাহিত্য জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়েছে। তার কারণ সে জীবনকে বুঝতে

চাইছে। আর সে জীবনকে বুঝছে সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো শিল্প সাহিত্যকে বুঝছে, আর ফলে বুঝছে এ যুগের শিল্প-সাহিত্যকে এ যুগের জীবনের স্বাক্ষর হিসাবে। এইটিতে নতুনত্ব আছে। অন্য যুগে কাব্য জন্মেছে, তার পরে জন্মেছে সে যুগের কাব্য-মীমাংসা। এ যুগে কাব্য তেমন জন্মেনি, এখনো জন্মেছে প্রধানতঃ জীবন-জিজ্ঞাসা, আর তারই ফলে জন্মেছে কাব্য-জিজ্ঞাসা। জীবন থেকেই এই সাহিত্য-সন্ধানের সূচনা হয়েছে, আর এই সাহিত্য জিজ্ঞাসার সূচীও তাই জীবন-বোধ—মানে, ঐতিহাসিক বোধ। আজকের জীবন-জিজ্ঞাসু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আজ পৃথিবী দেখছে, দেখছে গতিশীলতার মর্ম বুঝে। তার কাব্য-জিজ্ঞাসা তার জীবন-জিজ্ঞাসারই অঙ্গ। সে সাহিত্য চায়, কারণ সে জীবন-রসের রসিক; আর তাই তার চোখে জীবন-জীবিকাও শিল্পের সংবন্ধ পরিষ্কার, পরিষ্কার এর প্রত্যেকের সংগ্রামে-সমন্বয়ে বিকাশ, পরিষ্কার তার বিভিন্ন পদ্ধতির ও বিভিন্ন বিভাগের বিচিত্র মিলন-বিরোধ, পরিষ্কার কল্পনা ও বাস্তবের সেই সেই দ্বন্দ্ব-সংমিশ্রণ, ব্যক্তি ও পরিবেশের বারেবারে মালা-বদল, বুদ্ধিবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির সহযোগিতা ও সৃষ্টিশীলতা, মৌলিক প্রাণাবেগের অবিনশ্বরতা ও নবায়মানতা, ঘাত-প্রতিঘাত জটিল বাস্তব জীবন যাত্রার জীবন-লীলার অপূর্ব-বৈচিত্র্য, আর পরিষ্কার জন্ম মৃত্যু বেদনা আনন্দ যৌবন শুদ্ধ প্রাণলীলার অপূর্ব রহস্যও।

৩০শে জুন, '৪৩

বাজে লেখা

ক্রমাগত কয়েকদিন চেষ্টা ক'রে এ লেখাটা আমি ছেড়ে দিলাম। আর হয় না, ওটাকে আর আমি কিছুতেই দাঁড় করাতে পারছি না। অনেকবার কাটাকুটি করলাম, অনেক পাতা ছিঁড়লাম, ফেলে দিলাম দূর ক'রে, বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। উত্তরের উঁচু পাহাড়ের চূড়া তিব্বতের মেঘে লুপ্ত হয়ে গেছে: সে দিকটায় তাকিয়ে রইলাম। কি দেখলাম, কি দেখব, কি দেখতে চাই—কিছুই মনে পড়ল না, কিছুই মনে ঢুকছে না—সেই ছেঁড়া পাতা কটা, সেই কাটা লাইনগুলি, আঁকাবাঁকা সেই অক্ষরের সার আমার মাথায় তখনও ভিড় ক'রে আছে; তাদেব মৃদু কোলাহল তখনও শুনতে পাচ্ছি। চোখে এই হিমালয়ের নিষ্প্রভ নির্দেশ ঠেকলেও মগজে তা পৌছতে পারছে না। যে স্নায়ুতন্ত্রী বেয়ে বাইরের বস্তু আমার মস্তিষ্কে প্রতিভাসিত হবে, সে স্নায়ুতন্ত্রী হয়তো তেমনই তার প্রবাহ মনের দুয়ারে পৌছে দিচ্ছে; তা গ্রহণও করছে মস্তিষ্কের বীক্ষণ-প্রকোষ্ঠের উত্তেজিত কোষগুলি—হাঁ, নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করছে। আমার দৃষ্টিশক্তি ওই উত্তরের পথে দূরযাত্রী। কিন্তু আমার চিৎশক্তি সে খোঁজ রাখে না। বীক্ষণ-প্রকোষ্ঠের কোষগুলির উপরে এখনও রয়েছে সর্পিলগতি লেখার দাগ, মাটির উপরে যেমন প'ড়ে থাকে সরীসৃপের গতিরেখা। মেঘ নয়, ওই পাহাড়ের চূড়া নয়,—চোখের আরসিতে বৃথা তাদের ছায়াপাত; স্নায়ু বৃথা তাদের দৌত্য বহন করছে। আমার চোখের সামনে এখনও জাগছে সেই আমার হস্তাক্ষর—আমারই হাতের লেখা, শ্রান্ত হাতের লেখা—আমার অশান্ত মস্তিষ্কের অশান্ত মননক্রিয়ার স্বাক্ষর। আমি তা ফেলে দিয়ে এসেছি; না ফেলে দিয়ে উপায় ছিল না।

আমি বার বার চেষ্টা করলাম আমার চিন্তাকে রূপ দিতে, বারে বারে তা আমার শাসন অগ্রাহ্য করলে। এক একবার আমার লেখা অগ্রসর হয়—আপনার গতিতে আপনি চলে, আমার কলম তার পথ তৈরি ক'রে যায়। কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠে দেখি, আমার কল্পনাকে তা ঠকিয়েছে, আমার চিন্তা তার আবরণে আবছায়া হয়ে উঠেছে, সে চিন্তা আর দেখা যায় না, লেখার সীমান্তে তাকে আর আবিষ্কার করা যায় না। থমকে দাঁড়াতে হয়।

ভাবের ঊষালোকে প্রথম যে মূর্তি আমার মানস-সীমান্তে পদার্পণ করেছিল,—তখনও তার মূর্তি রহস্যময়, তখনও তার রূপ আমি প্রত্যক্ষ করি নি, কিন্তু তার পাদস্পর্শে জেগেছে মনে শিহরণ - কৈশোরের প্রথম প্রণয়ের মত কাঁচা, ভীরু গোপন সেই মুহূর্তটি যখন আমি প্রথম অনুভব করলাম এই নতুন আবির্ভাব—প্রণয়েরই মত সে আমাকে টেনে নিলে। আমি কলম নিয়ে বসলাম।—জানি তাব স্বরূপ এখনই আমাব সম্মুখে প্রকাশিত হবে, এখনই খুলে পড়বে তার অবগুণ্ঠন, এখনই খুলে পড়বে তার শৃঙ্খল, তার বসন। রেখাব টানে টানে, অক্ষরের আলোকে এখনই সে মূর্তি আপনার সম্মুখে ফুটে দাঁড়াবে—মুক্তা অনাবৃতা। আমার চোখের সম্মুখে, আর পৃথিবীর চোখের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হবে তার রূপ; চিরদিনের মত স্থির, রূপে রেখায় সুনির্ধারিত; স্পষ্ট, উজ্জ্বল পরিপূর্ণ; আপনাব প্রকাশ-মহিমায় এক বিস্ময়, এক রহস্য। অথচ তার রহস্য কারও চোখে ঠেকবে না। সে প্রতিদিনকার পরিচিত ব'লে মনে হবে। একেবারে বরাবরের চেনা, যাকে জন্ম থেকে দেখছি, যাকে প্রতি নিমেষে দেখি, উঠতে বসতে শুতে ঘুমুতে। কেউ সন্দেহ করবে না, এ নতুন; আমার মনের আকাশে এর আবির্ভাব হবার পূর্বে এ ছিল সকলের অজ্ঞাত, আমারও অজ্ঞাত। কেউ ভাববে না, আমি তাকে এনেছি আমার অস্পষ্ট ভাবালোকের প্রদোষান্ধকার থেকে উদ্ধার ক'রে; তার জন্ম আমার মস্তিষ্কের ধূমায়মান

গহ্বরে; আমি তাকে উৎসারিত করেছি আমার কল্পনায় আর কালিতে মিশিয়ে কাগজের আঁকে আঁকে; দুনিয়ার অনাবৃত আলোকের সম্মুখে তাকে আমিই করলাম প্রতিষ্ঠিত, যে আকাশের নীলিমায় ছিল মিলিয়ে, বাতাসের প্রবাহে ছিল গা এলিয়ে, জ্যোৎস্নায় নেমে আসতে চাইত আমাদের সম্মুখে; যে কেঁদে বেড়িয়েছে নিখিল পৃথিবীর অনন্ত প্রকাশের মধ্যে, অপ্রকাশের বেদনায় যে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল; আমার তোমার প্রত্যেকের কাছে যে চেয়েছে প্রাণস্পর্শ, চেয়েছে আপনাকে প্রকাশিত দেখতে, আপনাকে প্রকাশিত করতে। অতি-পরিচিতা সে সকলের—তাই তো তাকে দেখে কেউ চমকাবে না। তবু তার মূর্তি এই হবে প্রথম রেখায় সুস্থির। আর এই সহজ প্রকাশের অপূর্ব বিস্ময় বুঝবে সে, যে কোনদিন পেয়েছে নিজের চেতনায় এমনই পাদস্পর্শ, সে বুঝবে অব্যক্তের রূপায়ন-রহস্য। আমি তার সে স্পর্শ অনুভব করেছিলাম; নিয়ে বসলাম কালি আর কলম। জানি সে ফুটে উঠবে।

কলম ব'য়ে চলল শান্তগতি, সংশয়হীন। ঋজু, স্থির আমার হাতের লেখা। একটু একটু ক'রে সে আপনার শক্তি সংহত ক'রে নিচ্ছে; সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছে আমার মন আপনার আহৃত শব্দ-সম্পদকে—যেমন ক'রে বাষ্প পুঁজি করে নেয় ইঞ্জিন। তার প্রথম যাত্রা ধীর, অনুত্তেজিত; শুধু একটি ম্যুভমেণ্ট—স্থিরতা, নিশ্চয়তা আছে এই সূচনায়। তার পর জেগে ওঠে তার দেহ জুড়ে শক্তির স্রোত, প্রত্যেক শিরা বেয়ে, প্রত্যেক রক্ত-প্রণালী দিয়ে তা ছুটে চলে। সমস্ত দেহ হয়ে ওঠে উত্তেজিত, উন্মত্ত, উদ্দাম। লেখা তার তাপ সঞ্চয় ক'রে নিয়ে একটু একটু ক'রে এগিয়ে চলল। তার গতিবেগ জাগবে, এখনই জাগবে। আমার সন্দেহমাত্র নেই সে সাড়া দিয়েছে,যে

প্রথম স্পর্শ তার দরকার সে তা লাভ করেছে। তার দেহ কাঁটা দিয়ে উঠছে প্রণয়ের প্রথম স্পর্শে। আমার সংশয় নেই সে সাড়া দিচ্ছে, প্রথম যেমনি দেয় দেহমন, ভীত, চকিত, শঙ্কায় সঙ্কুচিত। তার মুখে এখুনি ফুটে উঠবে কথা।

কথা ফুটল। আমার কথা জেগে উঠতে লাগল। আমার কলম এগিয়ে চলল, আমার লেখা হয়ে উঠল সহজ, নির্ভয়। অকুণ্ঠিত স্থির নিয়মে আমার কথা স্তবে স্তরে সাজানো হচ্ছে, অক্ষরের পাশে দাঁড়াচ্ছে অক্ষর, শব্দের পাশে শব্দ। বহুদিনকার পরিচয়ে তারা পরস্পরের চেনা, বহুকালের আত্মীয়তা তারা নতুন ক'রে সন্ধান পেল আমার প্রসাদে, শুধু আমারই কলমের কৃপায়। অথবা আমারই মনের মধ্যস্থতায়! আমারই মনের মধ্যস্থতা অবশ্য; কিন্তু বহু যুগের পুরনো তাদের আত্মীয়তা-ডোর। অচ্ছেদ্য সে বন্ধন, অচ্ছেদ্য। বহু পুরুষের অনুভূতির সাম্যে তাদের এক একটি রূপ নির্ধারিত হয়েছে। উপলব্ধি আবিষ্কার করেছে এক একটি সঙ্কেত, ভাব মূর্ত হয়েছে ভাষায়, বোধ শব্দে। কত যুগের চেষ্টা অথচ কি অনায়াসে নির্ভয়ে আমি তা ব্যবহার করছি।

আমার লেখা এগিয়ে চলল। অক্ষরের সার পাতার শেষে এসে পৌঁছচ্ছে, আমি মুখ না তুলে, কলম না তুলেও তা বুঝতে পারছি। ক্ষুদ্র অক্ষরগুলো ক্ষুদ্রতর হয়ে উঠছে, ভাবটা এখানেই পূর্ণ করতে হবে। এই পাতাতেই তার সীমা; কিছুতেই অন্য পাতায় তাকে আমি যেতে দেব না। আমার চোখে এক-একটা পাতা যেন একটা সম্পূর্ণ জিনিস। একটা ভাব দু-পাতায় ছড়িয়ে পড়লে যেন তার ঐক্য নষ্ট হয়, তার আভ্যন্তরীণ মিল ভেঙে যায়—আমার মনের কোথায় গোপনে এমনই একটা ধারণা আছে। আমার লেখার এক একটি গ্রন্থি শেষ হয় এক একটি পাতায়। তার শেষ

যতি এক পাতার সীমা ছাড়িয়ে অন্য পাতার শিখরে পড়লে আমার মন স্বস্তি পায় না। টেনে বুনে যে ক'রেই হোক পূর্বেকার পাতায় তাকে শেষ করতেই হয়। নইলে কোথায় যেন অসঙ্গতি ঘটে ব'লে মনে হয়। অথচ এসব পাতার কোনও মূল্য নেই, লেখার পাতা তো ছাপার পাতা নয়। এখানে যা দু পাতায় ছড়িয়ে পড়ল, ওখানে তা এক পাতাও ভ'রে তুলতে পারবে না। এখানে যার শুরু হ'ল পত্রের চূড়ায়, ওখানে হয়তো তার স্থান হবে পত্রের পদপ্রান্তে। পাতা জিনিসটা লেখার দিক থেকে অবান্তর। শব্দসংখ্যার দিক থেকে তো আরও বেশি অবান্তর, যে শব্দসংখ্যা গুনে আজকালকার দিনে লেখার পরিমাণ করা হয়। অবশ্য ছাপার পাতাটা অবান্তর জিনিস নয় (বিশেষ এখনও বাংলায় পাতা গুনেই দক্ষিণা স্থির হয়, শব্দ গুনে নয়); সেখানে 'টপ' পাওয়ার জন্য প্রয়াস সব লেখারই আছে। আর কোনও লেখা ছাপার পাতার মাথায় সমাপ্ত হ'লে মনে হয় তা অসমাপ্ত। তবু, খাতার পাতার বা প্যাডের কাগজের সীমান্ত মধ্যে, রয়েল আটপেজি বা ডবলক্রাউন ষোলপেজির এক একটি পিঠে,—আইডিয়াকে পূর্ণতা দিতে হবে এমন পাগলামো আর কি আছে? লেখার ইউনিট হচ্ছে প্যারা, এক-একটি ভাবের এক একটি সুস্থির বাহন। আমি চাই প্যারা আর পাতার মিলন ঘটাতে, অন্তত কোনও প্যারাকে অল্পের জন্য অন্য পাতায় যেতে দিতে আমি কুণ্ঠিত। তাই পাতা শেষ হয়ে এলে আমার লেখা হয়ে ওঠে বর্ণমালার ঠাস-বুনোনিতে ভারী। আর আমার আইডিয়া তখন ক্রমশ আপনাকে টেনে সংযত ক'রে নেয়। তার মনে কুণ্ঠা জেগে থাকে পাছে সে সহজ পদচারণায় পাতার সীমা ডিঙোতে বাধ্য হয়।

কোনরূপে পাতার শেষ-সীমায় অঙ্কপাত ক'রে কলম তুলে বসলাম। সমস্ত পাতাটার দিকে প্রসন্ন চিত্তে একবার তাকিয়ে দেখলাম, তারপর অস্ফুট

গুঞ্জনে পড়তে শুরু করলাম আমার লেখা পাতাটা। শব্দের ওপরে শব্দ লাফিয়ে পড়ছে, ঢেউয়ের গায় যেমন পড়ে ঢেউ। বাক্যের ভারসাম্য অটুট রেখে ব'য়ে চলেছে বড় ছোট মাঝারি নানা জাতের ধ্বনি। তার তাল লক্ষ্য করবার দরকার নেই, সে তাল কাটলে আমার কানে লাগবেই; আর যতক্ষণ এই অসম মাত্রার শব্দমালা সে তাল অব্যাহত রাখবে, ততক্ষণ 'ঠেকা' দিয়ে গেলেই চলবে—দেখা দরকার শুধু রাগ-রাগিণী রূপ পেল কি না। আমি প'ড়ে চললাম অস্ফুট স্বরে। পাতার শেষে এগোতে এগোতে সন্দেহ জাগল—কিন্তু রূপ? কোথায় সে রূপ? কিছু কি রূপ লাভ করেছে? রূপ তো এখনও চোখে ঠেকছে না! প'ড়ে চললাম। আমার মনের সংশয় ক্রমে শঙ্কায় পরিণত হতে লাগল—কোথায়, কোথায় সেই রূপ? শব্দের পর শব্দ, ধ্বনির পিছনে ধ্বনি, তালে কাটে নি, বাক্যের গতিভঙ্গি বাধা পায় নি—কিন্তু রূপ? যে রূপ আমার মানস-সীমায় পদার্পণ করেছিল, কোথায় তার দেহরেখা? পাতাটা পড়া হয়ে গেল। আমি বুঝলাম, আমি তার নাগাল পাই নি। এ পাতায় তার পদচিহ্ন পড়ে নি। না, তার আভাসও আমার শব্দচিত্রে এখনও জাগে নি। পাতাটা ছেড়ে আবার দৃষ্টি গেল সামনে, মন ফিরে গেল পিছনে।

আবার আমি ফিরে গেলাম আমার চৈতন্যের রহস্য-পুরীতে, যেখানে গহন নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন থাকে অসংখ্য ভাব, অসম্ভব স্বপ্নে যেখানকার দিগন্ত ছাওয়া। ওরই হাজার মহলের এক মহলে এক বন্দিনী রাজকন্যা, কত লক্ষ লক্ষ যুগ থেকে সে অপেক্ষা ক'রে আছে—চোখে তার ঘুমের আলস্য, কিন্তু প্রাণে তার জাগরণের আকাঙ্ক্ষা—আমি দেখতে পেয়েছি তার দেহের আভাস, তার সকরুণ চোখের একটুখানি ইশারা। তাই আমার প্রাণে জেগেছিল শিহরণ, আমার বুকে এসেছিল প্রথম প্রণয়ের ভীরু আনন্দ।

আমায় উদ্ধার করতে হবে এই রাজকন্যাকে, চেতনার গহনতল থেকে সেই মূর্তিকে টেনে তুলতে হবে, তার ঘুমের জড়িমা মাখা চোখে জাগাতে হবে প্রাণের সচকিত দৃষ্টি। আমি বেরিয়েছি তারই সন্ধানে।

দুয়ার খুলে গেল। সন্ধ্যা-তারার প্রদীপে তার মহল আলো করা--কোমল, মোলায়েম, স্নিগ্ধ সে আলো, আঁধারের মত নরম, আঁধারের মতই। প্রায় আঁধারই। সামনের লেখা পাতাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—না, সে মূর্তি ওখানে নেই, ওই লেখার মধ্যে। বরং শব্দের জালে সেখানে তার দেহাভাসও ঢাকা প'ড়ে গেছে, তার চোখের দৃষ্টিও আর ফুটে বেরুতে পায় না। চৈতন্যের এ মহল এখনও বন্ধ হয়ে যায় নি, এখনও সেদিকে তাকালে আমি তার নির্দেশ পাই, কিন্তু শব্দের ধারা ব'য়ে চলেছে চৈতন্যের অন্য মহলের দিকে। সে আমাকে ব'য়ে নিয়ে চলছে আর কোন্ এক অপরিচিত দুয়ারের দিকে। আশ্চর্য! আশ্চর্য এই শব্দের খেলা—কোথা থেকে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে এই শব্দমালা! আমি বেরিয়েছিলাম কার পিছনে, আর আমি ব'য়ে চলেছি কার সন্ধানে! কোন্ রূপ আমি চেয়েছিলাম প্রত্যক্ষ করতে, আর কোন্ অ-রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে চাইছে এই শব্দ-বন্ধনে। আবার পাতার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আমার সেই ভাবলোকের অস্পষ্ট মূর্তি অস্পষ্টতর হয়ে উঠেছে এই লেখায়। শুধু অস্পষ্ট নয়, তার সম্মুখে নেমেছে নূতন এক আবরণ। তার রহস্য ঘনতর হয়ে উঠতে পারে নি, বরং তার আভাস ক্ষীণতর হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য; আশ্চর্য এই শব্দ! যে শব্দের সরণী বেয়ে ভাবলোক থেকে আমার কল্পনা আসছিল রূপলোকের দিকে, তা-ই তাকে নিয়ে গিয়েছে ভিন্ন পথে, আঁধারহীন আদিম তমোলোকে—কেয়স্-এর তীরে। আশ্চর্য, আশ্চর্য এই শব্দ—এই আঁকাবাঁকা লেখা, ওই অক্ষরের সারে-বাঁধা ধ্বনি, যে ধ্বনি শুধু প্রতীক,

আমাদের ভাবলোকে যা সংকেতমাত্র। সে প্রতীকই ঢেকে দেয় তার মূল উদ্দিষ্টকে।

ভাষা তো শুধু ভাবের প্রতীক, আর কাগজের পাতায় সেই ভাষার ছাপ বহন করে আমাদের লেখা—এই সহস্র সরীসৃপ। এই কালির আঁচড় ধ্বনির বাহন মাত্র, তা রোমান অক্ষরেও যা থাকবে, বাংলা অক্ষরেও তাই থাকবে। শব্দ মূলত ধ্বনিদেহ। ভাষার অধিষ্ঠান-ভূমি কালি-কলম নয়, ছাপাখানাও নয়। সরস্বতী জিহ্বায় অধিষ্ঠান করেন। কিন্তু জিহ্বা-যন্ত্রে যে শব্দ ফুটছে সে শব্দও প্রতীক মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। অথচ এই প্রতীকের আড়ালে মূল উদ্দিষ্টই দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে ওঠে, ভাষার এ কেমন অদ্ভুত ছলনা!—সামনেকার শব্দগুলোর দিকে আমি বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলাম, আমার ভাবলোকের দূত কেমন ক'রে আমাকে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে, গুলিয়ে দিয়েছে আমার ভাবকে; তা আর রূপগ্রহণ করতে পারে নি। আমার কল্পনা যে প্রতীক আশ্রয় করলে আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য, সে প্রতীকই তাকে আচ্ছাদিত করলে, আমার মন থেকে প্রায় তাকে অপসারিত করতে যাচ্ছে। এখনও তা মিলিয়ে যায় নি, কিন্তু তার আয়োজন হয়েছে। শব্দের পর শব্দ, ধ্বনির পিছনে ধ্বনি, আমার কানের ভিতরে প্রবেশ করছে। পটহে তাদের মৃদু আঘাত লাগছে; ঢেউ উঠছে সেখানকার ক্ষুদ্র তড়াগে, তার পার্শ্বে নুয়ে পড়ছে মাথা এলিয়ে একটি আণবিক কল্‌চি (colchi), জাগছে স্নায়ুতে কম্পন, মস্তিষ্কের স্নায়ু-প্রকোষ্ঠে সে স্পর্শ ফুটে উঠছে ধ্বনির লেখায়। তার সাড়া একটু একটু ক'রে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। বড়, আরও বড় হচ্ছে তার পরিধি। মস্তিষ্কের যে কোটরে এতক্ষণ ব'সে ছিল ভাবময়ী প্রথম কল্পনা, যেখানে তার ছাপ পড়েছিল, সেখানে এল এই নতুন তরঙ্গ। একটু একটু ক'রে শব্দাবেগ মুছে ফেলছে সেই পুরনো দাগ, সে দাগ

ঝাপসা হয়ে উঠছে। শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে নতুন অস্পষ্ট, অনুদ্দিষ্ট ভাব সেখানে স্থান নেবার জন্য এগিয়ে আসছে। যে সব ভাবকে আমি চাই নি, জা'ন না, এই শব্দময় প্রতীক আশ্রয় ক'রে তারাই এসে উপস্থিত। অথচ, এই শব্দ আমিই ডেকে এনেছি আমার জ্ঞানলোক থেকে—আমার ভাবলোকের সেই অর্ধস্ফুট রহস্যকে মূর্ত করতে; আমার সে-ই উপলব্ধির সংকেত হবার জন্যই এ কথার জন্ম, তার সৃষ্টি; আর সে আমাকেই করেছে ছলনা, আমার সেই উপলব্ধিকেই দিচ্ছে অপহৃত ক'রে। এ অসম্ভব কি ক'রে সম্ভব হ'ল? এ ভাষা কি আমার নয়?

সত্যসত্যই কতটুকু আমার এ ভাষা! লক্ষ, যুগের মানুষের উপলব্ধির রঙ মেখে এই ভাষা আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। কত পূর্বজের অনুভূতি-লোকে একটু একটু ক'রে এর বিকাশ হয়েছে। সামান্য এক একটি ধ্বনির অস্থিমজ্জা নব নব অভিজ্ঞতা নব নব ব্যঞ্জনায় ভ'রে তুলেছে। এক একটি শব্দ এক একটি বিশিষ্ট অর্থের বাঁধন ছাড়িয়ে নতুন নতুন ইঙ্গিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এককালে যিনি ছিলেন 'রুদ্র', ঝড় বিদ্যুৎ মেঘের ও মরুতের দেবতা,—হয়তো যিনি ছিলেন দ্রাবিড়ের জঙ্গলে-ভরা দেশের 'রক্তবর্ণ দেব',—আজও 'শিব' বললে ও তিনি আমার চোখে ধ্বংসের দেবতা-রূপে দেখা দেন; আবার তিনিই কল্যাণময় হন; তিনিই হন সন্ন্যাসী, তিনিই আবার উমাপতি মহেশ্বর, ক্ষ্যাপা ভোলানাথ,—ডোমপাড়ায় তিনিই কুচনীর পিছনে ফেরেন। এক 'শিব' কথাটির আড়ালে তাঁর কত রূপ রয়েছে আবৃত। মানুষের কত বিচিত্র অনুভূতির, বিভিন্ন উপলব্ধির ইতিহাস ওই একটি শব্দ-সংকেতে জমা হয়ে আছে। এক একটি শব্দ এমন ক'রেই একাধিক ভাবের বাহন হয়ে উঠেছে। তার সামান্য অর্থ ছাপিয়েও তার ব্যঞ্জনা দূরে দূরে আমাদের প্রাণকে পৌঁছে দেয়। 'রাগ' আজ আমাদের

কাছে ক্রোধ। তার সামান্য অর্থ উত্তেজনাও চলতে পারে, আর সঙ্গীতের পারিভাষিক অর্থও তার অটুট আছে। কিন্তু তার রাঙা আভা আজও লোপ পায় নি। আমাদের চোখের তারায় তা ধরা পড়ে; আর চোখেরও অতীত মনের এক দীপ্তিময় অনুভূতি ওই শব্দে এখনও আপনাকে প্রকাশিত করতে পারে; শুধু 'অনুরাগ' রূপে নয়, এখনও 'রাগ' শব্দটির সে ব্যঞ্জনা আছে। এমনই প্রত্যেক শব্দেরই অর্থকেন্দ্র ছাড়িয়ে তার ইঙ্গিত নানা দিকে চ'লে গেছে—মানব-অভিজ্ঞতার বিচিত্রতায় তা এমনই বিচিত্র ও বিস্তৃত হয়েছে। অর্থ তো শব্দের সামান্য গুণ, তার অসামান্য গুণ তার ব্যঞ্জনা।

একই শব্দের দেহমধ্যে রয়েছে বহু অনুভূতির বহুতর উপলব্ধি। শব্দ পরিমিত, অনেক সময়েই পুরনো, কিন্তু অভিজ্ঞতা অশেষ, বিচিত্র এবং নিত্য নতুন। তাই, এই চির-নবীন ও চির-বিচিত্র উপলব্ধির জন্য শব্দের ভাণ্ডার খুঁজতে গিয়ে হতাশ হতে হয়—ঠিক সেই ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স প্রকাশিত হবে এমন শব্দ কোথায়? আর পৃথিবীতে মানুষমাত্রেরই অভিজ্ঞতা বিচিত্র, তার প্রত্যেক উপলব্ধিই ইউনিক। একই পদ্মা আমিও দেখি, রবীন্দ্রনাথও দেখেছেন, আর শত শত লোকও দেখেন। চোখের ওপরে বাইরের দৃশ্য যে আঘাত দেয়, সম্ভবত তা সবারই পক্ষে এক রকম। চক্ষুর স্নায়ু বেয়ে এ বেদনা মস্তিষ্ককোষে সঞ্চারিত হ'লে যে বাস্তব অনুভূতি জাগে, তাও সাধারণের একই—যদি কারও কোনও 'চোখের দোষ' না থাকে। কিন্তু তা থেকে যে উপলব্ধি আমি লাভ করি, তাতে মনে হয় ওর সঙ্গে আমার জীবন কেমন ক'রে জড়িয়ে আছে, ও আমার আপনার, আমার আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অন্য ধরনের, আর সে ধরনও তাঁর কবিতার মারফৎ হয়তো আমার উপলব্ধির মধ্যে অজ্ঞাতে খানিকটা মিশিয়ে আছে। শিলাইদর কোনও চাষীর বা তারপাশার

কোনও মাঝির উপলব্ধি অবশ্য আর এক ধরনের—তা থেকেও কি আমি একেবারে বঞ্চিত?

কিন্তু প্রত্যেকেরই এই উপলব্ধি একটি অভিজ্ঞতায় পৌছচ্ছে—কেউ, তা জানি, কেউ তা জানি না। আর প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই স্বতন্ত্র, ইউনিক; তার সেই অসামান্যতা আমাদের নিকট বহন করবার ভার শব্দের উপর, কথার উপর। কিন্তু কথা যদি অসামান্য না হয়, শুধু তার সামান্য অর্থের কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকে, তা হ'লে সে উপলব্ধির অসামান্যতাও প্রকাশ পায় না, নূতন সৃষ্টি হয় না। তার অভাবে সামান্য কথা নিয়েই কারবার করতে হয়। উপলব্ধিও তার বিশিষ্টতা হারায়, হয়ে ওঠে সামান্য। জীবনে প্রতিদিন আমরা এমনই সামান্য কথায় অসামান্য অভিজ্ঞতার ধার খুইয়ে চলি। ভাবি যে, সে অভিজ্ঞতাই বুঝি সামান্য। হয়তো তাতে জীবন-যাত্রা সহজ হয়েছে, ইউনিককে অ্যাভারেজের দরে পেয়ে আমরা হাটে-মাঠে সহজে কারবার করতে পারি। এমন কি মনের এলাকায়ও যথাসম্ভব এই অ্যাভারেজ দরেই আদান-প্রদান চালাই। এতে আমরা বেঁচেছি। আমাদের জীবন সাধারণ চালে, সাধারণ ভাবে চলে। আমরা পেয়েছি একটা মানদণ্ড, অ্যাভারেজ। তা না পেলে আমরা পদে পদে ইউনিকের ঠোকর খেয়ে ঘায়েল হতাম, জীবন-যাত্রা অচল হয়ে পড়ত। কিন্তু এই সামান্যতার স্রোতে তবু অসামান্যতা একেবারে তলিয়ে যায় না। হঠাৎ তা সচেতন হয়, তা সামান্য মাপকাঠিতে তৃপ্ত হতে পারে না, আপনার প্রকাশ সে কামনা করে, অসামান্য উপলব্ধি চায় তার ভাষা। তখন ভাষার সামান্য গুণ ছাড়িয়ে হঠাৎ তাতে অসামান্য দ্যোতনা দেখা দেয়, অর্থ ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনা জাগে; ধ্বনিতে আর ভাবেতে হয় প্রথম মিলন, তা পূর্ণ হয় শব্দের সঙ্গীতে আর কল্পনার ইঙ্গিতে। যেমন—

We are such stuff
As dreams are made on ; and all our little life
Is rounded with a sleep.

কিংবা,

The still sad music of humanity.

আর আমরা ?—যাদের সামান্যের চেনা মুখ নিয়ে কারবার, তারা ? আমরা এই অসামান্য প্রকাশে কি করি ?

Then felt I like some watcher of the skies
When a new planet swims into his ken.

সত্যসত্যই নূতন নক্ষত্র উদিত হয়। জীবনের যত অভিজ্ঞতা নিবে গিয়েছিল তাদের আলো হঠাৎ যেন আবার দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠে, যেসব জ্যোতিষ্ক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে হঠাৎ যেন তারা এই দীপ্তি পেয়ে নতুন জ্যোৎস্না ঢালতে থাকে।

আমার কোনও উপলব্ধিরই প্রকাশ সামান্য ভাষায় সম্ভব নয়—যে ভাষা তার অর্থের কেন্দ্রে আবদ্ধ, তা দিয়ে চলে না। শব্দের মধ্যে যে বহু দিকের ইঙ্গিত ঘুমন্ত আছে তার স্থির সন্ধান জানা দরকার, আর উপলব্ধির প্রয়োজনমত ঠিক তার সেই বিশেষ কোনটিকেই উদ্ভাসিত করতে হবে, যেখানকার সঙ্গে ওই উপলব্ধিটি জড়িত। একই শব্দে অনেক ছেঁড়া ছেঁড়া উপলব্ধির সূতো এসে গ্রন্থি বেঁধেছে। কিন্তু দরকার সেই সূতোটিকে যেটি বিশেষ উদ্দিষ্টের দিকে আমাকে এগিয়ে দেবে, যেটি একান্তভাবে আমার এই অভিজ্ঞতাকেই নির্দেশ করবে। এই একান্ত জিনিসটি না পেলে আমার কথার সূতো ভাবের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলবে, তা দশ মুখে দশ দিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর নইলে আমি কথার গ্রন্থিতে কেবলই দোব নতুন

গ্রন্থি, কেবলই বাড়াব জটিলতা। তখন আমার উদ্দিষ্ট অভিজ্ঞতা ঘুলিয়ে যাবে, কথা কুয়াশার মত আবৃত ক'রে ফেলবে আমার ভাবকে, শব্দের গায়ে আসবে শব্দ, ধ্বনির 'পরে ভিড় ক'রে আসবে ধ্বনি ; কিন্তু ভাষা অভিজ্ঞতার আভাস বহন করতে পারবে না, কথা বাণী হয়ে উঠবে না, থাকবে কথা হয়ে। কথা আর কথা আর কথা—words, words, words.

পাতাটা ছিঁড়ে কুটি কুটি ক'রে ফেলে দিলাম।

লেখাটা আবার নিয়ে বস্‌লাম।

নতুন পাতার পিঠে নতুন করে সাজাতে বসলাম আমার কথা। এবার আর কথাকে রাশ ছেড়ে দোব না, তার প্রত্যেকটি তীর কানায় কানায় ভরে তুলব, প্রত্যেকটি শব্দকে আমি ওজন করে বসাব, সামান্যতার আড়ালে যেন কিছুই মনের কথা ঢাকা না পড়ে তা দেখতে হবে, দেখতে হবে যাতে আবার চারদিকে কথার কুয়াসা ঘনিয়ে না উঠে, ভাব আবছায়া হয়ে হয়ে মিলিয়ে যেতে বাধ্য না হয়।

পুরনো শব্দগুলি ফিরে ফিরে আস্‌তে থাকে। একবার আমার মগজে তারা পথ কেটে ঢুকেছে ; নিজেদের সেই অনায়াসে পাওয়া স্থানটুকু এখন কিছুতেই তারা নতুন শব্দকে ছেড়ে দিতে চায় না। আমার কলমকে বলে— তুমি সহায় হও। আর সহায় হলেই তাদের vested interest অক্ষুণ্ণ থাকে। মনকে বলে,—তুমি সহজ হও, একেবারে নিজেকে সহজ করে দাও। তা হলেই পুরনো পাট বজায় থাকে—Path of least resistance হচ্ছে status quo'র পথ। পুরনো শব্দ গুলো বারে বারে ফিরে আসতে

চায়। বলে—দেখো, আমাদের আবির্ভাব কেমন সহজ, কেমন স্বাভাবিক, আমরা তোমার কতো আপনার, কতো আত্মীয়—তোমার উপলব্ধি আপনা থেকেই মেনে নিয়েছে আমি তার স্বভাষা।—এক-একবার বিশ্বাস হয়, সত্যই তো, যে কথা এমন অনায়াসে পাচ্ছি তাই তো খাঁটি কথা।

কিন্তু না, দ্বিতীয়বার আর ও ভুল করতে পারি না। অনায়াসে আমরা যা পাই তা প্রায়ই বৈশিষ্ট্যহীন, তা দিয়ে দোকানদারী চলে, তা দিয়ে সৃষ্টি হয় না; আত্মপ্রকাশ চলে না। সৃষ্টি মানে তো শুধু আড়ৎদারী নয়, তার মানে নতুন নির্মান,—আত্মদান, তাই আত্মপ্রকাশ। অনেক আয়াসে তা লাভ করতে হয়,—অনেক বিচার, অনেক বিশ্লেষণ, অনেক ত্যাগ ও অনেক বর্জন, অনেক সমীক্ষা আর অনেক পরীক্ষা। বাজারের চাহিদা তাকেও মানতে হয় বটে, কিন্তু জানতে হয় সব চেয়ে বেশি নিজের অনুভূতিকে। তাকেই পেতে হয় উপলব্ধিতে, তাকেই দিতে হয় প্রকাশ। তা সহজ নয়। সহজ হচ্ছে commonplace, বাজারের চাহিদা জোগানো। তা চোখে পড়ে, কিন্তু তা মনে ঢোকে না; তা স্থূল, কিন্তু প্রেরণা নেই, প্রকাশ নেই। 'সহজিয়ার' মুখে সহজ সহজ শুনে আমরা ভুল করে ফেলি। কিন্তু সে 'সহজ' হচ্ছে সহজাত, তা commonplace নয়, instinctive, fundamental বা original. অরিজিন্যাল জিনিসটা সোজা কথা নয়। চেষ্টারটনের কথা মনে রাখা দরকার—মৌলিকত্ব হচ্ছে জীবন ও জগতের মূল আবিষ্কারের শক্তি, তার অর্থ নতুনত্ব নয় কিংবা অদ্ভুতত্ব নয়, "Originality is the quality of laying hold of origins, the fundamentals of life and universe……Originality is not uniqueness nor novelty; for then a poet who sings of his desire to eat a mahagony table will be surpassingly original."

শালগ্রাম দিয়ে মসলা পেষাও যে অর্থে original' পরকীয়া চর্চাও সে-অর্থেই 'সহজ'। সহজ কথাটার মধ্যেই একাধিক অর্থের আভাস রয়েছে—সকল শব্দের মধ্যেই যেমন থাকে। তার এক মানে দিয়ে আর এক ইঙ্গিতকে আচ্ছাদিত করলে আমরা নিজেরাই ঠক্‌ব। 'সহজ' মানে তাই শুধুমাত্র সোজা নয়, সহজাতও। যা সহজাত তা সকলকারই পক্ষে সহজাত, সামান্য মানুষেরও অসামান্য মানুষেরও। আসলে তা সার্বজনীন, common inheritance. এমনি 'সহজ' শব্দটা, এমনি শব্দ 'সামান্য', এমনি শব্দ ইংরেজি 'common', —কারণ এমনি তাদের পিছনকার সত্যও। সে সত্য আমাদের জীবন,—একই সঙ্গে তাতে আছে বহির্জীবন আর অন্তর্জীবন, commonplace আব common inheritance, পৃথিবী আর প্রাণাবেগ, objects আর instinct, বাইরের সমাজ আর আমার-আপনার ভেতরের গহন হৃদয়। একদিকে দশজনের সংসার—তা আমরা সবাই চিনি—পরিচিত, এই অর্থে 'সহজ' তার রূপ। সবাই থাই-দাই ; ছোট-কথা নিয়ে, ছোট কাজ নিয়ে দিনের পিছনে দিন ভাসিয়ে দিই ; ছুটি জীবনের তাগিদে, জীবনের তাড়নায় ; ছুটি দিশে হারা, ছুটি আত্মহারা। কত মূঢ়তা সেখানে. কত রূঢ়তা—আর কত 'সহজ' তা আমাদের চক্ষে ! এই আমাদের একরূপ 'সহজ' জীবনযাত্রা, সাধারণ এবং সামান্য ;—আমরাও তেমনি ;—এখানে সামাজিক মানুষ আমরা। তবু এই বাইরের টানেই আমরা কেউ সাধারণ ও সামান্যও নেই ; কেউ হয়ত রাজা, কেউবা প্রজা। আর সে হিসাবে কারো জীবন রাজার মত, কারো প্রজার মত। যত এই দেয়াল উঁচু হবে তত সমাজ গণ্ডীবদ্ধ হবে, প্রত্যেকেরই তত জীবন অস্বচ্ছন্দ হবে, হবে টুকরো-টুকরো, খণ্ড খণ্ড, হবে জটিল ; আর ততই প্রত্যেকে হবে নিজের মধ্যে অনেকটা একান্ত, অনেকটা আবদ্ধ, অনেকটা বন্দী—মানে, 'সহজ'

আর থাকি না। এই আমাদের আর এক দিক—সেই সামাজিক দিকেরই। তা ছাড়াও আছে অন্তরের এলেকা—সহজাত বৃত্তির গহন তল। সামাজিক দিক থেকে সেদিকে মুখ ফেরালে আবার দেখি—কেইবা রাজা, কেইবা প্রজা? 'Man's Man for a that'. রাজার দম্ভ আছে, প্রজারও আছে হীনতা— কিন্তু সে উপরতলায়, গহন অতলে—

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

এই তো দুই জগত—দুই জগতে চলছে নিমেষে নিমেষে আদান-প্রদান, ভাঙ্গাগড়া। কিন্তু এই দুই জগতের বাসিন্দা আমরা সবাই। তাই বলে আমরা সকলেই কি নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে পারি? না, আমি পারি আমার 'সহজ' অস্তিত্বের কথা বুঝতে? কিংবা আমার অস্বচ্ছন্দ সামাজিক জীবন-যাত্রাকেও ঠিক মতো ধরতে? পারি না। পারা সহজ নয়। তা পারেন বলেই তো কবি কবি, কলাবিদ কলাবিদ—অন্তরের সহজাবেগকে কবিরা ভাষা দেন। তেমনি আবাব বাইরের জীবনযাত্রাকে ফোটাতে পারেন বলেই কথাশিল্পী কথাশিল্পী, নাট্যকার নাট্যকার। আমরাও মানুষ, জীবনযাত্রাব অংশীদার, হৃদয়াবেগে ভরা মানুষও,—তবু সহজ জীবনকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। আমাদের প্রতিদিনকার কথাও তো সহজ কথাই; তবু তাতে না ফোটে জীবন-যাত্রার সহজ ছবি, না ধরা পড়ে জীবনতলের সহজিয়া আবেগ।

শব্দের জগতেও 'সহজ' 'সহজ' বলি আমরা অনেকে, তারা জানি কি তার সম্পূর্ণ ও সঠিক মানে? চণ্ডীদাসের সাধনার মতোই এ সহজেরও সাধনা—চণ্ডীদাস ভাষারও 'সহজিয়া' তাও মনে রাখা যেতে পারে। তার পিছনেও চাই অন্তহীন তপস্যা, অসামান্য সংযম, অশেষ ত্যাগ। যে শব্দ প্রথমই মনে জেগে উঠবে সে শব্দ অনেক সময়েই কোনো-না-কোনো রূপে

মনের ওই উপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে; কিন্তু সে সম্পর্ক খাঁটি সম্পর্ক নাও হতে পারে। অনেক সময়েই হয়ত তা বাঁধা কথা, ধরতাই বুলি; মূল উপলব্ধির সঙ্গে হয়ত তার সম্পর্ক ঐতিহ্যগত (traditional), হয়ত সে সম্পর্ক বাহ্য সংস্কারের (conventional), হয়ত বা সে-সম্পর্ক খোশ-খেয়ালের—যার Freudian ব্যখ্যাও হতে পারে। এমনি হাজার-হাজার বাইরের সম্পর্কের সূত্র ধরে এক-এক শব্দ এসে হানা দেয়। আজকের বাদ্‌লার রূপটি মনে করে কারও মনে প্রথমেই উদিত হতে পারে শ্যামরূপ, কারও 'শাঙন ঘন গহন মোহ', কারও গরম চা ও গরম জিলিপী; আর আমার ব্যাঙের ডাক—আমার ছেলেবেলার এই দিনগুলোর সঙ্গে সেই একটানা গ্যাঙ্‌র-গোঁ-গ্যাঙ্‌র-গো এমনি ভাবে সম্পর্কিত যে এই চিন্তাই আমার পক্ষে সহজ। কিন্তু বাদ্‌লার যে রূপ আমার মনের তলে জমে উঠছে এর কোনোটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ মৌলিক নয়, অবিচ্ছেন্ত নয়। কোন শব্দে সেই রূপ বাইরে টেনে আন্‌ব? প্রথম যে শব্দ মনে পড়ছে তাই দিয়ে,—ব্যাঙের গ্যাঙর-গোঁ? —না, যে কথা প্রথম মনে জাগে তা-ই যে খাঁটি কথা এমন ভাবা চলে না। শব্দের সহজ সাধনাও সাধনা করতে হয়—অনেক বিচার করে, অনেক পরীক্ষা করে। এখানেও প্রথম ও প্রধান অবলম্বন—অস্বীকৃতি, 'নেতৎ'।

পুরনো পাতাটা টুকরো-টুকরো করে ফেলেছি, তবু তার শব্দগুলো আমার মাথায় ঘুরছে, তারা এখনো টুকরো-টুকরো হয়ে যায় নি। এখনও আমার মগজের পাতায় যে তাদের দাগ রয়েছে, আঁকা-বাঁকা, সর্পগতি দাগ। তা মুছে ফেল্‌তে পারি নি। আমার কলমের আঁচড়ে কাগজের কথা বাতিল হয়, কিন্তু মনের অক্ষর কাটা যায় না। সে অক্ষর আবার বেঁচে উঠ্‌তে চায় কাগজে। সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই তাকে বিদায় করা শক্ত। সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই এখন তার অস্তিত্ব আমার কাছে অত্যন্ত সহজ

হয়ে উঠ্‌ছে। আমি মনে করি, সে-ই বুঝি খাঁটি, সে-ই বুঝি মৌলিক, সে-ই বুঝি আমার নিজস্ব। কিন্তু না, এই 'বাঁধা কথার' সহস্রত্ব আমাকে ঠেকাতে হবে ; এই ধরতাই বুলিকে স্বাভাবিক স্বীকার করে স্বভাবকে অস্বীকার করা চল্‌বে না। আমি পুরনো কথাগুলো না মেপে, না পরখ করে, আর গ্রহণ করছি না। করুক না তারা কোলাহল, মস্তিষ্কের কোঠায় তাদের কণ্ঠ ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে উঠ্‌বে। শেষে আর তার রেশও থাক্‌বে না। নতুন কথা, নতুন ধ্বনি ততক্ষণ তাদের সেখানে বেদখল করে জেঁকে বস্‌বে।

নতুন শব্দ আস্‌ছে, পুরনো শব্দকেও একটু একটু দুয়ার ছেড়ে দিচ্ছি, নতুনে-পুরনোতে পাশাপাশি বসে যাচ্ছে, কোথাও তাদের অসাম্য নেই, পরম আত্মীয় পরস্পরের। প্রত্যেকটি শব্দকে আমি ওজন করে নিচ্ছি, ভরে তুল্‌ছি তার প্রত্যেকটি তট তাদের আভাস-সমৃদ্ধিতে: আমার প্রত্যেকটি কথা হচ্ছে ভরাট, আমার লেখা হবে তাই জমাট ; সামান্য ভাষার অন্তর থেকে আমি ফুটিয়ে তুলছি তাদের অসামান্য ইঙ্গিত। কারো আভাস আর অনির্দেশ্য নেই ; শব্দের সাধারণ অর্থ ছাপিয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ছে তার অসাধারণ ব্যঞ্জনা।

অনেকটা লিখে গেলাম। এক পাতা ছেড়ে দুপাতা শেষ হল। নতুন কথার কল্লোলে কতটা সময় যে কেটে গেছে তাও জানি না। বিকালে খাবার ঘণ্টা পড়েছে, উঠি উঠি করে আর উঠি নি—এইটুকু শেষ হোক। কিন্তু এক লাইন দু লাইন করে আমার খাবার সময় পিছিয়ে যাচ্ছে। লাইনের পরে লাইন আস্‌ছে। কথাটা এখনো শেষ

হতে পায় নি, যেখানে পৌঁছে সে নিঃশ্বাস নিতে পারবে, বল্‌তে পারবে —এই আমি দাঁড়ালাম, এই আমি এসেছি ; দেখো, এই আমার পুরো-পুরি রূপ।—কথা এখনো সেখানে পৌঁছয়নি। কিন্তু তার সেই লক্ষ্য-সীমাটি আমার চোখের এত সাম্‌নে যে আমি থামতে পারছি না। ওই মাঝখানকার কথাগুলোকে যে-করে হোক মাথা থেকে নামাতে হবে, মাথা থেকে ঠেলে বের করে দিতে হবে, যে করে হোক্ কাগজে ছড়িয়ে দিতে হবে, তা না দিয়ে আমি উঠ্‌তে পারছি না। ওই কথাগুলো, এই বাক্যটা, আর তার সঙ্গেকার ওর সঙ্গীটি, আর তার পিছনকার সে অনুচর কথাটা ;—এদের কোনো রূপে একবার মগজের এলাকা ছাড়িয়ে কাগজের মধ্যে আনা চাই। যে-করে হোক্ এদের ভার মাথা থেকে নামাতে হবে। তারপরে,—তারপরে, —সেই শেষ সীমা, সেই প্রান্তরেখা, যেখানে পৌঁছে আমার সাম্‌নেকার এই কথাটি বল্‌তে পারবে—এই তো, এই আমি এসেছি। তখন আমি উঠে পড়ব, এ বেলার মতো,—খাবার গিল্‌ব, মুক্তি পাব, মানুষ হব।

কোনো রকমে পৌঁছুলাম সেই সীমায়—কলম তুলে এবারকার মতো থাম্‌লাম, এই দুপুরের মতো। একবার লেখাটার এই আড়াই পাতার ওপর চোখ বুলিয়ে নিই। উঠবার আগে দেখে নিই, যদি কোথাও কোনো শব্দে ফাঁক পড়ে থাকে, কোনো বর্ণ দিয়ে থাকে ফাঁকি, এই আঁকা-বাঁকা অক্ষরের সারের মধ্যে যদি কোনো অবাঞ্ছিত পদ আমার চোখ এড়িয়ে এসে বসে গিয়ে থাকে—দেবতার সমাজে রাহুর মতো।

আবার গুঞ্জন করে পড়ে চল্‌লাম। শব্দের ধ্বনি জেগে উঠ্‌ল। এ তাল নতুন, তা মানতেই হবে। এ তরল নয়, এতে ঢিলেমি নেই। কঠিন, দৃঢ়বন্ধ, গম্ভীর। আমি পড়ে চললাম—শব্দের ধ্বনি স্থির, স্বতন্ত্র, স্বাধীন ; একটির গায়ে আরটি ঢলে পড়ছে না। প্রত্যেকটি আপনাতে সমাহিত,

আপন মর্যাদা নিয়ে আপনি একক। অর্থও তেমনি সতেজ। তাদের ঐশ্বর্য আর আবৃত হয়ে নেই; শব্দের সামান্যতার খোলস খসে পড়েছে, আমার ভাষা হয়ে উঠেছে স্বসমুখ। আমি পড়ে চল্লাম। পদে পদে আমার দৃষ্টি চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। একটি শব্দকেও এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। প্রত্যেকটি পরাক্রান্ত, প্রত্যেকটি উদ্দীপ্ত, প্রত্যেকটি ঐশ্বর্যবান্‌। পদে পদে এই শব্দকে কুর্নীশ করতে হয়, কুর্নীশ করতে করতে তবে এগোতে হয়,—এমনি আমার ভাষার আভিজাত্য, এমনি তার শব্দের অনমনীয় স্বাতন্ত্র্য। এক-একবার থেমে দম দিতে হয় – আমার ঘন-সন্নদ্ধ ভাষার মধ্যে ফাঁক কোথাও নেই যে ফাঁকি দিয়ে দম নেব। আমার ভাষা গাঢ়বন্ধ, কঠিন, নিশ্ছিদ্র। কোনো শব্দকে শুধু চোখে দেখে গেলে চলে না, থম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়, বুঝতে হয় তাদের বিশিষ্ট গৌরব;—তার পরে মুক্তি। আমার দম ফুরিয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছুবার পূর্বেই হাঁফ ধরে। প্রত্যেকটি শব্দ ভারী, ব্যঞ্জনা তার সুদূর প্রসারিত,—কোনো চেনা সহজ কথার মধ্যে মিশে হারিয়ে যাবে, এমন সম্ভাবনা নেই। বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে, একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে তা আপনার গুরুত্ব জ্ঞাপন করে; সাধ্য নেই বলি, 'দেখি নি'। সাধ্য নেই বলি, 'তোমাকে চিনি',—শব্দের দৃপ্ত মহিমা বারে বারে পথরোধ করে। ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মান্‌তে হয় তার অসামান্যতা।

শেষ অক্ষর পর্যন্ত আমায় পড়তে হল না। ভাষার ইলেক্‌ট্রিক শক্‌ খেতে খেতে আমি সে চেষ্টা ছেড়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম. ইলেক্‌ট্রিসিটির শক্তি আছে; তা প্রাণঘাতী, স্নায়ুনাশী। কিন্তু তার রূপ? হয়ত তার রূপও আছে, টি. এস্‌. এলিয়টের হাতের মধ্যযুগীয় দীপাধারে হয়ত তা আলো জোগায়, হয়ত এজ্রা পাউণ্ডের হাতেও তার চমক ফোটে, জেম্‌স্‌

জয়েসের একৃস্ রে'র জন্যও হয়ত চাই এমনি শব্দের তাড়িৎ শক্তি। কিন্তু সেই তড়িৎ তাড়নায় আমার চোখ শ্রান্ত হয়। আমি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো ভাষার ডাইনেমো চালাতে জানি না, তা আমি পারি না। বিদ্যুৎ অদৃশ্য-, সঞ্চারী। আমি তার রূপ দেখতে পাই না, আমার সাম্‌নে তার কোনো প্রকাশ নেই। আমি শুধু ইলেকৃট্রিক শক খেয়ে ত্রস্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি—কোথায় রূপ? দেখলাম আমার ভাব রূপ নিতে পারে নি। এই ভাষার বিদ্যুৎ-ভরা তারের ভয়ে সে আমার সাম্‌নেই আস্‌তে পারে নি। অথচ আমার শব্দ সুদৃঢ়, প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটি সমুন্নত, তার অর্থে সামান্যতা নেই, তার আভাস প্রচুর, তার ব্যঞ্জনা বহুল, তার বিশিষ্টতা গুরুতর। কিন্তু তবু আমার ভাব পায় নি ভাষায় রূপ, আমার উপলব্ধি পায় নি তার প্রতীক, আমার মানস পুরীতে এখনো রয়েছে সেই রাজকন্যা তন্দ্রাচ্ছন্না।

এখনো রয়েছে? আর একবার তাকিয়ে দেখলাম সেই চৈতন্যলোকে। ঠেলে যেতে হল অনেক ভিড়—এই নতুন শব্দের ভিড়, এই পালোয়ানী হুঙ্কার, এই ডাক-হাঁক। মস্তিষ্কের কোঠায় এরাও প্রবেশ করে বসেছে। এরা আমার চোখের মধ্য দিয়ে কানের মধ্য দিয়ে আমার চৈতন্য পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। ,আমার সমস্ত মনের ওপর এখন এরা ছুটোছুটি করে ফিরছে। রাস্তার ভিড়ের মতো এই শব্দের ভিড়, কারখানার ছুটি-পাওয়া মজুরের মতো এদের উগ্র কোলাহল।—এরই মধ্য দিয়ে আমার পথ করে যেতে হবে। কোথায়?—সেই সুদূর মহলে যেখানে সন্ধ্যাতারার দীপ জ্বল্‌ছে, যে আঁধারের মতো নরম আলোয় ঘুমিয়ে আছে নরম আমার প্রথম কল্পনা।

পথ কেটে যেতে হবে আমাকে—কোন্ পথে, কোন্ দিকে? আমি বিভ্রান্ত ভাবে হাতড়াচ্ছি, অন্ধের মতো খুঁজি, পথ আর পাই না। কিন্তু পেতেই হবে। সেই ভাবলোকের দুয়ার আমার পাওয়া চাই, আমাকে যেতে

হবে সেই মায়াপুরীতে, পেতে হবে সেই রাজকন্যার সন্ধান। তা পাই না বলেই তার দেহরেখা আমার আঙুলের ডগা বেয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না ; আমার কলমের কালি তাকে কেবলি আবৃত করে, তাকে রূপ দিতে পারে না ; আমার ভাষা ভাবের প্রতীক হয়ে উঠছে না, রয়ে যাচ্ছে অচল শিলা,—মন্ত্র নয়, উদ্ধত যন্ত্র।

কিন্তু কোথায় সেই রাজকন্যা ? তাকে চেনা দরকার, তাকে চাই প্রথম পাওয়া, ধ্যানের মধ্যে তার স্থির উপলব্ধি না লাভ করলে তাকে চৈতন্যেও আর স্থির ভাবে ধরে রাখা যায় না। তখন নানা কথায় তা ঘুলিয়ে যায় ; কথার জাল বুনে হতাশ হতে হয়, কথার পাষাণ খুঁড়ে আর মূর্তি বের করা যায় না। চাই ধ্যানের মধ্যে প্রথম তার প্রতিষ্ঠা—সেখানে তার দেহরেখা স্থির হয়ে উঠ্‌বে, ভাব সেখানে সকল অনির্দেশ্যতা মুক্ত হবে, গ্রহণ করবে তার নিজস্ব আয়তন—অনুভূতি হয়ে উঠ্‌বে উপলব্ধি, হবে অভিজ্ঞতা। চাই ভাবকে স্বস্থ করা। আমার মস্তিষ্কের ঘুরে বেড়াচ্ছে নীহারিকার স্রোত, শুভ্র অস্পষ্ট আর ছায়া,—রাশি রাশি কোটি কোটি অনুকণা, তাদের রূপ নেই, দেহ নেই, আকৃতি নেই,—তারা রূপের জন্য, জ্যোতিষ্কে মূর্তি হওয়ার জন্য অস্থির। সেই জ্যোতির্ময় প্রকাশ ভাবলোকে সত্য না হলে ভাষায় তার পরিণতি আস্‌বে কোথা থেকে ? আর চৈতন্যের মধ্যে তার কল্পনা একবার দেহাবয়ব স্বীকার করলে ভাষা তাকে ফাঁকিই বা দেবে কি করে ? তখন সেই অভিজ্ঞানেই অনুভূতি হবে অভিজ্ঞতা। ভাষাই সেই অভিজ্ঞান। চাই ভাবকে তাই স্থির ভাবে জানা, আমার অনুভূতিকে

ধরতে হ'বে একেবারে মুঠোর মধ্যে চেপে। অনুভূতির স্বরূপ বুঝতে হবে সুনিশ্চিত রূপে, তা হলেই অনুভূতি হবে উপলব্ধি। হাজার দিকে মুখ আমার এক এক অনুভূতির,—অথবা মুখই তার নেই, আছে কতকগুলি, অস্পষ্ট আব্ছায়া দেহ, আর সেই নীহারিকা-স্রোতে আছে এক একটা কেন্দ্র। কেন্দ্র তবু আছে, আছে ছায়াদেহ, তাই তার সৃষ্টিতে রূপ পাওয়ার চেষ্টা চলছে। আর তাই আমার অন্তরাকাশে তার এমন আলোড়ন জাগ্‌ল। সেই অনুভূতি-কেন্দ্রটাকে ঠিক মতো বুঝতে হবে, ধরতে হবে অনুভূতির স্বরূপ, আর তা হলেই জন্মাবে অভিজ্ঞতা, জন্মাবে নতুন নক্ষত্র।

আমি উঠে পড়লাম। সমস্ত বিকাল জুড়ে ও সন্ধ্যা জুড়ে আমার মাথায় আমার লেখা কথা তবু মারামারি করতে লাগ্‌ল। সূর্য নিবে গেল। বন্ধু বান্ধবের মুখ সম্মুখে—তাদের কথা কানে যাচ্ছে। সাম্‌নে খবরের কাগজের খোলা পাতা, কিন্তু আমার মগজে একটা অশান্ত কোলাহল। ভাব গুলিয়ে গেছে, নক্ষত্র হতে হতে আবার শূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে নীহার-স্রোত। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের অক্ষরের মধ্য দিয়েও ফুটে উঠ্‌ছে সেই আড়াই পাতার আমার আঁকা বাঁকা লেখা, সেই শত শত শব্দ-সরীসৃপ। আমার মন আবার সচকিত হয়—কোথায়, কোথায় তুমি, ভাবের রহস্যালোক যে আমার মানস-লোকে প্রথম চমকে গেছলে, ছুটে-পড়া তারার মতো, প্রথম প্রণয়ের মতো—অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট—কোথায়, কোথায় তুমি? "আবিরাবির্ম এধি।"

রাতের আলোয় আবার কলম নিয়ে বস্‌লাম;—তৃতীয় বার। আবার নতুন করে লিখে চল্‌লাম। চারিদিকে আলো নিবে গেল, রাত নিঃশব্দে বেড়ে চল্‌ল। বাইরে আধঘণ্টা পরে পরে সান্ত্রী প্রহর হাঁকছে, আমার মন জুড়ে

চলেছে এক গভীর আলোড়ন, এক মনন-প্রক্রিয়া, কঠিন, দুঃসাধ্য, দুশ্চর তপস্যা। আমার মনের কোঠায় এক অন্তহীন যুদ্ধ চলেছে, একটু একটু করে আমার মন নির্জিত করে নিচ্ছে তার বিরোধী শক্তিদের, একটু একটু করে মন হচ্ছে স্বপ্রতিষ্ঠ।—রাতের ঘুমের এলেকায়ও এ যুদ্ধ থাম্‌ল না; আমার নিদ্রিত বুকের উপর এই মাতামতি চল্‌ল,—আমি যেন কোন্ প্রাণহীন কবন্ধ, আর তার উপরে যেন দুই রণোন্মত্ত শক্তির হানাহানি চলেছে, তাদের পায়ের তলায় আমার ঘুম চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে আবার সবটা পড়লাম। আবার কেটে ফেলতে হল। ভাব, ভাব, ভাব—কে পায় ভাবের নাগাল ভাষার কাঠামোতে ছাড়া? কোন্ ধ্যানে ধরা পড়ে সেই অশরীরী সত্তা? চৈতন্যের স্রোত কথার কূলের মধ্যে ছাড়া বইতে পারে কিনা, কে জানে? আমরা তো আজ আর শব্দের প্রতীকে ছাড়া তার আভাস পাই না। সে কি নির্গুণ, নিরুপাধিক, আমাদের ধ্যানেরও অতীত? শব্দের প্রতীকেই কি আমরা শুধু তাব খোঁজ পাই? ভাষার প্রতিমার মধ্য দিয়েই কি আমরা দেখি তার প্রকাশ? ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতী; ভাষাই কি ভাবের শক্তি? বাগার্থ প্রতিপত্তি পার্বতী পরমেশ্বরের মতো? ভাব ও ভাষা এমনি শিবশক্তির মতো অবিচ্ছেদ্য, চির যুগানদ্ধ? আর তাই একেবারে এক? কল্পনার ও রূপের, এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব কি অচিন্ত্য?—অচিন্ত্য কেন হবে? এক সঙ্গে তারা জন্মেছে, বেড়েছে, চেতনায় যেই নতুন ভাব জন্মাল, জন্মাল সে তার ভাষার দেহ নিয়েই, নয় কি?

ক্রমাগত চেষ্টা করলাম এ কয় দিন। আমার সকাল-সন্ধ্যার উপরে চিন্তার আর ভাষার জাল পড়েছে; আমার আলাপ-আলস্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই শব্দ ও চিন্তা উচ্ছ্রিত হয়ে উঠ্‌ছে; আমার চোখের সাম্‌নেকার

এই শত শত চেনা মুখ, চেনা গাছ, চেনা পাহাড়, চেনা জগৎ আচ্ছাদিত করে রয়েছে এই কুয়াসার মতো পাৎলা লেখার আবরণ। উত্তরের পাহাড়ের চূড়া বেয়ে নিচে অবতরণ করছে ধোঁয়াটে মেঘ, উপরকার গাছের মাথা তার আড়ালে ঢাকা পড়েছে;—আমি কি তা চোখে দেখতে পাচ্ছি? আমার চোখের তারায় এ পৃথিবীর ছায়া নিশ্চয়ই পড়ছে, তার সূক্ষ্ম স্নায়ু বেয়ে তা মস্তিষ্কের দৃষ্টি-প্রকোষ্ঠে পৌঁছচ্ছে; আমিও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি এই নিম্নবাহী ধোঁয়াটে মেঘ। কিন্তু তবু আমার চোখে জাগছে এই কয়দিনকার লেখা অক্ষরগুলো, এই অসংখ্য বাক্যের অসংখ্য বীজাণু; আমার মস্তিষ্কে আন্দোলিত হচ্ছে অসংখ্য ধ্বনির অসংখ্য কোলাহল—এই সামনেকার পৃথিবীর চেয়ে তা সত্য নয়, কিন্তু তবু তা আমার সামনেকার পৃথিবীকে অস্পষ্ট করে তুলেছে। আর তারই পিছনে, তারই সঙ্গে জড়িয়ে একটি পথহারা, দৃষ্টিহারা স্বপ্ন এখনো ফিরছে আমার মস্তিষ্কের সৌরজগতে,—ঘূর্ণ্যমান নীহার-স্রোত চাইছে নবজ্যোতিষ্কে পরিণতি—আমি সে স্বপ্নকে পাচ্ছি না শব্দের প্রতীকে ধরতে, আমি সেই নীহার স্রোতকে পারছিনা দানা বেঁধে তুলতে। আমি পারছি না, পারছি না। আজ এ কয়দিন আমি বার বার চেষ্টা করেছি—বার বার; আর আমি পারি না, আমি পারি না।

আর না, আমি এবার লেখাটা ফেলে রাখলাম।

এই সোনার হরিণের শিকার আপাতত ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সত্য সত্যই লেখাটা আমার ফুটে উঠ্‌ল না কেন? এ প্রশ্ন মন থেকে তাড়াতে পাচ্ছি না। কোথাও একটা গলদ ছিল।

ভাবকে কি ঠিক চিনেছিলাম? দেখেছিলাম তার কেন্দ্র? দেখেছি? ভাব কেন তবে ভাষায় রূপ নিতে পারল না? অথবা ভাষা কেন ভাবের নাগাল পেলনা?—মূলে সমস্যাটা একই—প্রশ্ন অনেকগুলি, সমস্যা এক—ভাব ও ভাষার একাত্ম-সাধন। আমি অবশ্য ক্রোচের 'এস্থিটিক্‌স্‌' দেখেছি, তার সব কথা বুঝেছি এমন স্পর্ধা করতে পারি না। কারণ ক্রোচের বক্তব্য সম্ভবত এই যে,—আমি যতটা বুঝেছি,—ভাব জিনিসটাই ভাষা বা expression ছাড়া নয়, আইডিয়া বা ইমাজিনেশানের অর্থ হল ইমেজ তৈরী করা, রূপায়ন। তবু তাঁর দর্শনের ভাব বড় কঠিন, আর কাজেই ভাষাও কঠিন, এবং ভাষা কাজে কাজেই দুর্বোধ্য। আশ্চর্য নয় যে, ফ্যাশিস্তরা তাঁর গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দিয়েছে। কারণ, মুসোলিনির কথা ও ভাব দুইই ঠিক ক্রোচের উল্টো, তাতে মননশক্তির দরকার নেই। ক্রোচের কথা আবার শ্রবণ-মননেও কুলোয় না, তা নিদিধ্যাসন সাপেক্ষ। সৌন্দর্য-শাস্ত্র মূলত রূপশাস্ত্র, কথাটা মানতে বাধা নেই। শেলিকেও মানতে হয়—অবশ্য শেলির পক্ষে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়ঃ

"Language is a perpetual Orphic song,
Which rules with Daedal harmony a throng
Of thoughts and forms, which else senseless
and shapeless were.

কিন্তু ক্রোচে আরও এগিয়ে যান। সৌন্দর্যশাস্ত্র রূপশাস্ত্র—মানে, ভাব মাত্রই ভাষা, এই থেকে ক্রোচে যাত্রা করলেন। এসে ঠেকেছেন ইতিহাসে। কারণ ইতিহাস হল ভাবের প্রকাশ। হেগেলকে ঢেলে ক্রোচে বললেন—আইডিয়াই তো ইতিহাস, আর তা হলে ইতিহাসই

আইডিয়া। ভাষাও ইতিহাস, তা উপলব্ধির ইতিহাস; আর উপলব্ধি মাত্রই ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই প্রত্যেকের ভাষাই তার নিজের জিনিস, তার একান্ত আশ্রয়। আর ভাষা মাত্রই রূপ, তা হলে রূপ মাত্রই একান্ত, তা ব্যক্তিগত ইতিহাস, ইত্যাদি। তা হলে আমার সেই নিজের ভাষা আমি কেন খুঁজে পাচ্ছি না? ক্রোচের যুক্তি মান্‌লে মানতে হবে, আমার ভাবই আমার নিকট স্পষ্ট হয় নি। তা একটা ধোঁয়াটে ব্যাপার রয়েছে, উপলব্ধিতে তা জমে উঠ্‌তে পারে নি; তার কেন্দ্র নেই, আর তার পরিধি বা আউট-লাইন একেবারেই ঝাপ্‌সা। তা যেই দানা বেঁধে উঠ্‌বে, অমনি-দেখা দেবে শব্দ বা ভাষা, বেরিয়ে আসবে ভাবরূপ, জোভ-এর মাথা থেকে মিনার্ভার মতো—আয়ুধ-ধারিণী, পরিপূর্ণা।—কথাটা মেনে নিতে হচ্ছে, কারণ না মান্‌লেই বা তা অপ্রমাণ করি কি করে? ভাব যতক্ষণ ভাষায় রূপ না পাবে ততক্ষণ ভাব যে ছিল তার প্রমাণ নেই; আর ভাষায় যা রূপ পেল সে ভাব যে অস্পষ্ট তা-ও কেউ বল্‌বে না। তাই ক্রোচের যুক্তি মানাই ভালো; স্বীকার করাই উচিত, আমার দৈন্যটা ভাষার এবং তাই ভাবের; আমার কল্পনা যে রূপ পেল না তার কারণ তা কল্পনা নয়, জল্পনা; লিখতে গিয়েই আমার লেখা যে ঘুলিয়ে গেল তার হেতু আমার উপলব্ধিটা ঘোলাটে।

ভাষার সহায় ছাড়া ভাবকে পাওয়া যায় কি না তা একটা দার্শনিক তর্কের বিষয়। তা জানি; নানা খানে শুনেছি, প্রায় মেনেও নিয়েছি। আমাদের চিন্তা জিনিসটা আদি অন্ত ভাষার কোলে মানুষ। ও দুই রাজ্য এক রাজ্য, এই বোধহয় সিদ্ধান্ত—অর্থাৎ ভাষা মানে ভাব, আর ভাব মানে ভাষা। এ প্রায় অদ্বৈতবাত,—ক্রোচের চোখে ভাবের; আর মীমাংসকের চোখে হয়ত ভাষার। 'ইন্দ্র শত্রু নিপাত' বলতে ঝোঁক ভুল হল, ফলে

ইন্দ্র রূপ শত্রু নিপাত গেল না, ইন্দ্রের শত্রুই নিপাত গেল—ভাষার দোষে উল্টো ভাব সিদ্ধ হল।

তবু এ যুক্তি স্বীকার করতে বাধে। জীবনে আমরা আমাদের ভাব প্রকাশ মোটামুটি একভাবে করছি—বোবা কালারও একটা ভাষা আছে, তা দিয়ে তারা দিন চালায়। অবশ্য এ হল দোকানদারীর ভাষা। তবু তাতেও কি সবাই একই ভাষা বলে? তাও নয়। বাজারের ভাষায়ও প্রত্যেকের একটু না একটু বৈশিষ্ট্য থাকে। থাকুক, আমার তা নিয়ে সমস্যা নয়। আমি চাইছিলাম আরও একটু জটিল জিনিস—আমি বাজার করতে বেরুই নি। আমি দেখছিলাম—পাহাড়ের কোলের একটি দিন; দিনটি যেন মনের এক নূতন মহলের এক ঘুমন্ত রাজকন্যা। দেখেছিলাম যে তাতে ভুল নেই—তার দেহের আভাস পেয়েছিলাম, দেহের সুবাস পেয়েছিলাম। কেন ভাষায় সে রূপ পেল না? ক্রোচে বলবেন—সে দেখা দেখাই নয়, সত্য করে দেখা যায় ধ্যানে, এ ঝাপসা দেখা।

সত্যসত্যই কি নিতান্ত ঝাপ্‌সা দেখেছি? কিন্তু সব ভাবই তো প্রথম দিকটায় তা থাকে। কলম নিয়ে বসবার আগে কে দেখতে পায় তার মনের পট সর্বাংশে? জননী-জঠরে কে পায় দেখ্‌তে সেই অনাগত নব জাতককে? খানিকটা অবশ্য বুঝতে পারা যায়—বেশ খানিকটা, এমন একটা আভাস যাতে মনে রঙ ধরে, প্রাণে নেশা লাগে। দিনের চোখে যেমন উষার প্রথম আভাস, অথবা পাহাড়ে আগুন লাগার মতো। একটা ফুলকি যখন উড়ে পড়ে আমাদের পাহাড়ের বন-জঙ্গলের গায়, তখনি কি আমরা দেখতে পাই তার সমস্তটা? কিংবা প্রথম যখন বিকালের দিকে দেখি পাহাড়ে আগুন দিচ্ছে তখনি কি বুঝি কি হবে রাত্রির রূপ?—রাত্রিতে যখন চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে উঠবে; নিবিড় আঁধার আস্‌বে

আকাশ ছাপিয়ে, পাহাড়ের পিছনকার পাহাড় থেকে একটু একটু ক'রে বেরিয়ে আস্‌বে এই পর্বতপুরের অন্ধকার; গুহা থেকে, গহ্বর থেকে, বন থেকে, জঙ্গল থেকে, আদিম শৈলকন্দর থেকে যখন আঁধার ঘিরে আসবে এই পর্বতের কোল;—তখন এই পাহাড়ের আগুন যে রূপ নেবে ওই বিকালে কি তা বোঝা সম্ভব ছিল? রাত্রিতে তখন মনে হবে একটা নূতন রোমান্স যার সঙ্গে তেপান্তরের মাঠ ও দূরদূরান্তরের পরীরাজ্যের যোগ আছে, অন্ততঃ যা প্রতিদিনকার জগতের থেকে স্বতন্ত্র অন্য একটা জগতের কিছু—কিলেমিঞ্জোরের পায়ে কোন্ কাফ্রি জাতি বুঝি তাদের আদিম উৎসব জুড়ে দিয়েছে। অথচ প্রথম ফুল্‌কিটা তার ছিল সামান্য মাত্র, একটা উপলক্ষ্য। তারও দরকার হয় পূর্বে জড়ো করা বন লতা পাতা গাছ, দরকার হয় স্মৃতি ও বিস্মৃতিতে সঞ্চিত অনেক অনেক অচেতন ও অবচেতন মুহূর্ত, বাস্তবের পরিচয়। মনের আকাশে যখন এরূপ ফুল্‌কি উড়ে এসে পড়ে,—তা হ্যাম্পষ্টেডের নাইটিঙ্গেলের ডাক হতে পারে, সদর ষ্ট্রীটের ওপারের সকাল বেলার আলোর রেখাও হতে পারে, আর গ্রীক পুরাণ থেকে শুরু করে ম্যালেরিয়ার বীজাণু,—যা-কিছু আছে বা নেই,—সবই তা হতে পারে, সবই হতে পারে সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ—মোটের উপর তাতে আগুন থাকা চাই। তখন মনের চেতন অচেতন স্তরে নিগূঢ় যত বিস্মৃত বস্তুর ও ঘটনার স্মৃতি, যত অনুভূতি ও উপলব্ধি, যা মোটেই অপস্থত হয় নি—তাই হয় তার উপজীব্য; আর তাতে তখন মন প্রথম হয় রাঙা, তার পর তাতে ধরে শিখা, তারপর জ্বলে উঠে দাউ দাউ করে—বিস্মৃতি পারের আবেগ-অনুভূতি আগুনের লেখায় দেখা দেয় স্মৃতির পারে। তা'ই কল্পনা হয়ে জ্বলে উঠে এই পাহাড়ের আগুন-লাগা বনের মতো, তার আভা আকাশ পর্যন্ত ছোঁয়; ও পার্শ্বের সামনেকার, পিছনকার পাহাড়কে করে তোলে মৌন

প্রতীক্ষায় স্তব্ধ, বিস্মিত—এই আলোর পারের গাছ-গাছড়ার মতো তাকে ঘিরে দাঁড়ায় কত অশরীরী ছায়া, বিস্মৃত কত অভিজ্ঞতা। মন যখন জ্বলে উঠে, যখন নেশা ধরে, কিংবা ভূতে পায় মানুষকে—তখন, তখনি কি মানুষ তা বলে সর্বাংশে জানে সে নেশার স্বরূপ? গোড়াতেই জানে সেই অনুভূতির রহস্য? না, কলম যেমন এগিয়ে চলে, যেমন এগিয়ে চলে তার প্রয়াস, তার মনের দীপ্তি সেই অক্ষরের সীমায় সীমায় তেমনি রেখে যেতে থাকে আপনার স্পর্শ, তার মাথার মধ্যেকার হাজার মশালের দেউটি-ঘেরা মায়াপুরে তখনই সে দেখে প্রথম সুস্পষ্ট, সুনির্ধারিত রূপ? যেমনি এগিয়ে চলে কলম, অমনি একটু একটু ক'রে বেরিয়ে আসে অতীতের সঞ্চিত কত অভিজ্ঞতা? যেমনি চলে সৃষ্টির ক্রিয়া অমনি প্রথম আভাস পেতে থাকে রূপ, একটু একটু করে কল্পনা লাভ করে ভাষার দেহ।

আমার তো মনে হয়, এমনি করেই ভাব রূপ ধরে—এই তার পথ। প্রথম থাকে একটা আভাস, একটা প্রবল আলোড়ন বা আকর্ষণ। তারপর তা ক্রমশ মনকে ঘিরে ধরে, ভিতরে-বাইরে সব interpenetrated lie তার ঔজ্জ্বল্যে আর দীপ্তিতে—আর অস্বস্তিতে। হাঁ, অস্বস্তিতেও। তখন একমাত্র সে অস্বস্তি দূর করবার জন্য কাজ হয়ে দাঁড়ায় কলম নিয়ে বসা। অবশ্য কলম নিয়ে যখন মানুষ বসে তখনো তার মনে থাকে নেশার ঝোঁক, তখনো তার উত্তেজনার সমস্ত রূপটা তার চোখে ফুটে উঠে না, তখনো মন আগুনে-রাঙা, অনেকটা উদ্দীপ্ত, অনেকটা অস্থির—আগুনের নিমন্ত্রণ পেয়ে যেমন আমাদের পাহাড়ের শুকনো বন লতা পাতা অস্থির হয়ে ওঠে, তেমনি। তারপর ধীরে ধীরে আগুন হয় উজ্জ্বল জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। আর না হয় তা ধোঁয়াবে—যেমন আমার মনে এখন ধোঁয়াচ্ছে।—তারপর যাবে এক সময়ে নিবে। আর সে বিপদ কাটিয়ে উঠ্‌লে দেখ্‌ব, আবেগ

হয়েছে স্থির, বস্তু ও ঘটনার অনুভূতি হয়েছে চেতনায় জমা—আর এরই নাম emotion recollected in tranquillity. এরই নামতো কল্পনা? কিন্তু লেখার মুখে কে নিতে পারে অনুভূতির সমস্ত মাপ জোঁক কষে? তার সম্পূর্ণ ডিজাইনই কি মনে জাগে? জাগে পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে মনে? মানে কল্পনা কি আজন্ম সুসম্পূর্ণ? না, একটা আভাস লেখার মধ্য দিয়ে বদ্‌লে বদ্‌লে, ভেঙে গড়ে একটা ডিজাইনে এসে পৌঁছে? মানে, শব্দ আর তার অর্থ আর ধ্বনির সংযোগে কল্পনা রূপ নেয়? গ্রীক ইউনিটিজের তত্ত্ব জানি, রেসিন মলেয়েরেরও নাম শুনেছি, বেন্ জন্‌সন্ গিলেছিও,—পরীক্ষার দায়ে নয়, কৌতূহলে, এলিজাবেথীয় নাটকের নেশা যখন আমাকে পেয়ে বসেছিল,—টম্ জোন্‌স আমার প্রিয় উপন্যাস। তবু আমার মনে হয়, কল্পনা আর ডিজাইন এক নয়। মানে, শব্দ দিয়ে না গড়লে কল্পনা থাকে অরূপ, বিষয়বস্তু তার প্রাণ নয়। বিষয়বস্তু নিয়েই গড়ে উঠে অবশ্য পরিকল্পনা, গল্প উপন্যাসের আসল কথাই হল কথা। কথা মানে, জীবনের জ্বলন্ত চিত্র। সেখানে তাই আগে থাক্‌তেই একটু আঁচ করা চলে—ডিজাইন। কিন্তু কতটুকু চলে? কথাশিল্পের চরিত্র এক হতে হতে আর হয়ে ওঠে। কবিতার তো বোধ হয় তেমন ডিজাইন্‌ও আঁচ করা প্রথম সম্ভব নয়। তার ভাব আর ফর্‌ম্ অচ্ছেদ্য, আর তা গড়ে উঠেও সৃষ্টি-ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তাই মনে হয়, ক্রোচে যাই বলুন;—অমন গোড়া থেকে আঁটঘাট বেঁধে লিখতে কেউ বড় বসে না। গল্প উপন্যাসও আর প্রথম উন্মেষ থেকে ষ্টীল ফ্রেমে আঁটা থাকে না। অনেকবার সে লেখে, অনেকবার সে কাটে; যাচাই করে, বাছাই করে; বুদ্ধি দিয়ে বানিয়ে নেয়, চিত্র দিয়ে শানিয়ে তোলে। হয়ত আবার এক-বারেই শেষ আঁক দিয়েও লেখক কখনো বা নিঃশ্বাস ফেলে স্বস্তির।

কিন্তু যাই করুক, আরম্ভটা তার এরূপই—অনেকটা ভূতে-পাওয়া অবস্থায়।

এখানেই মুশকিল—এ ভূত সব সময় এরিয়েলের মতো বাধ্য নয়। পৃথিবীতে প্রোসপেরোও জন্মেছিল একবার ষ্ট্রাটফোর্ড-অন্-এ্যাভনে। কিন্তু তবু ভূত মানুষকে পায়, আমাদের মাথায় ঝড় তোলে, জাহাজ ডুবোয়; সংসার থেকে, পৃথিবী থেকে, আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দেয় কোন্ অজানা সমুদ্রের অচেনা দ্বীপে। তারপর? তারপর—সে অধ্যায় আমাদের সুপরিচিত। কিন্তু ভূত আমাদের পায়, মাঝে মাঝে। আর আমার বিশ্বাস সে কোথায় নিচ্ছে, কোথায় নেবে, তা সম্পূর্ণ করে বোঝার সময় আমাদের থাকে না। তার পূর্ব্বেই আমরা তাকে মাথা থেকে নামাতে চাই। পরে অবশ্য আমরা বুদ্ধি দিয়ে তাকে বশ করতে চেষ্টা করি, আর কতকাংশে করিও।

আগুনের ফুল্‌কিই তবু সবটা নয়। এমন কি এই অতল অনুভূতির ভাণ্ডার খোলবারও সময়-সময় দরকার হয় না। বুদ্ধি দিয়ে কথা সাজালেও চলে। অনেকে অনায়াসে তা দিয়েই একটা কিছু দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারেন, এ আমরা প্রতিদিন দেখি। ওই আগুনটুকুরও দরকার তাঁদের নেই। লেখার 'আঙ্গিক' তাঁদের হাতে রয়েছে। কলমের ডগায় তা অপেক্ষা করছে, কলম হাতে নিতেই তা বেরিয়ে পড়ে। তাঁদের কলমে কালি থাক্‌লেই তাঁদের ভাব আছে বোঝা যায়। আর যদি কালি না থাকে, যেমন কলমে কালি পুরে নেওয়া যায়, তেমনি মাথায় তাঁদের ভাব অমনি পুরে নেওয়া চলে, উপলব্ধি জিনিসটার জন্য দুর্ভাবনা তাঁদের নেই, ও বস্তুর প্রয়োজনও তাঁদের

উপলব্ধি হয় না। অথচ অনায়াসে তাঁরা একটা কিছু গড়ে ফেলেন—কুমোর-টুলির কুমোরের মতো তাঁদের আশ্চর্য নৈপুণ্য। হাত তাঁদের পেকে গেছে; মনের সড়কগুলো তাঁদের একেবারে আস্‌ফাল্‌ট দিয়ে মাজা-ঘষা, যে-কোনো গাড়ী ছেড়ে দিলেই তা ইচ্ছামতো ছুটে চল্‌বে নিঃশব্দ, নিশ্চিন্ত।—তাঁদের মনে আগুন ধরে না, মাথায় লঙ্কাকাণ্ড হয় না, এবং কাজেই ভাবের আগুন নেবাতে অসমর্থ হলে মুখও পোড়ে না। শুধ্ আঙ্গিকের জোরে তাঁদের কথার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে—মন তাঁদের একেবারে ফাঁকা থাক্‌তে পারে, থাকেও। কোথা থেকে আসে এই জিনিস ভাব আর ভাষা যদি হয় একাত্ম? কেউ বলবে—ওটা কাগজের ফুল, ওতে গন্ধ নেই, ওতে প্রাণের ছোপ নেই, ওর রঙ আছে, রস নেই। তা হবে। কিন্তু রস বাজারে পাওয়া যায় না—ও জিনিস খাঁটি শ্যাম্পেনের থেকেও দুষ্প্রাপ্য। আমরা তো বিয়ার পেলেই বর্তে যাই; এমন কি জলেও চলে। আর এ জগতেও অধিকাংশেই বলবে, যদি জানতে চাও আমার wish কি?—whisky! সাহিত্যের পান-শালাতেও ভারমুথ্ দুর্লভ; 'জনি ওয়াকারই' এখনো গোয়িং ষ্ট্রং! আর ও বস্তু তুচ্ছ নয়। যেমন করেই হোক্, শুধ্ লেখা—আঙ্গিক আয়ত্ত থাক্‌লেই যা গড়ে তোলা যায়—তা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। অথচ কি আশ্চর্য, এই আঙ্গিকের জন্য কারও কারও মাথা খুঁড়তে হয় না, মাথা মুড়োতেও হয় না—ও আপনিই এসে যাচ্ছে। ওর জন্যে কোন অস্বস্তি নেই, আগুন নেই, জ্বালা নেই, ঔজ্জ্বল্য নেই। জীবনী-শক্তির কোনো ক্ষতি এ করে না, স্নায়ুতে আয়ুতে কোথাও ওর কোনো চাপ অনুভব করা যায় না। এ ধরণের লেখা সব চেয়ে কম ভাব ও কম আবেগ দিয়ে সব চেয়ে বেশি মাল বানায়—মিনিমাম খরচে ম্যাক্সিমাম উৎপাদন, এর চেয়ে সাহিত্যিক-ইকনমির আর কি বড় কাম্য হতে পারে? অথচ প্রভূততম লোকেরও প্রচুরতম আনন্দ

জোগায় আজ এই লেখাই—যা প্রথম শ্রেণীর লেখকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখা, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের প্রথম শ্রেণীর লেখা। যেমন, বাংলায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর লেখা—যা প্রথম শ্রেণীর লিটররি জর্ণালিজম। সাহিত্যে এই চেষ্টারটন-চৌধুরীরা second class first, জর্ণালিজমএ first class.

এই আঙ্গিক আয়ত্ত করতে কি লাগে ?

আঙ্গিক অবশ্য অনেকাংশেই ভাষার কৌশল, কি করে শব্দের সঙ্গে শব্দকে গেঁথে তুলতে হয়, ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনিকে, সমকালবর্তী ও পূর্বকাল-বর্তীদের লেখা থেকে তা অনেকটা বুঝে নিতে হয়। এজন্যে চাই একটু চাতুর্য। এই চাতুর্য না থাক্‌লে আঁচই করা যায় না আঙ্গিকের সূত্রগুলো কি, দরকার কোন্ জিনিসটা, কোন্ মাল-মস্‌লায় কি দাঁড়ায়। কথাটা খুব সামান্য নয়। অনেক বড় বড় লেখকও তা সম্পূর্ণ বুঝে উঠ্‌তে পারেন না। অনেকের মাথায় ভাবের তুফান বয়, কিন্তু এই কৌশলটা কিছুতেই মাথায় জোগায় না। দিগ্বিজয়ী ব্যারিষ্টার যেমন, শোনা যায়, মামলার সমস্ত রহস্যকে উদঘাটন করতে পারেন, অথচ নিজের স্যুটকেসের চাবি ডানে ঘোরে কি বাঁয়ে ঘোরে তা বোঝেন না ; গানের ওস্তাদ যেমন ছন্দের দিশে পান না। অথচ, এ চাতুর্য খুব দুর্লভ বস্তুও নয়। হাজার লোকের হাতে আজ বাঙলা কবিতা এমন নির্ভুল বাজে যে দেখে নিশ্চয় হেমচন্দ্রের কিংবা নবীনচন্দ্রের, এমন কি মাইকেলেরও, তাক লেগে যেত। যে কৌশল তাঁরা আয়ত্ত করতে পারেন নি, আজকের থার্ড-ইয়ারী ছেলে ও থার্ড-ইয়ারী মেয়েরও তা অনায়াস লভ্য। জিনিসটা এখন সাধারণ সম্পত্তি হয়ে গেছে। শুনে শুনে আমাদের কান এখন সহজেই ধরতে পারে এর গোড়াকার সূত্রগুলো। এ চাতুর্য আমাদের কাছে এখন তাই আর কঠিন কিছু নেই। কিন্তু

বাঙলা গদ্যের বেলা এখনো আমাদের কান তেমন একটা চাবি খুঁজে পায় নি। The other harmony of prose বাঙলায় এখনো সৃষ্টি হয় নি;—তবে হচ্ছে। তার কারণ গদ্যের গীতটা সহজ কাঠামো মানে না, তার তাল বড় সূক্ষ্ম, অন্তত অসম্ভব রকমের তা বিচিত্র। তাই এখনো এর সূত্রগুলো আবিষ্কার হয় নি। এখনো শুধু চাতুর্যে ও কৌশল আয়ত্ত হয় না। বাঙলা গদ্যের আঙ্গিক কি করে তা হলে ধরা যায়? শুধু লেখো; লেখো, ঘষো, মাজো: লেখো। যখন সময় পাও লেখো, যেমন ভাবে ইচ্ছা লেখো, যা খুশী ইচ্ছা লেখো, শুধু লেগে থাকতে হবে। তারপর, আপনি আপনি ভাষা তোমার আয়ত্ত হয়ে যাবে, আপনি আপনি তা তোমার কলমে এসে বাসা বাঁধবে, আপনি আপনি সব হবে। তোমার কিছু করতে হবে না, শুধু কলমে নিয়ে বসে থাকতে হবে; প্রায় যন্ত্রের মতোই চলবে তোমার লেখা—যন্ত্রের মতো নির্ভুল, নিরঙ্কুশ এবং অনায়াস।

সত্যই যন্ত্রের মতো। চাবি টিপলেই বেরুবে একটা নির্দিষ্ট কথা। আর যন্ত্র যেমন মানুষের শ্রম লাঘব করেছে, এই আঙ্গিকও তেমনি লেখকদের বাঁচিয়েছে অনেক উদ্দীপনা, উদ্বেগ ও অস্বস্তি থেকে—অনেক জীবন-ক্ষয়কারী আবেগ ও অভিজ্ঞতা থেকে। লেখা সহজ হয়েছে, স্বাস্থ্যকর হয়েছে, রীতিমত ভদ্র হয়েছে।

আঙ্গিকের সহায়ে লেখা সহজ হয়, একটা ভদ্রগোছের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, এইটা কম কথা নয়—তাতে লেখক বাঁচেন। তাঁর মাথায় আগুন জ্বলে না, মন পুড়ে খাক হয় না। তা একটা স্বস্তি, পরম স্বস্তি।—

কিন্তু সত্যিই কি সে স্বস্তি এ ভাবে লেখকের কপালে জোটে? শুধু আঙ্গিকের কৌশলে লেখক পারেন মাথার ও মনের আগুনকে ছাই-চাপা দিতে? না; তার বলে দুনিয়ার হাটে লেখক পার পেতে পারেন, কিন্তু নিজের কাছ থেকে পার পাবেন না, জীবনের কাছ থেকেও ছাড়পত্র পাবেন না। জীবন দাবি করে সৃষ্টি; আর শুধু আঙ্গিক দিয়ে তা হয় না। মন দাবি করে অনুভূতির প্রকাশ; শুধু আঙ্গিক তার নাগাল পায় না। তাতে রাজকন্যাকে ছোঁয়া যায়, তাকে ঘিরে জাল বোনা যায়—কিন্তু তাকে জীইয়ে তোলা যায় না। লেখা তাতে উৎরে যেতে পারে, কিন্তু লেখা তাতে রূপলাভ করে না। বাজারে তা বিকোবে, কিন্তু তাই বলে তা সৃষ্টি হবে না।

এইটাই তো সমস্যা—লেখা সহজে রূপলাভ করে না, সৃষ্টি হয় না। আমার লেখাও তাই বাজে লেখা হয়ে রইল। অবশ্য তার আঙ্গিকও আমি আয়ত্ত করি নি। কিন্তু আঙ্গিক আয়ত্ত করব কি করে? আগে দরকার ভাবকে চেনা—স্পষ্ট করে চেনা, একেবারে আপনার করে চেনা, প্রত্যক্ষ দেখা,—তার স্বরূপ অবিষ্কার করা। এই খানেই তার প্রথম শুরু। মনে যেই দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠে আমরাও একেবারে জ্বলে উঠি—কিছু দেখি না, চিনে নিই না। শুধু উচ্ছ্বাসের মুখে নিজেকে ছেড়ে দিই, ভাবি অনুভূতি আমাকে ভাটি বেয়ে ঠিক ঘাটে পৌঁছে দেবে। কিন্তু তা প্রায়ই হয় না। যা মনে হয় অনায়াসে পাওয়া—তাও অনায়াস নয়, তারও স্বরূপ চেনা হয়ে ছিল হয়ত আগেই, emotion recollected in tranquillity. এখন এল বিনা বাধায়। স্বরূপ তার চেনা হয়ে ছিল। অনুভূতির সেই স্বরূপ না বুঝলে চলে না। তার প্রাণমূল ঠিক বোঝা চাই। কারণ অনুভূতি আধ-আলো আধ-আঁধারের দেশ, সে স্তিমিত আলোর রাজ্য।

তার রাজপুরীতে মহলের পরে মহল। আর আবেগের আড়ালে কোন মহল যে শেষ হয়, কোন মহলে গিয়ে আমরা পৌছি, তা জানতেও পাই না। শুধু মহল ঘোরাই সার হয়। রাজকন্যা আর জাগেন না, তার রূপও ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যায়। তাই অনুভূতিকে বিশ্বাস নেই। সে তো শূন্যের নীহারের স্রোত—তার কেন্দ্রে তাকে ঘনিয়ে তুলতে হবে, দানা বেঁধে তুলতে হবে—তাকে জমিয়ে তুলতে হবে,—তবেই না হবে সে উপলব্ধি। শুধু অনুভূতি তো হাজার মানুষের স্নায়ু চেতনা বেয়ে হাজার মানুষের বুকে জমছে; আর স্নায়ু ও আয়ুর মধ্যে রেখে যায় তার অস্পষ্ট কম্পন। কিন্তু তাকে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই তাকে ধরা যায়—চেতনায় তার দান স্থির হয়, দান যোগ হয়। উপলব্ধি মানে হল তাই অনুভূতিকে ধরা, ভাবকে আয়ত্ত করা,—কোন বিশেষ ভাবটি আমাকে সাড়া দিয়েছে, আমাকে নাড়া দিয়েছে, বাইরের জীবন থেকে এসে দিয়েছে আঘাত, না, আমারই অন্তর থেকে ঘাত প্রতিঘাতে উঠছে—লক্ষ্মীর মতো- কি তার স্বরূপ, তা ঠিক মতো জানা আর বোঝা। কারণ তার এতটুকু স্বরূপ না জানলে তার রূপও ফোটানো যায় না।

জীবনযাত্রার চলন্ত চিত্র যদি আমার মনে ছায়াপাত করে তা হলে সে অনুভূতির মূলত প্রকাশ আমাকে খুঁজতে হয় জীবনচিত্রে—অর্থাৎ কথাশিল্পে। সে রাজকন্যা কথাপুরীর রাজকন্যা—সে জাগলে অমনি কথাপুরীর মহলে প্রাণ-চাঞ্চল্য জেগে ওঠে, খাঁচার শুকসারি কথা কয়ে ওঠে, নহবৎখানায় বেজে ওঠে নহবৎ, ঘোড়াশালে জাগে ঘোড়া, হাতীশালে হাতী, হাটবাজারে হাজার মানুষের কল-কোলাহল। এই এক জীবনযাত্রার রূপ। সবাই বিশিষ্ট, আর তাই সকলে মিলে বিচিত্র। সেখানে আসল সত্য হল ওই জীবনযাত্রার রূপ —তার চলন্ত চিত্র। পরিবর্তমান জীবনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-চরিত্রের পরিবর্তন ও

বিকাশ। তার জন্য শব্দের প্যাটার্ন বুনতে বসা হয় ভুল। আর কথাশিল্পে আমরা তো শব্দচিত্র খুঁজিনে, চাই দেখতে চরিত্রের বিকাশ, জীবনের গতি ও বৈচিত্র্য, সেই রসের আস্বাদ। অবশ্য শব্দ-চিত্রও তাতে করা চলে—কারণ অন্তর্জীবনের আর বহির্জীবনের মধ্যে সর্বদাই দেওয়া নেওয়া চলছে, তাই যেখানে এই জীবন-যাত্রার অন্তর্নিহিত দিকটি ফোটাতে হবে, অমনি গীতময় শব্দের কৌশল প্রয়োগ করতে হয়—যেমন সেকসপীয়ের করেছেন নাটকাব্যে, কিংবা হ্যামলেটের গদ্যাংশেও, যেমন রবীন্দ্রনাথ করেছেন চতুরঙ্গে—আসলে তা জীবন চিত্রই নয়, বরং চিত্রের ছলে অনুভূতির প্রকাশ—যেমন নাকি প্রস্ত করেছেন। আজকের এই বন্দী-ঘরের আমাদের জীবনের একটা দিনের ছবিও যদি আঁকতে বসি, তা আঁকতে হবে আসলে আমাদের জীবনযাত্রার রূপ ফুটিয়ে—এই হাসি গল্প, কর্তাদের নোটিশ, খুঁটিনাটি এমনি সব দিয়ে। কিন্তু তাতেই কি তার সব হবে ? হয়ত তাতেই সব হতে পারে, ফুটে উঠ্‌তে পারে এই দিনটির রূপ, এর তুচ্ছতা, এর সামান্যতা, বৈচিত্র্যহীনতা, বৈশিষ্ট্যহীন আশ্চর্য রূপ। এমন কি ফুটে উঠ্‌বে এর অস্বাভাবিকতা, হয়ত এর একঘেয়েমি—একই পাহাড়, একই মেঘ, একই গাছ, একই মানুষ, চোখ মেলে দেখি দেড় হাত দূরে একই মুখ, হোক্ তা বন্ধুর মুখ,—চোখ বুজে দেখি একই অন্ধকারে বন্ধ্যা দিনরাত্রির একই অন্তহীন ছায়া। হয়ত শুধু ঘটনার চিত্র দিয়ে বন্দীদের এই চলমান দিন আর তার অচলতা, বর্ণময় পাহাড় আর তার বর্ণহীনতা, এ সব প্রকাশ করা যায়। কিন্তু এই একঘেয়েমির অনুভূতিই মনেও একটা আবার সাড়া জাগায়, আর তা দাবি করে একেবারে তীব্র আন্তরিক প্রতিবাদ। হৃদয় তা হলে কথা কয়ে উঠ্‌বে শব্দে, ধ্বনিতে, সঙ্গীতে, কাব্যে। তার ভাষা হবে ইঙ্গিতময় শব্দ। ঘটনা-বহুল চিত্রের ফাঁকে ফাঁকেও খানিকটা এমনিতর ধ্বনি-বহুল অনুভূতির প্রকাশ থাকে। জীবনেরই তো দুই মহল,

বাইরের জীবন আর অন্তরলোক। দুই উপাদানেও অনেকখানে তাই মেশানো চলে—আমরা ধ্বনি দিয়ে ঘটনা বলি, তা'ই গাথা ও তা'ই মহাকাব্য, নাট্য-কাব্য, ময়মনসিংহ গীতিকা এমনি জিনিস। তবু তাতে ঘটনাই প্রধান—আর তার মূল বাহন কথাশিল্প। সেখানে তাই বোঝা দরকার কোন্ ঘটনা-সত্যকে আমি খুঁজছি—তার স্বরূপ জানা, তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেখা। অর্থাৎ চাই ভাববস্তুকে ঠিক মত চেনা, আর গেঁথে তোলা, ঠিক মত গুছিয়ে তোলা অশেষ সমুদ্র থেকে, সংহত করা সেই কথা। এইটা কথাশিল্পের অন্তরাঙ্গিক। তেমনি অনুভূতি-মূলক যে সত্য—যে-ভাব-কল্পনা—তা ধ্বনি-প্রধান ; আর তার বাহন হল কাব্য ও সঙ্গীত। সেখানেও দরকার চেনা সেই অনুভূতির স্বরূপ—তাকে গেঁথে তোলা উপলব্ধিতে, গুছিয়ে তোলা কল্পনায়। চাই ভাব-কল্পনাকেও সংহত করে লওয়া। এই হবে কাব্যের অন্তরাঙ্গিক—তার ভাব-কল্পনার স্বরূপ চেনা। এই গেঁথে তোলা, গুছিয়ে নেওয়া, সংহত করা, এই দিকটাকেই হয়ত ক্রোচে বলেছেন ধ্যান। ওসব রহস্যের প্রশ্রয় দিয়ে কাজ নেই, একে বরং বলি কল্পনা-শক্তি, সৃষ্টি-শক্তি ; আর এই সৃষ্টিশক্তি মূলত জন্মগত। সব মানুষের তা নেই—অবশ্য সব মানুষেরই তা খানিকটা আছেও—আছে অনুভূতির শক্তি, আছে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়,—নইলে তারা কবির কল্পনাও বুঝ্‌ত না, ঔপন্যাসিকের চিত্রও ধরতে পারত না। জীবনের সঙ্গে খানিকটা সবারই পরিচয় আছে। সৃষ্টিশক্তি নেই, কিন্তু তার বোধ-শক্তি আছে। তবু খাঁটি শিল্পী হচ্ছে প্রকৃতির একটা নতুন পরীক্ষা, মানুষেব মধ্যে ও ব্যতিক্রম। অবশ্য এই পরীক্ষায় সেই নতুন মানুষও প্রকৃতির প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। লাল প্যান্‌সির পাপড়ি তার রঙ্ বদ্‌লাতে পারে না, কিন্তু কবি তার মনের রঙিমা থুইয়ে ফেল্‌তে পারে

নিজের অবহেলায়, প্রতিবেশের চাপে। যাই হোক্, সৃষ্টিশক্তি সর্বত্র সফল হয় না, সর্বত্র একরকমেরও তা নয়, আর সকলের তো তা নেইই। আর এ শক্তির প্রথম কাজ হল ভাবকে গেঁথে তোলা—হাজারমুখো যে ভাব, গহন-গভীর যার আবেগ-প্রবাহ, কিংবা ঘাত-প্রতিঘাতে চির-চঞ্চলের মধ্যে যে মিশে আছে। এই ভাব-কল্পনা ও ভাব-বস্তুকে সংহত করা, তার স্বরূপ বোঝা—এই হল সৃষ্টির শুরু। তা বুঝ্লে পর তখন প্রকাশের পথ চেনাও খানিকটা সহজ হয়। মানে, কোন্ দেশের রাজকন্যা সে, জান্লে বুঝতে পারা যায় সেই রাজকন্যার দেশে কোন্ পথ গিয়েছে। সে কি ভাবাবেগের পথ, instinct এর এলেকা, emotionএর ছায়াপথ? তা হলে চাই সঙ্গীত, চাই কাব্য, চাই instinctive কোনো প্রকাশ-বাহন। কাব্যেও সে বাহন শব্দ। শব্দের ইঙ্গিতে আর সঙ্গীতে মিশিয়েই আমরা কাব্যে উপলব্ধিকে প্রকাশ করি—প্রকাশ করি সেই আন্তরাভিজ্ঞতা। কিন্তু শব্দই এই অভিজ্ঞতারও অভিজ্ঞান: সেই অনুভূতির, সেই উপলব্ধির আর অভিজ্ঞতার পথ শব্দ দিয়েই গাঁথা। আর এক-একটা শব্দের মধ্যে দেখেছি নানা মানে মিশিয়ে থাকে। বিশেষ ভাবকল্পনার জন্য দরকার তাই শব্দের বিশেষ মানে আর বিশেষ ধ্বনিটিকে গেঁথে নেওয়া, জাগিয়ে দেওয়া, সাজিয়ে তোলা। আর শব্দের এই বিশেষ মানে আর বিশেষ ধ্বনিকে বের করে আনে ছন্দ, আনে বাক্-রীতি, আর বাগ্ভঙ্গী। এক-একটা শব্দের যা মানে আর যা ধ্বনি, দশটি শব্দের দশ রকম সারে বসে তা'ই দশ দিকে পথ দেখিয়ে দেয়। ছন্দের গুণে আর এই বাক্যের শব্দ-সমাজে বসে তার বিশেষ মানেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাতেই ভাব রূপ লাভ করে। নইলে তার প্রকাশ ব্যর্থ হয়—প্রকাশ প্রকাশই হয় না। এই শব্দ গাঁথাটাই হল বহিরাঙ্গিক—সাধারণত ওকেই আমরা বলি আঙ্গিক বা টেক্‌নিক বা form. কিন্তু আসলে এ আঙ্গিকও তো একা চলতে পারেনা—তারও

প্রাণ গাঁথা অন্তরাঙ্গিকের সঙ্গে, দুয়ে মিলে তবেই কবি-কর্ম পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে, ভাব-রূপ স্থির হয়, লেখা হয়ে ওঠে মূর্ত।

এমনি এক অদ্ভুত সমন্বয় লেখা—ভাব-বস্তুর আর ভাব-কল্পনার সমন্বয়, অসংখ্য ভাবের মাঝ থেকে বিশেষ ভাবরূপটি সংহত করা ; আবার শব্দের বহু ধ্বনি ও বহু মানের মধ্য থেকে ছেঁকে লওয়া তার দরকারী মানে ও ধ্বনি ; শব্দ ও ভাব দুয়ের মধ্যে স্থাপন করা আবার সমন্বয়,—অন্তরাঙ্গিক ও বহিরাঙ্গিকে রাখা সুসঙ্গতি। এমনি অদ্ভুত আর অসম্ভব কাজ—কল্পনার আর বস্তুর গোড়াকার বিরোধকে মেনে নিয়ে তার সমাধান, ভাবের অস্পষ্ট আভাসকে করে লওয়া সুসংহত, শব্দের সমুদ্র থেকে মন্থন করে লওয়া সেই অমৃত—আবার ভাব আর ভাষা আর বস্তু সকলকার সমন্বয় সাধন।

এরই নাম সৃষ্টি—আর তা না হলেই লেখা হয় বাজে লেখা। আমার লেখাও এই জন্যই বাজে লেখা হল—আমি তার ভাব-রূপকে সংহত করে নিইনি—তার স্বরূপ চিনিনি, রাজকন্যার দেশও ভালো করে খোঁজ করিনি। আর তার পরে আমি খুঁজতে গেলাম শব্দের পথে সেই উদ্দেশহীন দেশের ঠিকানা ; আর সেখানেও পথে পথেই আমার সময় শুধু কেটে গেল, আমি শব্দের নিশানাও ধরে উঠতে পারলাম না। লিখলাম বারে বারে—লিখলাম বাজে লেখা।

সৃষ্টির পথে আসলে অনেক বাধা। একে তো শক্তি সবার নেই—কারণ সে শক্তি জন্মগত। বলেছি, লেখক প্রকৃতির একটা বিশেষ পরীক্ষা, একটা নূতন আবির্ভাব। জীবজগতে এমনি পরীক্ষা প্রকৃতি বারবার করে—তারই নাম variation. মানুষের জগতে দেহের variation আর বেশি চলে না—চলে অন্তর্গঠনে অসম্ভব বৈচিত্র্য। শিল্পী তেমনি এক বিচিত্র বিকাশ আমাদের সমাজে। তাই সে বিকাশ এত সহজেই ব্যর্থও হয়। জীবজগতেরও

variation প্রায়ই আয়ুহীন হয়। আর মনুষ্য-জগতেরও বিচিত্র শক্তিধররা নিজেদের আয়ু খুইয়ে ফেলেন, কখনো খোয়ান নিজের দোষে, কখনো খোয়ান পরিবেশের চাপে। নিজের দোষে—মানে, মনের অলসতায়, দেহের অলসতায়, শুধু সাড়া না দেওয়ার ইচ্ছায়, শুধুই কুণ্ঠায়, শুধুই ঢিলেমিতে, আড্ডায়, গল্পে, প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়নায়, 'ফ্লেশের' পিপাসায়। কত অসংখ্য তার ওজুহাত, কত নগন্য আর কত অগণ্য হতে পারে এই বাধা। ভাবকে সংহত করা, শব্দকে উদ্ধার করা, সৃষ্টি করা—দুর্বার প্রয়াস তাতে চাই। হয়ত অনায়াসেও তা আয়ত্ত হতে পারে; তবু কত তাকে ঘষ্‌তে হয়, মাজতে হয়। কত যুদ্ধের ফল তা, কত দ্বন্দ্বের সমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের লেখা তো সেই দ্বন্দ্বের ফলে ছবি হয়ে গেল। আশ্চর্য কি, যদি আমার লেখা হয়ে ওঠে আমার ব্যঙ্গচিত্র? সৃষ্টির এই দাবি তাই শিল্পী ফাঁকি দিতে চান। শিল্পী চান স্বস্তি। স্বস্তি আলস্যে নেই—তবু আলস্যে একটা মোলায়েম অবসর আছে। কে তা না চায়? তাই সৃষ্টিশক্তি হয়ত থাকলেও অনেক সময়ে অবহেলিত হয়ে থাকে। হয়ত তা বাইরের চাপে চাপা পড়ে। বাইরের জগতে দাম যার বেশি মানুষ তা'ই পেতে চাইবে—তাই সৃষ্টির তাগিদ সেখানে খুব কম। আমি ছবি আঁকব শুন্‌লে আমার আত্মীয়-সমাজ কপালে করাঘাত করবেন। লেখক হবার থেকে আমার ওপর ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হবার চাপ অনেক বেশি। তাতে অবশ্য জাত-লেখকের মনের ধার খুইয়ে না গিয়ে বাড়তেও পারে—তার মনের আর বাইরের সংঘাতে তার অনুভূতি খরতর হয়ে উঠ্‌তে পারে। কিন্তু মোটের উপর অনেকেই থাকেন নীরব কবি, করেন ওকালতি—এদেশে; আর আরও নীচের তলায়—যে দেশে শতকরা সাতজনের অক্ষর-জ্ঞান আছে—সেদেশে হয়ত তাঁর সৃষ্টি হয় কবি গানের পালা রচনা, আর পাঁচালি গান!

না, সৃষ্টির পথে বাধা অনেক। লেখার পথে পদে পদে বাধা। হয়ত মশার কামড়ে লেখকের ধ্যান ভেঙে যাবে। হয়ত বা কার্লাইলের মতো তার যকৃৎ অথচ শক্তি কার্লাইলের মতো নেই; তখন লেখা কি করে লেখা সম্ভব? হয়ত পঁচিশ জনের ঘরে মন ভিড়ের চাপে হাঁপাচ্ছে—সত্যই লিখতে বসবারও অবকাশ লেখক পাচ্ছে না—পঁচিশ জনের কথার আঘাতে ভাব আর শব্দ জমতে পাচ্ছে না, সংহত হতে পাচ্চে না।

আর ভাবই কি সহজে আয়ত্ত হয়, সহজে সংহত হয়? কত ভাবে তা ফাঁকি দেয়। কত ভাবে এক-এক ভাব আমাদের decoy করে নিয়ে যায় দিগ দিগন্তরে—তেপান্তরের মাঠে। আর ভাষাও তো কত ভাবে ভাবকে ফাঁকি দিতে পারে। অল্‌ডাস্ হাক্‌সলি এই কথাই বলেছেন তাঁর ব্যঙ্গের ভাষায়—ইতালীয়রা যদি বলে amore, আন্‌তে হয় dolore; সঙ্গে সঙ্গে তাদের মন ওই শেষ কথার ভাবগত নির্দেশের দিকে ধাবিত হয়, এর ফলে ইতালীয় প্রেমের কবিতা যা হবার তাই হয়েছে। এমনি করে ফরাসীদেরও amour এর সঙ্গে মিল দিতে dolour আন্‌তে হয়; আর ফলে সেই শব্দের চাবিতেই খুলে যায় ভাবের একটা নতুন কোঠা। জার্মাণ Hertz এর চাবি টিপ্‌লে Schmertz প্রতিধ্বনিত হবে, আর উঠ্‌বে তুমুল আবেগের তুফান। কিন্তু ইংরেজি love একেবারে গন্ধ মাখা, ওর সঙ্গে glove ছাড়া আর কোনো কথার মিল নেই। প্রসঙ্গত জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, আমাদের বাঙলা 'প্রেমের' সঙ্গে মিল কিসের? 'হেমের'? 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম'। কথাটা কি সত্য যে, প্রেম বললেই আমাদের মনে হেমের ভাবনা জাগে?—মোটের উপর, শব্দও যে ভাবকে সৃষ্টি করে তা মান্‌তেই হয়। এই তো খানিক আগে আমি যখন লিখছিলেম, 'আরম্ভটা তার এরূপই, অনেকটা ভুতে পাওয়া অবস্থায়'; মনে পড়ল—এ ভুত Puck এর মতো, নিজের খেয়াল খুশীতে চলে, পরের

বশ হয় না—করা যায় না তাকে বশীভূত?—তারপর সেই ভাবের সূতো ধরে দেখা দিল একটি কথা—Ariel। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দুটি তিনটি দিকে ভাবনা চলে গেল, শেলির 'Ariel to Miranda', আঁদ্রে মরোয়ার 'Ariel', আর বলা বাহুল্য, সেক্‌সপীয়রের সেই আনন্দময় আত্মা Ariel। শেষটিই আমার দরকার, তার কথা মনে জেগেছিলও সর্বাগ্রে। তাই, ভাবনা চল্‌লো এ পথে—'এ ভূত সব সময়ে আরিয়েলের মতো বাধ্য নয়'। তারপর, 'পৃথিবীতে প্রস্‌পেরো একবারই জন্মেছিল ষ্ট্রাটফোর্ড অন্ এ্যাভনে'। এর পরে এই শব্দ খুলে দিলে দুটি জানালা—একটি প্রস্‌পেরোর বিদায় দৃশ্য, আরটি সমস্ত 'টেম্পেষ্ট'। Ariel এই একটি শব্দে খুলে গেল আমার মনের গবাক্ষ:

Charm'd magic casements, opening on the foam
Of perilious seas, in faery lands forlorn.

আর ঠিক এরূপ একটি শব্দেই বন্ধ হয়ে গেছল কীটসের মনের এই magic casement:

Forlorn, the very word is like a bell,
To toll me back from thee to my sole self.

আবার, শুধু কি শব্দই ভাবের নিয়ন্তা? কাগজের শেষ দিকে পৌঁছুলে যে আপনা থেকেই শব্দ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, ভাব হয়ে ওঠে শঙ্কিত—অন্য পাতায় গেলে পাছে তার ঐক্য নষ্ট হয়। দেখছি, কাগজের ডিজাইন্ দিয়ে ঠিক হয় লেখার ডিজাইন্। রয়াল আটপেজির পাতা স্থির করে রেখেছে

আমার ভাষার সীমা ও ভাবের পরিধি। আমার উপলব্ধির রূপ নির্ধারিত হয় আমার খাতার বা প্যাডের কাগজের মাপে। আর একি শুধু আমারই? শুনেছি, আনাতোল ফ্রাঁসও তাই বলতেন—প্রুফে সাত বার মাজলে ঘষ্‌লে তবে যাঁর লেখা তাঁর মতে রূপ নিত, সেই ফরাসী 'ফর্মের' সিদ্ধাও বলতেন: কাগজের 'ফর্মা'ই ঠিক করে লেখার 'ফর্ম'।

বক্সা, এপ্রিল, ১৯৩৩।

মুদ্রাদোষ

অসহ্য গরম। অসম্ভব লেখা। আমি লেখকও নই—আমি লিখতে পারি না, লিখতে চাইও না। তবু আমাকে লিখতে হবে। তবু লিখতে হবে—কারণ, আপনাদের হাতে-লেখা জেলের কাগজ বেরুবে।

আপনাদের কাগজের অবশ্য কোনো কাগুজে লক্ষণ নেই—তবু কাগজের দাবি তার আছে—"লেখো, নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই--লেখো। তুমি লেখক না হলেও লিখতে হবে, লেখক হলেও লিখতে হবে। তোমার শরীর ভেঙে পড়লেও লিখতে হবে, তোমার মন টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও লিখতে হবে।" অথচ কোনো কাগুজে লক্ষণ আপনাদের নেই—না আছে মুদ্রা, না আছে মুদ্রাযন্ত্র। কাগজের ওসব না হলে চলে? কাগজ জিনিসটাই মুদ্রাযুগের জিনিস; আর মুদ্রাদোষ ওর সমস্ত দেহে—দেহে মনে, চেতনায়। মুদ্রাযন্ত্র আসলে মুদ্রার হাতের যন্ত্র, ধনিকতন্ত্রের উপকরণ।

আপনারা মনে করেন—কাগজ ফোর্থ এষ্টেট্, রাজসভা। তাও সত্য, তবে বণিকই সেই রাজা। কাগজ এ যুগের রাজসভা, রাজসভা এ যু গে র—যখন সভ্যতা রাজসভা ছেড়ে রাজপথে এসেছে, যখন রাজা-বাদসার দরবারে আর আবদ্ধ নেই, এমন কি উজীর ওম্‌রাহের মজলিস্‌ও আর নেই, জমিদার-জায়গীরদারের পর্যন্ত দিন ফুরিয়েছে। 'মুদ্রা-রাজ্যের' সেই পরোয়ানা নিয়েই মুদ্রাযন্ত্র জন্মে। মুদ্রাযন্ত্র দেখা দিলে বুঝতে হবে সভ্যতা একেবারে বাজারে এসে উপস্থিত হচ্ছে, তা কারো জমিদারী নয়—তা সওদার জিনিস, সওদাগররা তার কাণ্ডারী। সেই সওদার জন্যই চাই তাদের পর্চা—চাই সংবাদপত্র—বণিক্ রাজার বিজ্ঞাপনী। আর বিজ্ঞাপনই হল সংবাদপত্রের

রক্ত। এই হল ফোর্থ এষ্টেট—সওদাগরের যুগের প্রধান বাহন। মানে, ফোর্থ এষ্টেট্ও অন্য এষ্টেটের মতোই। যে যখন কর্তা সে তখন সেই দেশও শাসন করে। মুদ্রাযন্ত্র উঠল মুদ্রার যুগের রাজত্ব ঘোষণা করতে। আজ টাকা যার আছে সেই প্রেসের রাজা। টাকা যার আছে প্রেস তার কথাই কয়। তার কথাই অন্যান্য এষ্টেট্ও বলে, বলে আইন সভার সাধারণরা, আইন সভার অভিজাতরা, আর বলে এই সওদাগরী সভ্যতার হাতে-গড়া জিনিস—সংবাদপত্র। মুদ্রাজীবী যুগের অস্ত্র মুদ্রাযন্ত্র,—তারই জোরে যুদ্ধ জয় হয়, তারই চেষ্টায় যুদ্ধ বাধে। আর মুদ্রাযন্ত্রের এই চাবিকাঠি মুদ্রার—মানে, সওদাগরের। সওদাগরের দরকারে যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধ চলে, তারই কথা মত পার্লিয়ামেণ্ট কথা বলে, চলে প্রেস্, চলে প্ল্যাটফর্ম। এ যুগের রথী সে—আমরা তার সারথী, তার কথা মতো রথ হাঁকাই—লেখা জোগাই, এমন কি খবরও জোগাই তার দরকার মত।

সত্য বটে, আজও আমাদের দেশে আমরা কাগজকে অতটা ব্যবসা করে তুলিনি। আমাদের খবরের কাগজ একটা স্বপ্ন মনে নিয়ে জন্মেছিল—দেশকে জাগাব! আমরাও তাই এখনো ভাবি—ওটা ব্যবসা নয়, ওটা আমাদের স্বদেশীর অস্ত্রাগার। এ ছাড়া আমাদের কি আর অস্ত্রাগার আছে? কথা আর লেখা ছাড়া, কণ্ঠ আর কালি ছাড়া কি আছে অস্ত্র? এজন্যই আমাদের সংবাদপত্র 'স্বদেশীর' শস্ত্রাগার।

সত্যই তাই। তবে স্বদেশীর অর্থ টা আমরা ঠিক বুঝি নি। দেখ্‌বেন—স্বদেশী মানে দেশী ব্যবসা। যতই 'স্বদেশী' জম্‌বে ততই তা ব্যবসা হয়ে উঠ্‌বে। 'স্বদেশীর' যুগ এল—দেশী ব্যবসা বাণিজ্য জন্মাতে লাগ্‌ল। 'স্বদেশী' চাই, কাপড়ের মিল গড়ে উঠ্‌ল, দেশী মিলওয়ালা দেখা দিল, দেশী ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হল—বোম্বাই জন্ম নিল, জন্ম নিল গান্ধীজীর আহমদাবাদ। আরও স্বদেশী

জমবে, দেখবেন আমাদের কাগজের কাটতি আরও বাড়বে—বিজ্ঞাপন পাব ; আবার আমাদের নর্থক্লিফ বিভারব্রুক দেখা দেবেন, আমাদের হার্ষ্ট দেখা দেবেন, আবার আমাদের মিৎসুই-মিৎসুবিশির হাতে আমাদের কাগজও কথা কইবে। এই হল নিয়ম—'স্বদেশী' মানেই ব্যবসা। আমাদের স্বদেশী কাগজও ক্রমশই হবে বড় কারবার, ক্রমশই হবে ব্যবসা ; হবে আমাদের সওদাগরের যুগের যোগ্য বাহন—মানে খাঁটি ফোর্থ এষ্টেট। আজ সেই 'স্বদেশী' আমাদের জন্মাতে পারছেনা বলেই না এই 'ফোর্থ এষ্টেট' এখানকার বিদেশীদের হাতে এতটা লাঞ্ছনা সইছে। সইতেই হবে। কারণ, বিলেতী সওদাগর আমাদের সওদাগরদের বাজার ছেড়ে দেবে না—মানে, সাম্রাজ্যবাদ আমাদের 'স্বদেশী' সইতে পারেনা, স্বরাজ সইতে পারে না। তাই স্বরাজ স্বদেশীদের সাধন, আমাদের সাধন। দেশী সওদাগরী-যুগের যুদ্ধ আমরা যুঝছি, আর এজন্যই দেশী সংবাদপত্রের জন্ম। তা যেমন বাড়বে—তেমনি ব্যবসা হয়ে উঠবে। উঠছেও—এখনি তা ব্যবসা হয়ে উঠছে। আমবা হতভাগ্যরা ভাবি ওটা স্বদেশীর অস্ত্রাগার। জানি না, এ অস্ত্রাগারেরও পিছনে আছে তার কর্তা সওদাগর। জানি না, আর তাই মনে করি সংবাদ-সেবা বুঝি একটা বড় 'স্বদেশ-সেবা'। কিন্তু সে ভুল ভেঙে যাবে, দেখবেন। মানে, আমরা সারথীরাও বুঝছি—বেতনের কত দরকার। আর রথীরাও জানেন—আমাদের "স্বদেশীয়ানা"ও বাজারে কেনা যায়। বুঝছি—পৃথিবীর বাজারে সংবাদের ব্যবসায়ে আমরা জোগানদার আর ওঁরা মালদার। যতই দিন যাবে ততই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অথচ আমরা ভাব্‌ব বুঝি আমরা বড় একটা কিছু করছি—দেশের লোককে চালিত করছি, দেশের মনকে শাণিত করছি, দেশকে গড়ছি, জাতকে গড়ছি, গড়ছি ভাষা, সাহিত্য। আমরা তা ভাব্‌ব—কারণ, আমাদের হাতে আমরা কোদালি ধরি না, ধরি কলম,

আর তাই মনে মনে কল্পনা করি—'আমরা লেখক।' আর তার পরে 'আমরা মালিকের মগজ'. 'এ যুগের মেধা।' আর তাই—'আমরা হাত-পায়ের সঙ্গে চলিনে, তার উপরে থাকি, চালাই'। 'আমরা মজুর নই, মগজ, ; অতএব,' আমরা হাত-পায়ের সংগে চলি না'। মানে, চলিই না। আর মালিকও তাই মজুরীর বিনিময়ে আমাদের মত 'মগজ' কেনেন—আর ছাড়ান। না কিনেও বেকার মগজীদের পান, তাঁর কাগজ চলে। বিজ্ঞাপন আছে, কাগজ চলে ; বিজ্ঞাপন-লোভী আছে—কাগজ চলে ; ছাপার হরফে নাম বেরুবে, ভারী নামের অধ্যাপক সেই লোভে লিখবেন ; নামের মুদ্রা-মান আছে, নাম-করা লেখকও তাই কাগজে লিখবেন ; বেকারে লিখবে, বিকারে লিখবে ; প্রচারের সুযোগ আছে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও তাই লিখবেন—লিখ্‌বেন—আর কাগজ চল্‌বে। কাগজ চল্‌বে—আর আমরা back-number এর মত আবর্জনায় চলে যাব,—এই আমাদের নিয়তি।

এই আমাদের নিয়তি। মুদ্রাদোষ আজ সভ্যতার গায়ে—পৃথিবীই মুদ্রাঙ্কিতা। অন্তত মুদ্রাযন্ত্র তারই কথা কয় যে মুদ্রার মালিক। আর সংবাদের সওদায়ও মালিকের মর্জিই বড় কথা। সংবাদ কেন, পৃথিবীতেই আজ মালিকের মর্জি মূল কথা। 'পৃথিবী টাকার বশ'। সত্যি, টাকা মূল কথা—মুদ্রা চাই, মুনাফা চাই ; তাই মালিককেও আবার খুঁজতে হয় মুনাফার পথ। আপনি কাগজ চালাবেন—দেখবেন লোকে যেন তা কেনে, যেন বিজ্ঞাপন পান। অবশ্য, ও দুশ্চিন্তা রুশিয়ার কাগজের নেই, তার কারণ সে দেশ সওদাগরেব দেশ নয়—কাগজেও বিজ্ঞাপন তাই নেই, মুনাফার রাজত্বও নেই। আপনাদের

জগতেরই মত আর কি? তফাৎ শুধু—ওদের যন্ত্র আছে আর আপনাদের যন্ত্র নেই, আছে যন্ত্রণা।—যাক্। কাগজ চালালে, কাগজে মালিকের বিজ্ঞাপন পাবেন যদি বিজ্ঞাপন-দাতা জানে লোকে সে কাগজ কিনছে। এবং বিজ্ঞাপন-দাতার মুনাফা ও স্বার্থ সে কাগজে নষ্ট হচ্ছে না। এ দুয়ের মধ্যেও একটা সীমা আছে। বিলাতী বণিকও আমাদের দেশী কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়—আর দেশী বণিকও বিলাতী কাগজের কৃপার ভিখারী হয়। মানে, মুনাফাটা প্রধানত ব্যক্তিগত, দলগত বা জাতিগত নয়। কাগজের মালিকের তাই দেখতে হয় তার কাগজের কাট্‌তি হবে কিসে, লোকে কি চায়,—আর লোকে না চাইলেও কি করে লোককে আকৃষ্ট করা যায়। লোকের কৌতূহল জাগাতে হবে—এক নিমেষের জন্য হলেও জাগাতে হবে।

এই কৌতূহল জাগাবার পক্ষে বড় জিনিসই হল নতুন কথা। মানে, সংবাদ; তা'ই news. কৌতূহল জাগে পুরনো কথায়ও—যদি নতুন দৃষ্টিতে তা দেখা যায়, আর কৌতূহল জাগে তা নতুন করে পেলে। মূলত, news হবে new। যা নতুন তা মানুষ মুখ তুলে দেখে। নতুন চাই—এই হল নিউজ্‌-তত্ত্ব। "কুকুরে আপনাকে কামড়ালে তা সংবাদ হয় না, আপনি কুকুরকে কামড়ালে তা হবে সংবাদ"—এই হ'ল এক সাংবাদিকের কথা। যা স্বাভাবিক তা কি সংবাদ নয়? যা ব্যতিক্রম তা'ই নতুন, তা'ই সংবাদ? আর দেখুন, এই সংবাদপত্র থেকেই এ কালের ইতিহাস আমরা লিখবো বলি। তা হ'লে লিখবো নাকি প্রধানত দিনের ব্যতিক্রমের ইতিহাস? কাগজে দেখবেন, কল্‌কাতা সহরে ১৯৩৫ সালে পথে বেরুলেই রাহাজানি হ'ত, মানুষ মোটরে চাপা পড়ত, স্ত্রী অপহৃতা হ'ত, ইত্যাদি। এই ১৯৩৫এর কল্‌কাতা, সংবাদপত্রের কল্‌কাতা। এ সব মিথ্যা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু এই কি সত্য?

সত্য। সংবাদপত্র সমসাময়িক ইতিহাস—মানে, যে ইতিহাস সত্যকে গোপন কর্‌তে গিয়ে বলে ফেলে, যে ব্যতিক্রমে নিয়মের কথাই আরও ঘোষণা করে। আপনি কুকুরকে কামড়ালে সেই কথাটাই ঘোষণা কর্‌তেন, যে,—১৯৩৫ সনে মানুষ কুকুরকে কামড়াতো না। তাই আপনার কথাটা হয়েছে উল্লেখযোগ্য—যেহেতু তা একেবারে নতুন।

'নতুন চাই,' 'নতুন চাই,'—এ যুগের এই নির্দয় তাড়া দেখি সংবাদপত্রে। কোনো দিকে তার চোখ নেই—লক্ষ্য শুধু জীবনযাত্রা আর তার বাস্তব প্রকাশ, তার ঘটনা আর ঘটনা, তার গতিময়তা। জীবনের এই সাক্ষীই সংবাদপত্র আর সাংবাদিকরা—জীবন-রসের অধিকারী আমরা নই। তাই লেখক আমাদের না হলেও চলে। কিন্তু তবু জীবনের এই সাক্ষ্য জড় কর্‌তে গিয়ে দেখি—তারও রূপ আছে, তারও রং আছে, আর জীবন-রসের রসকণায় তাও নিষিক্ত। জীবনের কোনো বস্তুই রূপহীন নয়, বর্ণহীন নয়, রসহীন নয়। আর এই রূপ রস রেখায় মিলিয়ে বস্তু বা ঘটনাকে দেখ্‌লে, জীবনের সেই ছেঁড়া-ছেঁড়া টুক্‌রো জিনিস আর নিস্প্রাণ থাকে না। তখন ঘটনার গায়ে যেন একটু নতুন চিকণতা দেখা দেয়; তাতে ঘটনা সংবন্ধে মানুষের আরও কৌতূহল জাগে, সে তা জান্‌তে উৎসুক হ'য়ে ওঠে। এই কৌতূহল জাগাতে না পার্‌লে, সংবাদপত্রের চলে না—ঘটনা 'সংবাদ' হয় না। 'তাই ডাক পড়ে লেখকদের—'জীবনের এই বর্ণ রেখা দিয়ে সাজাও জীবনযাত্রার কথাকে'। লেখকেরাও এগিয়ে আসেন। নতুন মহাদেশের বিস্ময়ে তাঁরাও স্বাধীনতার স্বাদ পান--আর

তাঁদের শুধু নির্ভর করতে হবে না রাজারাজড়ার মর্জির উপর। তাঁরা এবার লোক-সমাজের নজরানা পেলেন—সংবাপত্র দিল তাঁদের টাকা আর বড় প্রকাণ্ড আসর, গুণীর মজ্‌লিস্ আর মানুষের মেলা। তখন সংবাদপত্রের অক্ষর-গোণা সীমায় লেখকরা আসর-মাফিক রস জোগান—দেখা দেন চেষ্টারটন, দেখা দেন বেলক্, নেভিনসন। অক্ষর গুণে তাঁরা লেখা সাজান—আর অক্ষরের ওজনেই তার দামও হয়। এমনি করেই লেখারও নূতন আসর জুটেছে—এ্যাডিসন ল্যাম্ব থেকে কিপ্‌লিং ও ফ্রাঁস, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউ সে আসরে বস্‌তে দ্বিধা করেননি। আর সংবাদপত্রেরও সেই পাঁচমিশেলি আসরে আবার নতুন নতুন আয়োজন দেখা দিয়েছে। রস নূতন ভাবে পরিবেশনের সুযোগ হয়েছে—দেখা দিয়েছে এ যুগের ছোট গল্প, এ যুগের ছোট কবিতা, এ যুগের নিবন্ধ, এ যুগের প্রবন্ধ—আলোচনা আর সমালোচনা। অর্থাৎ লেখকদের না হ'লে সংবাদপত্রেরও আর চলে না। আর তাই অ-লেখকদেরও শিখতে হ'য়েছে মানুষের মর্জি, মানুষের রুচি; শিখতে হ'য়েছে ঘটনার তত্ত্ব, চিন্‌তে হ'য়েছে ঘটনা কি? কারণ, তাই আসল কথা। আমাদের লেখার দাম হ'ল রস দিয়ে নয়, ঘটনা দিয়ে। খবরের দামেই সাংবাদিকের লেখার দাম। তাই শিখে নিতে হ'য়েছে তার সঙ্গে-সঙ্গে লেখার সংকেত, কথা সাজাবার, শব্দ গাঁথবার আর ভাবকে ঢেলে সাজবার কৌশল—যেন ঘটনা মূর্ত হয়ে ওঠে। আর তাই সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আজ কাগজ পেতে পাশাপাশি বসে গেছেন—তাঁদের তফাৎ চোখ এড়িয়ে যায়।

আমরা অলেখকরাও কথার কৌশল একটা আবিষ্কার ক'রেছি—আর তাতে গড়ে উঠেছে নতুন একটা শৈলী—জর্ণালিজম্। অলেখকদেরও এভাবে লেখক বানিয়েছে সংবাদপত্র। অলেখকদেরও কাজ হ'য়েছে লেখা।

লেখা তাদের লিখতে হয়—কারণ, জীবনযাত্রার দাবি তা'ই। লিখতে হয়, কারণ এই সভ্যতা তাদের চায়—তাদের না হ'লে চলে না। এ কালের তারাই বিশেষ সৃষ্টি। এমনি এ কালের আরও সৃষ্টি আছে—চলচ্চিত্র আছে, বেতার আছে, আছে বিমান। আরও হয়ত কত আসবে, হয়ত ভাবী কালের কথা তাদের মধ্য দিয়ে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সংবাদপত্রকেই এ কালের খাঁটি মাল বলা চলে। এই জীবন্ত, এই চলন্ত কাল—এমন ক'রে তার কথা কে আর কোথায় বলতে পারত?—চলচ্চিত্র পারেনি, বেতারে এখনো পারছে না, আকাশে শব্দ বোনা এখনো সার্থক হয়নি। এখনো কাগজেই তার দাগ লেখা হচ্ছে—ঘণ্টায় বিশ হাজারখানা কাগজ ছাপিয়ে, লক্ষ-লক্ষ কাগজের পাতা উড়িয়ে, কোটি কোটি অক্ষরের মালা বুনে। কী জীবন্ত আর কী চলন্ত এ কাল! এক মুহূর্ত স্থির নেই—তিষ্ঠোবার উপায় নেই—অসংখ্য কাজ, অসংখ্য অকাজ, আয়োজন আর আবর্জনা—আর সকলের উপর কী তার গতি!

আর এ গতির ঝড়ে আমরা অলেখকরাও হয়েছি কত বড় সত্যের সারথী। প্রতি নিমিষে আমরা সংবাদ খুঁজছি; সংবাদ সাজাচ্ছি। কত কাজ, কত অকাজ। প্রতিদিন আমরা জীবনের ঝড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছি—ঢেউয়ের তলায় তলিয়ে যাচ্ছি, আবার ভাসছি। এক নিমেষ দাঁড়াই না, নিঃশ্বাস নিতে পারি না। এই লবণসমুদ্রের মধ্যে আমাদের একি অশেষ আলোড়ন! প্রতি নিমেষে ঘটনার ঢেউ ভেঙে পড়েছে মাথার উপর, প্রতি নিমেষে নতুন ঘটনার তরঙ্গ-চূড়ায় ভেসে উঠতে হচ্ছে, প্রতি নিমেষে নতুন গর্জনে ঢেউ আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আবার টেনে নেয়—আমরা ঢেউ কাটি, ঢেউ সই। প্রতি নিমেষে এই সংগ্রাম,—চোখের পলক ফেলবার অবকাশ নেই, একবার তিষ্ঠোবার সময় নেই। প্রতি প্রভাতে এই নতুন অভিযান, নতুন সংগ্রাম, নতুন

জয়—দাঁড়ালেই পরাজয়—সমুদ্রের আবর্জনার মত শুধু পড়ে থাকব বালুর শয্যায় ! একি অদ্ভুত আমাদের জীবন—কোন্ সিসিফাস্-এর মতো এই অশ্রান্ত পরিশ্রম। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই, রাত নেই দিন নেই, একি নিয়তি—দেখো, দেখো, দেখো ; আর লেখো, লেখো, লেখো। একি নিয়তি—একি নিষ্ঠুর নিয়তি। আড়াল নেই, অবকাশ নেই—লেখক নও তুমি, তবু লেখো—লেখো লেখো', —একি ভয়ংকর অভিশাপ—লেখো, লেখো, লেখো। জীবনযাত্রা প্রচণ্ড প্রবাহে ছুটেছে—কিছু থেমে নেই, কিছু থামতে পারে না—তুমিও থাম্‌তে পার না, থামাতে পারবে না কলম—'লেখো, লেখো, লেখো—" প্রতি নিমেষে জীবনের এই ডাক আসছে। প্রতি নিমেষ তার কানে যুদ্ধের আহ্বান, তা মানতেই হবে। এই হল সংবাদিক—যোদ্ধা সে। হয়ত শুধু পদাতিক ; কিন্তু জীবনের যুদ্ধ থেকে সে পলাতক নয়।

এ যুগের এই অভিযানে এই আমাদের বড় পরিচয়। আমরা লিখি আর লিখি। আমরা জীবনের সাক্ষ্য সঞ্চিত করি, আমরা জীবনযাত্রার স্বাক্ষরকে ধরে তুলি। তাতে করে আমাদেরও হাতে লেখা একটা নতুন দান পেল। আমরা অলেখকরা তাকে দিলাম স্বচ্ছতা। সে সহজ হল। ভাষা সহজ হল। ভাবুন—এ কত বড় দান ! এমন সাধনা আর কি আছে—এই সহজ হওয়ার সাধনার মত ! আমরা তাকে দিলাম—একটা চলন-সই রূপ, দিলাম কাজ চালাবার মত একটা পরিচ্ছদ, আর দিলাম যা সব চেয়ে বড় শক্তি—স্বচ্ছন্দ গতি। এই অলেখকরা আমরা ভাষাকে স্বচ্ছ করলাম, স্বচ্ছন্দ করলাম,—এই আমাদের সব চেয়ে বড় গর্ব, সব চেয়ে বড় সাধনা। আর এ সাধনা যে কি আপনি বাংলা ভাষার দিকে তাকালেই বুঝ্‌তে পারবেন। এখনো তা স্বচ্ছন্দ হতে পারে নি—লেখকের দৌরাত্ম্যে তা পোষাকী হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তাতে

চমক লাগে, তার চমৎকারিত্ব বেড়েছে—কিন্তু সহজ সে হতে পারছে না, 'কাজের ভাষা' হতে পারছে না।' প্রাঞ্জল, সচ্ছন্দ অনায়াস—আর সর্বোপরি গতিশীল—কোথায় সে বাংলা গদ্য? হয়ত অলেখকের হাতে হাতেই তা তৈরী হয়ে উঠবে মুদ্রাযন্ত্রের যন্ত্রণাগারে। আমরা জানি ঐ আমাদের লেখার গুণ—তা বাজারের জিনিস, তা কেনাবেচার কাজে সাহায্য করবে, সাহায্য করবে দুনিয়ার দোকানদারীতে, সাহায্য করবে দুনিয়াদারীতে —আর তারই মধ্য দিয়ে শেষে লেখক যিনি তিনি তৈরী করবেন—the other harmony of prose. আমরা তারই পথ করছি।

সৃষ্টি আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আমাদের কাজ হল বলা—সহজ করে, সুস্পষ্ট করে বলা—হৃদয়-গ্রাহী করেও বলা। কিন্তু বিষয় বস্তুর দামই আমাদের দাম, কথাটাই আমাদের আসল লক্ষ্য—সুর নয়, ছন্দ নয়, কল্পনা আর সংগীতে মেশানো রস-সৃষ্টি নয়। সে কাজ লেখকের, যাঁরা রস-রচনা করবেন—রসবোধকে তাঁরা জীইয়ে তুলবেন; সে কাজ কবিতার, সংগীতের, সে কাজ চিত্রের রসশিল্পের। আমরা অ-লেখকরা গদ্য রচনা করি, বলি তথ্য; তথ্য বলি আর তত্ত্ব শোনাই। কাজের কথাই গদ্যের কাজ, অন্তরের কথা হল কাব্যের কাজ। গদ্য দিয়ে কাজ করবার চলে, অথবা দশ জনের সঙ্গে বোঝাপড়া করি, মানুষকে করি সজ্ঞান—আর সচেতন। কাব্য দিয়ে লেখকরা মানুষের অন্তরে অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন, মানুষকে করেন প্রাণবান আর সৃষ্টিশীল। তাঁদের রস-রচনা আর আমাদের কাজের রচনায় গোড়ার তফাৎ এই। সংগীত আর কল্পনা বড় হলে কথা আড়ালে পড়ে যায়, বাস্তব তার নিজের স্বাক্ষর হারিয়ে ফেলে। অবশ্য তাতেও তার মর্মবাণী বেজে উঠতে পারে। মনে করুন্ 'বলাকা'। এ যুগের গতিবেগ এমনভাবে আর কোথায় মূর্ত হয়েছে? কিন্তু মনে করুন আবার কবিরই 'যোগাযোগ'।

শুধুই যেন বাঁশী বেজে গেল, মীরার ভজন ছেয়ে দিলে মনের আকাশ। কিন্তু মানুষ কই? মানুষ দেখা গেল এক ঝলক শ্যামার মধ্যে। জীবন একবার চমক দিয়ে ছিল, জীবন-যাত্রা থমকে রইল বরাবর। সংগীত আর কল্পনায় মিলে তার ওপরে একটা অনুভূতির আড়াল রচনা করলে—দু'এর মধ্যে পড়ে কুমুদিনী আর মানুষ হয়ে ফুট্‌ল না, 'চরিত্রবতী' হয়ে উঠ্‌ল না, সংগীতময়ী হয়ে ঝরে পড়তে লাগ্‌ল। এমনি ভাবে কবির ধর্ম ঔপন্যাসিকের কথা-কর্মকে ঢেকে দেয়। এজন্যই কবিও আজ এ যুগের কথা বল্‌তে পারেন না, যুগের মর্মকথা প্রকাশ করতে পারেন না। এযুগের সে কথা বল্‌তে পারেন বরং ঔপন্যাসিক। নাট্যকারও তা বল্‌তে পারেন না—নাটকও একটা সংঘাতের মুহূর্তকে গ্রহণ করে বটে, আর তারও প্রাণ ঘটনা—action. আর এ যুগ ঘটনায় মুখর, সংঘাতে সংবুদ্ধ। তবু নাটক এ যুগকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না—একটা বিশেষ সংকট-নিমেষেই নাটকের চরিত্র ফুটে ওঠে। নিমেষটিই তার সব—যখন জীবনের পথ-রোধ হয়েছে, আর মানুষ ঘটনার সংগে সংঘাতে নেমেছে, ন্যায়-অন্যায় ধর্মবোধ তার আর টিক্‌ছে না, এমনি এক ট্রাজিক নিমেষ। কিংবা বিক্ষোভ শেষ হয়েছে, এসেছে ছোট বড় দ্বন্দ্বের অসামঞ্জস্য ভরা কৌতুকের দিন—তেমনি একটি 'কমিক' নিমেষ। নাটকের আসল জিনিস এই—এই নিমেষ—situation. কিন্তু এমন প্রবহমাণ কাল, জীবনযাত্রার এমন দুর্জয় গতি, ঘটনার এমনি অজস্রতা, চরিত্রের এমন জটিলতা—নাটক ভালো প্রকাশ করতে পারে না। তা পারে উপন্যাস। জীবনযাত্রার জীবন্ত লেখা ফোটে অনেকটা উপন্যাসে—যদি উপন্যাস সত্যিই সার্থক সৃষ্টি হয়। তাই উপন্যাস এতটা আজ জীবন্ত, সব চেয়ে জীবন্ত সাহিত্য, একমাত্র সাহিত্য যা

প্রায় সংবাদপত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। জীবন্ত, তাই এযুগের তা সব চেয়ে সার্থক রস-পরিচয়। যেমন সংবাদপত্র এযুগের সাধারণ পরিচয়—কারণ, জীবন্ত।

আমরা সাংবাদিক, তবু জানি সাহিত্যিকের যুগ শেষ হয়নি। The poetry of earth is never dead—কবিতা তা বারে বারে বল্‌ছে—এই মুদ্রার যুগেও বল্‌ছে—আমি আছি, আছি আছি,—এ সত্য কথা। এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বেদনায় আমি সচেতন হয়ে উঠেছিলাম—আজও সে বেদনা মিথ্যা হয়নি, মানুষের অন্তরের সত্যই তার প্রাণধর্ম।

সত্যই, মিথ্যা হয়নি। আজও মানুষের প্রাণধর্ম সর্বজয়ী—তার শিরার মধ্যে, বুকের তলে, মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে হাজার সূক্ষ্ম গ্রন্থি তার জৈবীরস তেমনি ঢেলে দিচ্ছে। এখনো মানুষ পাগল হয়ে ফেরে কস্তুরী মৃগের মতই ; ফেরে কামনায়, ক্ষুধায়, পিপাসায়, ফেরে জরা-মৃত্যু-তাড়নায়-ত্রাসে, ফেরে জন্ম-জীবন-প্রয়াস-উল্লাসে, ফেরে জন্ম হতে মৃত্যুর দিকে—অসংখ্য মৃত্যুর পৃথিবী-জোরা হা-এর মধ্যে। জৈবীরস তার বুকের তলায় জমে থাকে। আর তাইতো তার অনুভূতি শুধু দেহের সীমায় শেষ হয় না, জৈবী স্পর্শে সম্পূর্ণ হয় না, শুধু জীবধর্ম পালনে তার তৃপ্তি নেই। রসের পিপাসাও তাই তার মেটে না—কত ভাবে, কত ভাষায়, কত কল্পনায় তা মেটাতে হয়। রূপ রেখা শব্দ স্পর্শ রস গন্ধ—কত সূক্ষ্মভাবে সেই রসের বোধন চল্‌ছে।

সাহিত্যিক প্রাণধর্মের স্বাক্ষর ভুল করেন না। তাঁর ধর্ম—প্রাণধর্মকে স্থির রূপে জেনে স্থির রূপ দেওয়া, শব্দের ও সংগীতের মধ্যে মূর্ত করা—স্থির করে রাখা, সীমাবদ্ধ করে লওয়া।

কিন্তু প্রাণ স্থির নেই, বড় অস্থির, বড় চঞ্চল। জন্ম ও জীবন নিত্য নতুন হয়ে উঠ্ছে, এও সত্য, প্রাণেরই তা এক ধর্ম—'প্রাণলীলা'। কবি প্রাণধর্ম বুঝে তাকে যখন রূপ দিচ্ছেন, প্রাণলীলা ততক্ষণে নূতন নূতন রূপে ফুটছে,—অসংখ্য বৈচিত্র্যে, অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে, অসংখ্য বৈভবে। জীবনের এই দিক যেন লেখক দেখে দেখে আর শেষ করতে পারেন না! এ যেন আকাশের মত বিরাট—শেষ নেই, সীমা নেই, শত সূর্যের মেলা, তাদের জন্ম-মরণের নাট্যশালা—সৃষ্টি যেন সেখানে স্থিতিতে রূপ নেয় না—ফুট্ছে আর ঝরছে, ফুট্তে না ফুটতেই ঝরছে, আর ঝরতে না ঝরতেই নতুন হয়ে ফুটছে। জীবনের এই চির-চঞ্চলতার রূপ লিখে শেষ করা যায় না—লিখতে না লিখতে তা নতুন হয়, লিখতে না লিখতে তা বদলে যায়। লেখা তার সঙ্গে আর পেরে উঠছে না—কত আয়োজন কত আবর্জনা, কত ঐশ্বর্য আর কত বাহুল্য, কত অর্থ আর অর্থহীনতা। ডাক তাই পড়ল অলেখকদের—তোমরা একে দেখো, তোমরাও লেখো। তাদের কাজ দেখা—আর এই অস্থিরকে অস্থির বলেই চেনা। তা'ই সাংবাদিকের কাজ। প্রাণলীলার সাক্ষী সে। সে স্থির রূপ দেবার জন্য লেখে না। সে লেখে শুধু জীবনের অস্থিরতার কথা, ঘটনা যা ঘটে; লেখে, যা ছিল আর তা নেই। সাহিত্যিক বল্বেন—যা ছিল তা আছে, কিছু হারায় নি। আর সাংবাদিক প্রমাণ কুড়িয়ে রাখে—যা ছিল তা নেই; সব নতুন হচ্ছে—হচ্ছে আর হচ্ছে—'আছে' নয়; এমন কি, 'ছিলও' নয়, 'হচ্ছে'। শুধুই 'হচ্ছে'; জীবন আর জগৎ শুধু 'ভূ'ধাতুর রূপ। তাই তো জীবন যখন গতি-মুখর হয়ে উঠছে তখন সাংবাদিকের উদ্ভব হয়েছে। সে তার লেখার মধ্য দিয়ে প্রাণলীলার সন্ধান এনে দিচ্ছে—কিছু তার রাখবার

নেই, কিছু তার রাখবার নয়। আজকের খবর কাল বাসি হয়—আজকের লেখা কাল ভোরে ঝরে যায়। এ একদিনের ফোটা ফুল, একদিন তার আয়ু। না, এক দিনও নয়। সকালের লেখা বিকালে, আর মনের পাপড়িতে খুঁজে পাওয়া যায় না; সকালের কথা বিকালে যে ম্লান হয়ে গেছে—তাজা নেই, নতুন নেই, আয়ু তার ফুরিয়ে গেছে। সাংবাদিকের লেখা ফুটতে না ফুটতেই শেষ হয়। সে একবেলার ফোটা ফুল; বড় জোর কখনও এক মাসের জন্য তার শোভা মাসিকপত্রের তোড়ায়; তখন এক মাসের মত তার আয়ু।

এই হল সাংবাদিকের লেখা, তার কাজ। আর এই হল এ যুগের আসল চিত্র—চলেছে, সব চলেছে, মহাস্রোতের টানে সব চলেছে। দাঁড়াবার স্থান নেই, নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই—অফুরন্ত আয়োজন, অফুরন্ত প্রয়োজন—আর অফুরন্ত তার প্রয়াস আর প্রলাপ—সব কিছু নিয়ে এই যুগ। সব কিছু নিয়ে,—তার খাঁটি নিয়ে, তার মেকি নিয়ে, তার কাজ নিয়ে, অকাজ নিয়ে, তার উচ্চতা নিয়ে, তুচ্ছতা নিয়ে, তার অর্থ নিয়ে, তার অবান্তরতা নিয়ে—এ যুগ। এ যুগের এইতো সত্য—আর সেই সত্যের সাক্ষী—সাংবাদিকরা। সাহিত্যিকরা প্রাণধর্মকে প্রকাশ করেন, তার প্রমাণ জড়ো করেন—প্রকাশ করেন প্রাণধর্ম; আর আমরা প্রাণলীলার সাক্ষী। ওঁরা দেখেন অন্তর দিয়ে, আমরা চোখ দিয়ে; ওঁরা লেখেন রঙ গুলে, রেখায়; আমরা লিখি কালি গুলে, আঁচড় কেটে।

আর, ওঁরা সত্য পান না, আমরাও হয়ত বাস্তবকে পাই না—মানে, সম্পূর্ণ করে পাই না। কারণ বাস্তবকে যে সম্পূর্ণ করে পেয়েছে সে তো সত্যকেই লাভ করেছে, তার সাক্ষাৎকার করেছে—তাকে

প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। সে দেখেছে এই হাসি-অশ্রুকে এক করে, সম্পূর্ণ করে। সে দেখেছে শাসক-আর-শাসিতকে জুড়ে—সমাজের আবর্তনের মধ্যে। সে দেখেছে ভাঙা-গড়ার ছন্দকে মিলিয়ে—সৃষ্টির সংগীতে। সে দেখেছে মিলন-বিরোধ, দ্বন্দ্ব-কোলাহল, সকলের সংঘাত, সমাবেশ, সঙ্গতি-সমন্বয়। দেখেছে মহাসাগরের রূপ, শুনেছে মহাকাশের বাণী, আর বুঝেছে সৃষ্টিময় সত্যের চির প্রকাশ। বাস্তবকে যে এম্‌নি সম্পূর্ণ করে দেখেছে সে সত্যকে পেয়েছে। আমরা সাংবাদিক তা দেখি না। এ সত্য কবিরাও বড় পান না—পান ঔপন্যাসিক। কবিরাও সহজে কিন্তু সত্যকে পান না। তাঁরা সত্যকে খোঁজেন সত্তার সমুদ্র-তলে, তাঁরা সত্যকে খোঁজেন আত্মার হিমাদ্রি-চূড়ায়। দেখেন শুধু নিজেকে—দেখেন বিচ্ছিন্ন করে; আর তাই দেখেন তার অসম্পূর্ণতা। তাঁরা সত্যকে খোঁজেন হয়ত আবার ক্ষ্যাপার মত—খোঁজেন 'পরশ পাথর'—কখনো ধর্মের, কখনো instinctএর, এমনি। সোনা হয়ে উঠ্‌ছে যে জীবনের শিকল তা তাঁদের চোখেও পড়ে না। তাঁরা সত্য খোঁজেন, পরশ পাথর খোঁজেন,—আর পান না। পান না,—আর তাই শিকলের সোনাকেই আগ্‌লে ধরেন—খেলা করেন সেই সোনার শিকল বাজিযে, তার কড়ার সংগে কড়া বাজিয়ে, ছন্দের টুং টাং তুলে। খেলা করেন শব্দ লয়ে, খেলা করেন রঙ লয়ে, খেলা করেন আপনার শিকল-বাঁধা কটির সেই শিকল-ধরা জীবন লয়ে।—সহজ সত্য আজ লেখক পান না। পেলে তাঁর সংগীতে সৃষ্টির আগুন লাগত, নতুন পৃথিবী গড়ে উঠ্‌ত, মুক্তির ঝড় বইত, বিকাশের বান ডাকত—আর তাঁর বাণী হয়ে উঠ্‌ত আগুনের মত, খড়্গের মত, সমুদ্রের মত, আকাশের মত। এ যুগের লেখা সেই উদার উদাত্ত বাণী

পায় নি, তার অফুরন্ত বৈচিত্র্যকে রূপ দিতে পারে নি, তার অগণিত বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে পারে নি। এক একবার এ যুগের কথাশিল্প এগিয়ে আসে, আবার পিছিয়ে যায়। এগিয়ে আসে—সে জীবনযাত্রার মর্ম বুঝে নেয়, বাস্তবের খণ্ড কুড়িয়ে সে শেষ পায় না—তার চলচ্চিত্র সে দেখে আর অনুভব করে। এক-একবার দেখে অশেষ প্রবাহ, আর দেখে যেন তার বিশ্বরূপ—মানুষের এই 'বিশ্বরূপ'! দেখে—আর দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তার অনেক হস্ত অনেক পদ, অনেক বক্ত্র নয়ন,—এইরূপকে আর সে কি বলে শেষ করতে পারে? পারে না, পারে না। তবু কথা আর চরিত্র ফুটিয়ে তার চিত্র রাখতে চান লেখক। জীবনের চলচ্চিত্র ধরতে চান গল্পে উপন্যাসে, চরিত্রে, ঘটনায়। সেখানেই তাই পড়ে এ যুগের একটু ছায়া। জীবন আজ কত জটিল, কত সংকটময়, কত কঠিন—আর কত বিচিত্র। তার আঘাতে আঘাতে প্রত্যেক মানুষের আজ চেতনা বিচিত্র আর বিশিষ্ট, আর অমনি জটিল। প্রত্যেকে তার বিচিত্রতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠ্ছে।—কেউ আর ধরাবাঁধা নেই। যত জীবন অগ্রসর হচ্ছে, তত প্রত্যেক মানুষের সামনে জীবনযাত্রার নতুন নতুন দিক উন্মুক্ত হচ্ছে।—'গুণ-কর্মের' চার বিভাগ শুধু নেই, লক্ষ লক্ষ তার বিকাশের পথ—জীবনযাত্রার বিচিত্র আয়োজন। অফুরন্ত আয়োজন—তার দাবিও তেমনি। তাই মানুষের যার যা গুণ ছিল তা ফুটে উঠেছে, জীবনের আয়োজনে স্ফূর্তি লাভ করছে। বিচিত্র কর্ম, বিচিত্র গুণের তাতে বিকাশ হচ্ছে, আর তাই মানুষও বিচিত্র হয়ে উঠ্ছে, জটিল হচ্ছে, হচ্ছে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী, হচ্ছে বিশিষ্ট মানুষ। বিভিন্ন ভাবে জীবন তাকে নাড়া দিচ্ছে; আর যত বিভিন্ন হচ্ছে মানুষের এই নিজ নিজ আবেষ্টন ততই

তার চরিত্র বিশিষ্ট হয়ে উঠছে। সে আর টাইপ-চরিত্র থাকছে না, 'বর্গ-চরিত্র' হচ্ছে না—শুধু বীর, শুধু ধার্মিক, শুধু সতী বা অসতী। অমনি টাইপ ছিল সে গাথায় মহাকাব্যে। সেই মূল আধার ফেটে চৌচির হয়েছে—অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে সে বিশিষ্ট হচ্ছে, হচ্ছে 'মানুষ'—পাপে ভরা, পুণ্যে ভরা, ন্যায়ে ভরা, অন্যায়ে ভরা, স্বপ্নে মুগ্ধ, বাস্তবে লুব্ধ, ক্ষুধাতুর, ব্যথাতুর, ইন্দ্রিয়াতুর,—আবার সৃষ্টিধর্মী!—মোটের উপর মানুষ; পশু নয়, দেবতা নয়,—মানুষ,—জটিল, আপনার কাছে আপনিই প্রশ্ন। এই ঘটনার জালের মধ্যে তার এই বিচিত্র বিকাশ লেখক দেখছেন, আর তাই লিখছেন।

আবার তা লিখতে পারছেনও না। দেখছেন, মুদ্রার মোহর-আঁটা আজ পৃথিবীর দুয়ারে। দুয়ার খুলছে না। সত্য বটে, অনেক দুয়ার খুলে গেছে মানুষের জীবন-যাত্রার। তাতেই মানুষের মনেরও অনেক দুয়ার খুলে গেছে—ব্যক্তিরূপ অশেষ হয়েছে, মানুষ বিশিষ্ট হয়েছে—তা দেখেই মানুষের বিস্ময়ের আর সীমা নেই। কিন্তু আজ আর নতুন দুয়ার খুলছে না। ব্যক্তিরূপ আর নতুন বিকাশের পথ পাচ্ছে না, মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। আজকের পৃথিবীতে মুদ্রার দাবি বড়। তাই সংগীত-কলার থেকে বড় সিনেমার দাবি, গল্পের থেকে বড় সিনারিওর প্রয়োজন। মুদ্রার দাবি বড়—তাই লেখার চেয়ে দালালি প্রশস্ততর পথ, গল্প লেখা থেকে বেশি দাম চায়ের বিজ্ঞাপন লেখার, কবিতা লেখা থেকে টেক্সট্ বই লেখার। আবার যার যা বৈশিষ্ট্য থাক, সবাই ভিড় করছে এক পথে—যেখানে টাকা আছে। হয়ত গোলামের দেশে তা চাকরি, আই-সি-এস্; আর বণিক রাজার দেশে তা সিটি আর বিজ্‌নেস্,—বৈশিষ্ট্য চাপা পড়ছে—

টাকার তোড়ায়। মানুষ লাইনে সারবন্দী হচ্ছে, তার চরিত্র তাই ধরাবাঁধা হয়ে পড়ছে। সভ্যতার এই *Magic Mountain*এ যেন সবাই বক্সার বন্দী—এই পাহাড়ের চূড়ায় জীবন থেকে বিচ্যুত, জীবনযাত্রার প্রেতাত্মা। এই রুদ্ধ বায়ুর দেশে মুনাফার দায়ে সওদাগর চায়—স্তরে ভাগ করা মানুষ; চায় মানুষ নয়—মজুর, মানুষ নয়—কেরাণী, মানুষ নয়—কারিগর, মানুষ নয়—সেনানী, চায় regimented মানুষ, চায় dicanted মানুষ। যে বৈশিষ্ট্য নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ফুটে ওঠে তা বর্জন না করলে আর এ ব্যবসা থাকে না—জীবনযাত্রার বনিয়াদ থাকে না—মুদ্রার প্রাসাদ ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। সওদাগরী ডিক্টেটার আজ মুদ্রার মুকুট মাথায় নিয়ে দাঁড়াল, তাই fascismএর বেশে—এ হল ফোর্ড অব্দের 'Brave New World'. সভ্যতার মুদ্রাদোষ আর চাপা থাকছে না।

এই মুদ্রার রাজত্বে মুদ্রাযন্ত্রের দাবি মেটাতে আমাকেও লিখতে হবে—শরীর থাক্ কি যাক্, লিখতে হবে; ভালো লেখা হোক বাজে লেখা হোক্, লিখ্তে হবে; গ্রীষ্ম হোক্, বর্ষা হোক্, লিখতে হবে। আমার টাকা চাই, মুদ্রা চাই; উপায় নেই লিখ্তে হবে; কারণ. এ মুদ্রাযুগ। টাকার আমার প্রয়োজন—পৃথিবীর সবারই প্রয়োজন। আমার বাঁচা দরকার—আমার নিজের আর আপনার জনদের বাঁচা দরকার—তা টাকা না হলে হয় না। আর বাঁচার চেয়ে বড় আর কি আছে? এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এর চেয়ে আনন্দকর, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের? এমন সত্য, এমন পবিত্র, এমন সুন্দর—কি আছে? আমার বাঁচা দরকার—আমার টাকা দরকার। 'আমি ভাবি তাই আমি আছি,' এই যেমন ডেকার্টিয়ান্ সূত্র; তেমনি 'আমার বাঁচা চাই, আমার টাকা

চাই', এই এ যুগের মন্ত্র। আর যদি লেখা আমায় টাকার পথ দেখায়, মুদ্রাযন্ত্র আমায় মুদ্রার পথ দেখায়—তা হলে স্বাগতং লেখা, স্বাগতং সাংবাদিকতা, স্বাগতং ছেলে-পড়ানোর মত, স্বাগতং দিনমজুরীর মত।

আমি লিখব—যদি আমি টাকা পাই, যাক্ আমার রক্ত জল হয়ে, গরমে আমার দেহ গলে, মন জ্বলে, আর শীতে দেহ কুঁক্ড়ে, মন মুষড়ে—আর রাত্রির নিদ্রা আর দিনের আরাম যাক জীবন থেকে চুকে। আমি লিখব যদি আমি টাকা পাই!

আর—আর—যদি আমি টাকা পাই—বাঁচবার মতো টাকা পাই—আমি লিখবোও না!

বক্সা,

১৯৩৩।

কোদালি ও কলম

What shall I sing when all is sung,
And every tale is told ?

আমার লেখবার কি আছে যে আমাকে লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন আপনারা ? কি আমি লিখব ? অবশ্য লিখতে আমি এখনো পারি—ইউরোপের পলিটিক্যাল পরিবর্তন সংবন্ধে, দুনিয়ার বর্তমান অর্থসংকট সংবন্ধে ও ভাবী রাষ্ট্রসংকট সংবন্ধে। আর স্বদেশের পলিটিকস ও ইকোনমিকস, দু'য়ের সংবন্ধেই পারি কিছু না কিছু লিখতে, তা-ও ঠিক। কিন্তু সে সব কথাই পুরনো, সব কথাই বাসি মাল। অবশ্য উপায়ও নেই। আমরা থাকি বন্ধ ঘরে, আমাদের কাছে খবর যখন পৌঁছে তখন খবর আর তাজা নেই—তা দুনিয়ার শেষ হাটের কেনা, বাজার-কুড়োনো জিনিস। আমাদের দেশে, আমাদের ভাষায় এখনো এই জিনিসকেই ঢেলে সেজে দিতে হয়, আর দেশের লোকেরও তাই উদরস্থ করতে হয়। এই আমাদের সমস্যা, অবস্থা এই।

আপনারা অবশ্য দুনিয়ার হাল বুঝ্‌তে চান না, আপনারা চান সাহিত্য। সাহিত্য - যা একালেরও নয়, সেকালেরও নয়, ভাবী কালের। আপনারা চান আগামী কাল ; আপনারা সাহিত্যে 'নূতন-বাদী'। কিন্তু আগামী কাল কি হবে, তা জানতে হলেই তো জানতে হয় দুনিয়ার হাল। আগামী কাল অবশ্য সূর্য উঠবে, সন্ধ্যা আসবে,. আকাশে কালপুরুষের এমনি আবির্ভাব হবে, —এসব আমরাও জানি। পঞ্জিকাকার বলে দেন আরো একটু বেশি—সূর্য গ্রহণ আর চন্দ্র গ্রহণ, আকাশে নতুন গ্রহের আবির্ভাব, ইত্যাদি।

কিন্তু তা হলে তো সাহিত্য 'নূতন' বলেও কিছু নেই. আছে শুধু সেই পুরাতন কথা। আপনারা তা মানবেন না।

আমি কিন্তু বলব,—এ শুধু পলিটিক্‌সের কথা নয়, সকল ক্ষেত্রেরই কথা। দুনিয়ার হালে ভাবীকালের একটা পূর্বাভাস পাওয়া যায়। সে হিসাব বুঝলেই আপনাদের সাহিত্যের ফসলেরও একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে। তা না হলে সাহিত্যে কি ফসল ফলবে তা কি আপনারা বলতে পারেন? আপনারা বলবেন,—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পের দিন গিয়েছে, এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও—যে রবীন্দ্রনাথ 'সোণার তরী,' 'মানসী'র কবি—লোকান্তর-বার্তা তিনি নিজেই দিয়ে দিয়েছেন 'শেষের কবিতা'য়; 'পুনশ্চ' তো আপনাদেরই পুরশ্চরণের বাণী। এসব কথা মিথ্যে নয়। সমস্ত মোটা কথাই খানিকটা সত্য দিয়ে দোমেটে করা, জেনারিলিজেশান মানেই আধা-সত্য। কিন্তু তাকে পুরা সত্য বলেও তাই মনে করা যায় না। পৃথিবী এমনি প্যারাডক্‌স্ দিয়ে গড়া; তার একদিকে হিট্‌লার আর দিকে ষ্টালিন। আর তারই ঠোকাঠুকিতে পৃথিবী আপনাকে ভাঙছে আর গড়ছে। কিন্তু গড়ছে, বারে বারে গড়ছে। আর সেই গড়ার ইঙ্গিতের দিকে এগিয়ে দেওয়া হল প্রত্যেক কালে সেকালের সাহিত্যের ধর্ম; আর সেই গড়ার ভঙ্গী বুঝে নেওয়া, ইঙ্গিত ধরে ফেলা হল সকল কালে বিজ্ঞানের ধর্ম।

ভাবী গঠনের সে ইঙ্গিত না জান্‌লেও কি ভাবী কালের সাহিত্য গড়া চলে?

আসলে পুরনো সাঁচ্চা জিনিস অচল হয় না। তাই পুরনো রবীন্দ্রনাথই সব চেয়ে নূতন রইলেন। দেখুন 'মহুয়া', দেখুন 'পুনশ্চ' ভাবে ও ভঙ্গীতে দুয়েতেই আশ্চর্য জিনিস। মৌলিক কোনো পরিবর্তন

আসলে ঘটেনি, ঘটে না। Change of voice হয়, change of heart হয় না। পৃথিবী বদ্‌লায় বারে বারে; মনেও তার ছাপ পড়ে। তাতে মন ছাড়া পায়, প্রাণ জীইয়ে ওঠে। সেই মনপ্রাণের স্পৃষ্টিস্পর্শে' পৃথিবীও আবার সচকিত হয়, নূতন করে বদ্‌লাতে চায়,—এই হল পরিবর্তনের ধারা। এর বেশি আমূল পরিবর্তন বিপ্লবেও ঘটে না; এমন কি শিল্প-বিপ্লবেও ঘটেছে কিনা সন্দেহ। তা যদি ঘট্‌ত, তা' হ'লে আজ সেক্সপীয়র ইংরেজই বুঝতে পার্‌ত না। প্রাণ-মূল শুকায় না বলেই যা মৌলিক তা চিরজীবী। সেই মূল হচ্ছে জীবন—জীবন-যুদ্ধ আর জীবনের জয়। এ যুদ্ধ চিরন্তন—সে চিরনতুন এবং চিরপুরাতনও। আর যুদ্ধজয়, যুদ্ধের তাড়না আর জয়ের প্রেরণা, বিরোধ আর বিকাশ,—এই হল নিয়ম। মানুষের মনও মানুষের জীবন পুরনো পাতা ঝেড়ে ফেলে, পুরনো শাখার মায়া কাটায়; কিন্তু এই অনন্তকালীন অশ্বত্থ এই মূল ছাড়তে পারে না। তার নতুন ফুল, নতুন পাতা, নতুন শাখা, সবই এই মূল তরুর। মূল তরুর আর তাই তরুমূলেরও—মাটির ও জলবায়ুরও। এই মানব-মহীরুহেরও রসই প্রাণ, তা'ই আর্ট। সে রস তার ভিতরে জন্মে—আসে মাটি থেকে, বাতাস থেকে, আকাশ থেকে—জীবন থেকে, জীবিকার দাবি থেকে, জীবিকার দায়ে—তাই তা চিরদিনের।

কিন্তু সাহিত্যে কি তবে নতুন কিছু নেই? পুরনো বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে এ যুগের বাঙলা সাহিত্যের তফাৎ নেই? নেই, কে বলে। আছে নিশ্চয়ই; জীবিকার ধরণ বদ্‌লাচ্ছে যে, জীবনযাত্রাও বদ্‌লাচ্ছে যে। অবশ্য, আজ আবার তা বদ্‌লাতে পারছে না, চাপা পড়ে আছে। তাই নতুন হচ্ছে আজ প্রধানত আঙ্গিকের নতুনত্ব। টেক্‌নিক্ দিন থেকে দিন

বদ্‌লায়—যেমন বদলায় কলকারখানায়। তাতে রস বদলায় না। সেক্সপীয়রের টেক্‌নিক আর এস্কাইলাসের টেক্‌নিক এক নয়; তাতে কি ক্ষতি বলুন। আমি তো দুই-ই পড়ে আনন্দ পাই। আর দিন থেকে দিন আবার বদলায় আবেষ্টন, আবহাওয়া; আর বদলায় তাই মনের আইডিয়া, আউটলুক। ভিক্টোরীয় যুগ পঞ্চাশ বছরেই হয়ে উঠেছে হাসির জিনিস; জর্জীয় যুগ নিশ্চয়ই পঁচিশ বছরেই বিদ্রূপের জিনিস হবে। কিন্তু কোনো আইডিয়াও একেবারে নতুন হয় না, আউটলুক একেবারে উদ্ভাবনা নয়। ইতিহাসের ক্রম-পরিণতি আবেষ্টনেও থাকে, থাকে মনের পাতায় লেখা। এস্কাইলাস থেকে ইয়ুরোপেডিস কত বড়ো মানসিক পরিবর্তনের ইতিহাস। কিন্তু একই পেরিক্লিসের আয়ুষ্কালে এথেন্সের জীবনে এই ট্রিলজি অভিনীত হল—এস্কাইলাস, সফোক্লিস আর ইউরোপেডিস্। আইডিয়া কত তাড়াতাড়ি বদ্‌লেছে। নিশ্চয়ই এমনি ইতিহাস আপনাদের আরও জানা আছে—ইউনিভার্সিটি উইট্‌সদের থেকে 'রক্ত আর বজ্র ট্র্যাজিডি' পর্যন্ত দেখলেই হবে। কিংবা আমাদের সমকালের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

কিন্তু আউটলুকও বা কতখানি বদলায়? আমি তো আজকের আপনাদের সমস্ত নতুনতম সাহিত্যের মধ্যে সেই পুরনো য়ুনানী ভাব-সংকটেরই একালীয় রূপ দেখ্‌ছি। একালীয় রূপ, কারণ আবেষ্টন বদলায় দিন থেকে দিনে। তবু কোনো আইডিয়াই সম্পূর্ণরূপে আকস্মিক নয়। তা কারো একান্ত বা একারও নয়—তা'হলে অন্যে তার মর্মই বুঝত না। তবু আবেষ্টন, টেক্‌নিক আর আউটলুক, এসব দিন থেকে দিন বদ্‌লায়। এসবের ওপর থাকে সমকালের জীবনযাত্রার ছাপ—জীবিকার মোটা হাতের দাগ, সমাজের রূপের ছায়া। এদের বেড়া যে যত খাড়া

করে তোলে, অন্য কালের যুগের কাছে তাদের রাজ্যই হয় তত দুষ্প্রবেশ্য। এজন্যেই অনেক সংস্কৃত কবিতায় আমাদের প্রবেশ করতে কষ্ট হয়। জীবনের স্রোত থেকে তার লেখকরা সরে গেছেন—বক্রোক্তিতে তাঁদের কীর্তি। মধ্যযুগের বাঙলা কবিতা, মেটাফিজিক্যাল ইস্কুলের অনেক ইংরেজি কবিতাও তাই ক্লান্তিকর। জীবন থেকে তারা সরে গেছে, ভাব তাদের জীবন-গঙ্গায় ফিরে যেতে চায় না, তা আদিগঙ্গায় আবদ্ধ। তাই দিন থেকে দিন বদলানো পুঁজি নিয়েই তারা বাড়াবাড়ি করে, ভঙ্গী নিয়ে কারিকুরি করে, যুগ নিয়ে গর্ব করে ; এমন কি ভুলে যায়, আসল বস্তু যা তা বদলায় কতটা বা কি ভাবে। আসল বস্তু, বলেছি, এই জীবনযাত্রা ও মনের দ্বৈতলীলা—মানুষের ও প্রকৃতির পরিচয়, জয় ও পরাজয়। আধুনিকতার দাপটে ঢাকা পড়ে এই সত্য, এই চিরন্তনতা। আজ আর কাল, আর আজ আর আগামী কাল, এদের মধ্যে তফাৎ ঘটায় এই আঙ্গিক, আবেষ্টন আর আউটলুক। এ হল জীবনের একদিক—কারণ জীবন চলন্ত, কেবলি বদলাচ্ছে। আমাদের উপন্যাসে গল্পে এই ক্রমগতির ছাপই বেশি পড়ে। কাল আর আজ, আর আজ আর আগামীকাল,—এদের মধ্যে যোগও রাখবে প্রাণলীলা, জীবিকার দায়, আর রসচৈতন্য। কবিতায়, আর কাব্যধর্মী কল্পনায়, গল্পে, লেখায় ফোটে এরই বেশি আঁক। এই হল জীবনের আর একদিক। কারণ জীবনের ধারা বিচ্ছিন্ন নয়—তা বিবর্তন।

বলবেন, বাঙলা সাহিত্যে নতুন ঢঙ আস্‌ছে। তা মান্‌ছি। কিন্তু সে তো চিরদিনই আস্‌ছিল—যেদিন থেকে বাঙলা কবিতা জন্মেছে। যখনো নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র মহাকাব্য লিখছেন, তখনো বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ গীতিকাব্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। তাঁদের দান, ভাব ও রূপের

দিক থেকে কি তা নতুন ছিল না? তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁর এক জীবনে কত নতুন সুর যে বাঙলা কাব্যে তিনি সৃষ্টি করলেন, আমরাই কি তার হিসাব করে উঠতে পারি? তারপর তো এসেছেন আপনারা। কি বল্‌ব আপনাদের? 'যুদ্ধান্ত যুগের' বল্‌ব? কিন্তু যুদ্ধ ঘটেছিল ইউরোপে, আপনারা তার ধাক্কা প্রত্যক্ষভাবে পাননি। হয়ত তখনো বয়সে ছিলেন খুবই ছোট; তাই তার আর্থিক, মানসিক কোনো আঘাতই আপনাদের সইতে হয়নি। আপনাদের 'যুদ্ধান্ত যুগ' রূপ নিয়েছে পরবর্তীকালে, যখন আপনারা ইউরোপীয় সাহিত্যে তা পেতে শুরু করলেন। প্রথম এল রুশ সাহিত্যের ঢেউ, তারপর স্কাণ্ডিনেভিয়ান সাহিত্যের। ইউরোপের অন্য কোনো সাহিত্য এ দু'দেশের মতো হালে আমাদের ওপর অতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অবশ্য দানুন্‌ৎসিও জানা ছিল; হাউপ্টম্যান, জুদারম্যান, বার্ণার্ড শ, গল্‌স্‌ওয়ার্দিও ছিলেন পরিচিত; মেটারলিংক, ফ্রাঁস আর সর্বশেষে রোলাঁ আপনাদের খুব আপনার হয়ে উঠেছিলেন এক সময়ে। তবু রুশিয়া আর নরওয়ের লেখকরা হন বিশেষ প্রিয়। এই যুগটাতেই হঠাৎ আপনারা ক্ষেপে উঠলেন 'দরিদ্রের সাহিত্য' নিয়ে। বোধ হয় রুশ সাহিত্যের ও রুশ কম্যুনিজমের ওটা পরোক্ষ ফল। অথচ 'রিয়েলিজম' নামীয় যৌনচিত্রও এসময়েই আপনাদের পেয়ে বস্‌ল। তা তারুণ্য। ওটা বয়ঃসন্ধিকালীন wish fulfilment. ব্যক্তিগতই বেশি, খানিকটা তবু সমাজগতও,—এতো আজ বুঝতেই পারছেন। নইলেও কাল পারবেন—যখন সত্যিকার যৌবনে এসে উত্তীর্ণ হবেন। ওতে রিয়েলিজম কিছু নেই, আছে কল্পনা-বিলাস। আরও পরে আপনারা আবিষ্কার করলেন ইউরোপীয় 'যুদ্ধান্ত' সাহিত্য—যার প্রধান ফুল হল অশ্রদ্ধা,

cynicism. কিন্তু ওটার জন্ম হয়েছে ভার্দুনে ও ভার্সেঈতে; তার পিছনে রয়েছে যুদ্ধের স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন, ইউরোপীয় রাজনীতিকদের রচা কথা; আর আরও পিছনে ইউরোপের পথহারা ধনিক সভ্যতা, সাম্‌নেও আবার সেই পচ-ধরা ধনিক সভ্যতা। আপনাদের পিছনে তা নেই; সাম্‌নে আছে কি? অবশ্য পিছনে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ছিল, বন্যা আর অনাবৃষ্টি বরাবরই আছে। কিন্তু তা গা-সহা হয়ে গেছে। আমার আপনার অনুভূতিতে তা নতুন কম্পন তোলে না। শুধু গোর্কি পড়ে কতটুকু নিজের এই চিত্তবৃত্তিকে এসব গা-সহা দুঃখ-বেদনা সংবন্ধে চাগিয়ে তোলা যায়? তবু চেষ্টা কম করিনি,—বিশেষ করে যুদ্ধান্তের বিলাতী অশ্রদ্ধার সুরটা আয়ত্ত করতে। তাই আপনাদের সিনিসিজমও হয়েছে উদ্ভট। বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ভেতরে সেন্টিমেণ্টালিজম ও রোমান্টিসিজমের ইন্দ্রধনু সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমে হাওয়াটা যখন সিনিসিজমের খরতাপের, তখন উপায় নেই, ইউরোপীয় আধুনিকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হতে হবে মাধুর্যহীন খর আতপতাপের উপাসক। কারো কারো তখনকার লেখা হচ্ছে এই আত্মগোপনের ইতিহাস। এখনো তাই তাঁরা নিজেদেরই খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রেমেন্দ্রের মতো কেউ কেউ অবশ্য নিজেকে কোনো সময়ে হারিয়ে ফেলেন নি। ইউরোপীয়ের ভাব তাঁদের দোলা দিয়েছে; কিন্তু তাঁদের চারি দিক্‌কার আবেষ্টন তো পচ-ধরা ধনিক-সভ্যতার নয়। তা বরং চাপাপড়া জাতীয় চেতনার। হয়ত তা না বোঝাতেই তাঁদের শক্তি চাপা পড়ে রইল। আর অন্যেরা কেবলই দু'হাতে যাঁকে পান তাঁকেই আঁকড়ে ধরেন। আপনারা পেয়েছেন প্রুস্ত ও জেম্‌স জয়েসের অদ্ভুত প্রতিভার সংবাদ; অল্‌ডাস হাক্‌সলির আশ্চর্য বিদ্যা বুদ্ধি বৈদগ্ধ্যের সাক্ষাৎকার। আর এ সময়েই—যখন ডি. এচ. লরেন্সের আত্ম-পীড়িত

দেহ-আত্মা লাভ করেছে বিশ্রাম—পেলেন আপনারা তাঁরও সন্ধান। এখন তো আপনাদের আকাশে এই দুই নক্ষত্র উজ্জ্বল। বুদ্ধদেব বাংলায় অলডাস্‌কে ঢালতে সচেষ্ট এবং আশ্চর্য রকমের সার্থকও হয়েছেন—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সর্বোপরি লেখার স্বচ্ছতায়। এমন কি, অলডাস্ প্রথম জীবনে ছিলেন এসেয়িষ্ট ; পরেকার উপন্যাসেও সে ধাত তিনি কাটিয়ে উঠ্‌তে পারছেন না। বুদ্ধদেব বরাবর লিখেছেন উপন্যাস, কিন্তু তাঁর উপন্যাসের মধ্যে, লক্ষ্য করবেন, ফুটে উঠছে ক্রমশ তাঁর এসেয়িষ্ট রূপ। হাক্‌সলির ভূত তাঁর ঘাড়ে চেপেছে—তাঁর ভাবে, ভাষায়, কথার ভঙ্গীতে। অবশ্য হাক্‌সলির ভূত, তাই স্বাগতম্। তবু ভূত ঘাড় থেকে নেমে গেলে বুদ্ধদেব দেখা দেবেন, তৎপূর্বে তিনি যা পাচ্ছেন তা সবটা তাঁর নয়, ওই ভূতের পাওনা। অবশ্য এ ছাড়া আরও নতুন নক্ষত্র দেখা দিচ্ছে,—টি. এস. এলিযট আজ আমাদের পরিচিত। আগেকার থেকে ইউরোপকে আমরা ঢের বেশি করে জানছি। সাহিত্যেও তার ছায়া পড়ছে—সাহিত্য তো আর আজব জিনিস নয়।

কিন্তু ইউরোপের সাহিত্য, সে তার সিনিসিজম্‌ই হোক্ আর যাই হোক, তার জীবন থেকে উদ্ভূত—তার জীবন থেকে আর সেই জীবনানুভূতি থেকে। তার মানে অবশ্য শুধু জীবন থেকে আর জীবনানুভূতি থেকেও নয়—গণ্ডী-জীবন থেকেও; আর গণ্ডীবদ্ধ জীবনানুভূতি থেকেও জন্ম নিচ্ছে ইউরোপের সাহিত্য। কারণ ওদেরও জীবন সত্যই গণ্ডীতে বাঁধা পড়ে গেছে—এগোতে পারছে না। সভ্যতা অনেক পুঁজি হাতে পেয়েছে—কত কল কত কারখানা, কত শক্তি আর কত তার ঐশ্বর্য। কিন্তু সব খান-খান হয়ে যাচ্ছে। লোকে বেকার বসে আছে, আর বেকারের সমাজে বিকার দেখা দেবেই।

তার সাহিত্যেও তাই বিকার হবেই। মুনাফার ফাঁস ওদের গলায়। তাই শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। যারা এই মুনাফা সৃষ্টি করে দম ফেলবার তাদের সময় নেই। তারা দম নেয় ছায়াচিত্র থেকে, গৈবী খুনের কাহিনী থেকে, রোমাঞ্চকর উপন্যাস থেকে, রোমহর্ষক নবেল থেকে। তাদের জীবনযাত্রা ধরাবাঁধা, কলে-পেষা। কলে তৈরী তাদের মনের খোরাকও—যেমন, ছায়াচিত্র আর তেমনি গল্প-উপন্যাস। যারা এ স্তরের ওপরে, মধ্যস্তরের, তাদের মনে জাগে এই নিম্নবর্তীদের জীবনের বিভীষিকা। তাই এই জীবনের বীভৎসতা থেকে তারা দূরে পালাতে চায়। যারা পারে একেবারে অলস ও অবকাশের জগতে বসে জাল বোনে। জীবনের সৃষ্টিশালায় আর মুখ দেখায় না। যা বিকোয়, এরাও অবশ্য তাই লিখতে বাধ্য। আসলে তারাও বেকার। মুনাফাদারের মুঠো থেকে গলে স্বর্ণকণা তাদের হাতে এসে পড়ে—তাই তারা স্বচ্ছল ; কিন্তু তবু বেকার—সমাজে ওদের কাজ নেই। তবে স্বচ্ছল, তাই তারা বাঁচে। বাঁচে নীচেকার জীবনযাত্রা থেকে, জীবন-যুদ্ধ থেকে ; বাঁচে নিজেদের দেয়াল-ঘেরা মধ্যস্তরে। জীবনের ছোঁয়া থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে তারা বাঁচে। তাই তাদের কল্পনা গণ্ডী-জীবনের বাইরে আর যেতে চায় না, যেতে পারে না। আর ফলে তা হয়ে ওঠে শুধুই সূক্ষ্ম, শুধু সরু কাজ। আপনার নিয়মে আপনি তা চলে—আর্ট ফর আর্টস সেক্,—বাইরের জীবনের দায়িত্বকে তা মানে না। আর তার মানে গণ্ডীর মধ্যেই তা থাকে ; ক্রমেই মণ্ডলীগত একটা ব্যাপার হয়—এক্সপ্রেশনিজম্, সিম্বলিজম্, স্যুররিয়েলিজম্, অমনিতর যা খুশী। এমন কি, শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠ্‌ত পারে ব্যক্তিগত—একার জিনিস—'পিওর আর্ট', যেমন জয়েসের শেষদিককার লেখা, ষ্টাইনের ধ্বনিপ্রাণ কবিতা। তাতে

আঙ্গিক বড় হয়ে ওঠে। যেমন কলকারখানায় আশ্চর্য আবিষ্কার দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় ধ্বনি গাঁথবার, কথা গাঁথবার আশ্চর্য কৌশল। অথচ যন্ত্রের উন্নতি সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায় না—সভ্যতার এমনি দুর্দশা। সাহিত্যের কৌশলও তেমনি কৌশল থাকে, সৃষ্টি করতে পারে না—এ যুগের সাহিত্যের এমনি দুর্ভাগ্য।

তবু ইউরোপের সাহিত্যের শিকড় মাটিতে, অথবা মাটিহীন মূলে। আমাদের সাহিত্যের কিন্তু জন্ম আকাশে। তা সুন্দর অর্কিড। আপনাদের নির্ভর করতে হয় আপনাদের মনের জমির উপর। অবশ্য সে জমি গড়া হয় ইউরোপের পুথি আর পাতা দিয়ে, তাদের উড়ো আশা আর উড়ো নিরাশা দিয়ে। মধুসূদনের আমল থেকে তাই হয়ে আসছে। নইলে বাংলা সাহিত্য জন্মাতও না। আর এই রহস্যটুকু ধরতে পেরেছিলেন বলেই রাজা রামমোহনকে বলতে হয় যুগাবতার। তিনি বুঝেছিলেন—আমাদের জমি গড়তে হবে ইউরোপীয় জ্ঞান আর বিজ্ঞান দিয়ে। আর তেমনিভাবে জমি গড়া হলে যা হয় তা'ই মধুসূদন, তা'ই আমাদের বঙ্কিম, আর তারও পরেকার বাংলা সাহিত্য। কিন্তু মুশকিল আমাদের অনেক। ইউরোপের জ্ঞান আর বিজ্ঞান তার জীবনের ফল—তার সামাজিক ব্যবস্থার ফল, চিন্তারও ফল। সমাজে আর মনে চলেছে আদান-প্রদান, আর ওরই নাম সভ্যতা। সেই সভ্যতার বনিয়াদই ইউরোপে এযুগে তার শিল্প-বিপ্লব। সেই বিপ্লবেরই পরিণতি আবার আজ সে সমাজের অন্তর্বিরোধ। তা'ই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে—তাতে আছে সেই সভ্যতার অন্তর্দাহ—তার সাহিত্যে, তার শিল্পে,—তার ছাই, তার ধোঁয়া, তার জ্বালা, আর তার দীপ্তিও। আমরা কিন্তু ইউরোপের জাহাজ বোঝাই বই পেলাম, পেলাম না তার যন্ত্র। তার

যন্ত্র-বিপ্লব আর জীবনযাত্রা তাই আমরা এখনো পাইনি। কারণ আমরা তার 'বাজার',—তার কলের মালের খরিদ্দার আর তার কাঁচা মালের জোগানদার। তার ধনিকতন্ত্র বরং আমাদের চেপে জীবনের পুরনো কোঠায় বন্দী করে রাখল,—হ'ল আমাদের চলার পথে বাধা। আমাদের জীবিকায় ও জীবনে এভাবে আমরা রইলাম ধনিকতন্ত্রের বন্দী,— 'উপনিবেশের' বন্ধ ঘরে। ওদিকে মনের জীবনে আমরা পেলাম ইউরোপীয় ধনিকতন্ত্রী চিন্তার উপজীব্য। তা জীবিকা নয়, উপজীব্য; ফসল নয়, তার চালানী মাল। তাতেও আমাদের মন একেবারে আনন্দে শিউরে উঠল—ইউরোপের সেই আঘাতে আমাদের সমাজ তখন একেবারে ভিৎশুদ্ধ নড়ে উঠেছিল। ইউরোপের বণিকরাজ আমাদের নতুন সমাজ গড়তে দেয় নি। দিলও না। কিন্তু পুরনো সমাজ ভেঙ্গে যেতে লাগ্‌ল। আর আমরা আনন্দে আশায় শিউরে উঠ্‌লাম, ভাবলাম নতুন সমাজই গড়ে উঠ্‌ছে, তারই সূচনা হয়েছে। তখন আমাদের কত আশা, কত স্বপ্ন মনে! আমরা জীবনে যেন এক মহাকাব্যের মহিমা দেখ্‌লাম— জীবনে দেখলাম এক রোমান্সের রূপ আর বিস্ময়!

আমরা নতুন সৃষ্টিতে মেতে উঠলাম। কিন্তু সে সৃষ্টির প্রেরণা জীবন থেকে পাওয়া নয়, পাওয়া মন থেকে; আর সে মন আমাদের নিজেদের জীবনের সঙ্গেও এখন আর সন্ধি করে উঠতে পারছে না। কারণ দেখ্‌ছি, সেই জীবনের উপরে চেপে বসে আছে উপনিবেশের ব্যবস্থা, তার উপদ্রব। তাতেই আমাদের জীবনও মুক্ত হতে পারেনি, বন্দীর জীবন হয়েছে, গণ্ডীর জীবন রয়েছে। আর এজন্যই ইউরোপের বর্তমান মুহূর্তের সাহিত্যও আমরা খানিকটা বুঝে উঠতে পারি—দুইই ধনিকতন্ত্রের দুই দিক্‌কার দুই গণ্ডীবদ্ধ রূপ। তবে ইউরোপ আছে

প্রত্যক্ষের কোঠায়, আপনারা আছেন পরোক্ষের। ওদের অনুভূতিটা বাঁকাচোরা, কিন্তু সাঁচ্চা; আমাদের অনুভূতিই নকল। এ সাহিত্যও কাজেই derivative. ইউরোপীয় লেখকদের ভাব-ভঙ্গী-ভাষা আপনারা গ্রহণ করেছেন, করছেন, করবেন—এইটাই আপনাদের বিশেষত্ব। তা হলে আপনাদের মধ্যে নূতনত্বই বা কোথায়?

তাই কবিদের বলব, সে গান গাও যে গান গাওয়া হয়েছে, যে কথা হয়েছে কথিত। কারণ সত্যিকারের যে কথা, তা সৃষ্টি—আর তা বাস্তব ক্ষেত্রেও নূতন সৃষ্টি দান করে। তাই গাওয়া হলেও তা শেষ হয় না, কওয়া হলেও তা ফুরিয়ে যায় না। বরং তখনি বুঝি আরও বেশি—এ গান অশেষ, এ কথা অসম্পূর্ণ; চিরকাল এ গান গাওয়া চলবে—চিরদিন।

অবশ্য এ হল কাব্য-সাহিত্যের কথা—তা বিশেষ করে অন্তরাবেগের কথা। তা চিরায়ু হলেও তা কিন্তু জীবনযাত্রার সঙ্গেও সম্পর্কিত। তার আসল মূলও হল জীবনক্ষেত্র, তার ফলও হল সেই জীবনক্ষেত্রকে পরিসর করা, পরিবর্তিত করা। বাস্তবে মোটেই তা উদ্দেশ্যহীন নয়—যেমন তা বাস্তবে কারণশূন্যও নয়।

আপনারা বলবেন—'পিওর আর্ট' উদ্দেশ্যহীন। কিন্তু সত্যি 'পিওর আর্ট' কাকে বলে, তারও কি ঠিক আছে? ফ্রান্সে এই সেদিন আঁরি ব্রিমোঁ (উচ্চারণ 'পিওর' হল কিনা জানি না) নতুন করে 'পিওর পোয়েট্রি' বা 'বিশুদ্ধ কবিতার' রূপ নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে 'পোয়েট্রি' হচ্ছে 'প্রেয়ারেরই' নামান্তর। এই ক্যাথোলিক 'অ্যাবে'র

মতে 'মরমীয়া' কবিতাই খাঁটি কবিতা। অবশ্য এদিকেও ক্যাথোলিক মরমীয়া কবিতাই সম্ভবত তিনি 'বিশুদ্ধ কবিতা' বলে গ্রাহ্য করবেন। কিন্তু কবিতা কি শুধুই প্রার্থনা, বা স্তব বা ধ্যান বা (যেমন ক্রোচে বল্‌বেন) ইনটুইশ্যান—অতীন্দ্রিয়ানুভূতির একটা দ্যোতনা? 'পিওর পোয়েট্রি'র' এই সংজ্ঞা কি আপনারাই মান্‌বেন? না, অন্যেরাও সবাই মানে? ব্রিমোঁ নিজেও বলেছেন—ফ্রান্‌সে 'পিওর পোয়েট্রি'র সোরগোল বাঁধান পল্‌ ভ্যালেরি। আর পল্‌ ভ্যালেরির মতে পিওর পোয়েট্রি' হচ্ছে নিছক একটা ধ্বনির প্যাটার্ণ বোনা, যাতে মনে আনন্দবোধ হয়। বিষয়বস্তু, শব্দের মানে, কল্পনা, ওসব কিছু তাই দরকার নেই কাব্যের, চাই শুধু ধ্বনিময় শব্দের জাল বোনা। পল্‌ ভ্যালেরির মতবাদের পিছনে আছে ফরাসী কবি মালার্মের কবিতা; আর সাম্‌নে— নানা স্যুররিয়েলিষ্ট লেখকের অদ্ভুত প্রয়াস। মালার্মের দৃষ্টান্ত নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে কবিতার অর্থ শুধু এক রকমের vulgarised সংগীত মাত্র। আর স্যুররিযেলিষ্ট বাড়াবাড়িতে কবিতা মানে নিছক ব্যক্তিচেতনার একটা প্রকাশ—তাতেও শব্দের অর্থকে দূরে রাখবার চেষ্টাই স্পষ্ট। দু'দিক থেকেই এভাবে বাক্যের মানে, বিষযবস্তু প্রভৃতি এড়াবার চেষ্টা দেখা যায়। তার কারণও বোঝা যায়। বাক্য জিনিসটা দশজনে বোঝে, দশজনের সঙ্গে কাজ কারবারে তা গড়ে উঠেছে। ওটা সামাজিক সৃষ্টি। এ যুগের লেখকরা সামাজিক সংবদ্ধ, মানে জীবনক্ষেত্রের দায় ও তার দায়িত্ব, আর নিতে পারছেন না। তাই, শব্দ, বাক্য, এসবের সাধারণ-স্বীকৃত রূপ যেন তাঁদের পক্ষে বাধা হয়ে উঠ্‌ছে। তাই তাঁরা নিজেদের মুক্তির পথ খোঁজেন নানাভাবে—খুব বেশি নিজেদের রূপকর্মের উপর ঝোঁক দিয়ে, টেক্‌নিক্‌কে বা কলা-কৌশলকে

একেবারে চরম বলে মনে করে; কিংবা নিজের মনকেই নিজের একমাত্র আশ্রয় করে—একেবারে আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে, অথবা একেবারে রহস্যবাদী আধ্যাত্মধর্মী হয়ে। প্রত্যেকেই ভাবেন—তাঁর পথটাই খাঁটি পথ, 'পিওর আর্টের' পথ।

আসলে এই রূপকর্মের উপর ঝোঁক দেওয়া বা আত্মপ্রকাশের নামে পলায়ন-বৃত্তির আশ্রয় নেওয়া—এসব সেই পুরানো আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্-মতবাদের এদিক-ওদিক। আপনারাও 'পিওর আর্ট' বল্‌তে বুঝেন—আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্। চাইবেন—'পিওর আর্ট'; বলবেন—'আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্'। যেন আর্টিষ্টের পৃথিবী আর্টের ত্রিশূলের চূড়ায় স্থাপিত—ত্বনিয়ার ভূমিকম্পে তা টলবে না। এমন ভুয়ো কথা আর আছে? সে যে পাগলের পৃথিবী। পৃথিবীতে সব চেয়ে খাঁটি আত্মকেন্দ্রিক বা individuailst হচ্ছেন উম্মাদ—কবি আর প্রেমিকের কল্পনা বা কথাও অত 'স্বতন্ত্র' নয়, তাও পরের পরওয়ানা রাখে। আপনার আমার পৃথিবী তো দশজনের পৃথিবীর সঙ্গে বাঁধা—আপনার আমার মন তাদের মনের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙছে, গড়ছে। আর আবার ভাঙছি গড়ছি সেই দশজনের পৃথিবীও একটু একটু করে আপনি আর আমি,—আপনার সৃষ্টি আমার দৃষ্টি। কেউ আমরা 'পিওর' নই—নিজস্ব যা, তাও একার নয়, একান্ত নয়। যদি তা একান্ত হত তা হলেও এই তত্ত্ব তথ্যই থেকে যেত। তা পৃথিবীতে সত্য হয়ে উঠ্‌তে পারত না, কারণ অন্য কেউ তার মর্ম বুঝত না। আত্মতান্ত্রিকের বিশুদ্ধ আর্ট, বিশুদ্ধ রস তাই অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্‌শান্। আবার রূপকর্মবাদীর বা টেক্‌নিক্‌বাদীর বিশুদ্ধ আর্ট হল ধ্বনি দিয়ে স্নায়বিক উত্তেজনা জাগানো। ভাবের ও রসের মূল শেষটা তাই দাঁড়ায় এই—হয় তা কয়েকটা স্নায়ুর উত্তেজনা, নয় সত্তার

স্বগতোক্তি। জীবন-সত্য ভুলে গেলে কাব্য এমনিভাবে হয়ে ওঠে দেহতত্ত্ব বা রসতত্ত্ব, বা এমনি বিরোধী নানা 'তত্ত্ব'। তখনি আর্টের সঙ্গে জীবনের যোগ অস্বীকার করবার নানা ওজর খুঁজতে হয়। বল্‌তে হয়—আর্ট কি সবাই বুঝে?—তার ফলে নানা ছোট গণ্ডীর মধ্যেই আর্ট আপনাকে বন্দী করে।

আপনাদের যুক্তি—আর্ট সকলের জন্য নয়, মাত্র রসিকের জন্য। কিন্তু তার রসিক 'লাখে না মিলয়ে এক'; অবশ্য তার ফ্যাশান চল্‌তি হলে সমঝদার লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা দেয়। কিন্তু তার পূর্বে তার আসর খুব সীমাবদ্ধ। আবার এরূপ আর্টের স্রষ্টার সংখ্যা তাহলে আরো অল্প। তা 'কোটিকে গোটিক'। প্রিটেণ্ডারের সংখ্যা তাহলে বেশি হবেই। তাঁরাই প্রচণ্ড রকমের 'পিওরিষ্ট' হন। তাঁরাই সে আর্টকে করেন ফ্যাশান। ফ্যাশান খাঁটি না মেকি, তা বলার দরকার নেই। একবার যা ফ্যাশান হল, তার ভবিষ্যৎ গেল; তবে তার বর্তমান খুব ফাঁপানো ফোলানো, জাঁকালো। যতক্ষণ 'পিওর আর্ট' পিওর ততক্ষণ তা প্রায় esoteric, মণ্ডলীগত। আত্মরতি আর আত্ম-ছলনা। যখন ফ্যাশান, তখন যৌথ-ছলনা, আর যৌথ-বিলাস। যখন পিওর আর্ট esoteric, তখন তা গণ্ডীর সৃষ্টি, সৃষ্টিশক্তিহীন; আর যখন ফ্যাশান তখন machine production, প্রাণশক্তিহীন।

আমরা সাধারণ মানুষ। দশজনের সঙ্গে মিলেই বাঁচি—আর দশজনের সঙ্গে মিলে উপভোগ করতে পারলে আমরা খুশী হই। কাজেই আমরা 'পিওর আর্ট' বুঝি না। আমরা সাধারণ লোক—বই পড়ি।

বাঙলাদেশে ক'জন লোক বই পড়তে জানে?—শতকরা পাঁচজন। পাঁচকোটি বাঙালীর মধ্যে পাঁচজনের বেশি ওরূপ বিশুদ্ধ আর্টের অধিকারী আছেন কি না জানি না। কিন্তু জানি, পাঁচ কোটি বাঙালীর মধ্যে পাঁচ শ' লোকও নেই, যাঁরা হতে পারেন এর সমঝদার।

তাই বলি, যা আমরা বুঝি তাই বরং আপনারা আমাদের এখন দান করুন। আর যা আমাদের দরকার, তাই এখন আপনারা জোগান। দরকার কিসের জানেন? দরকার জমি গড়ার, দরকার আমাদের রুচি গঠনের। দরকার আমাদের মনকে মার্জিত করবার আর আমাদের বোধকে গভীর করবার। দরকার আমাদের বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করবার আর দৃষ্টিকে ব্যাপক করবার। দরকার জীবন-ভূমিতে ফিরে যাবার আর সেই জীবনভূমিকেও গড়বার। অর্থাৎ দরকার জীবনে ও জীবনযাত্রায় বিপ্লবের। তাই দরকার আসলে জীবনকে এখন চিনবার; আর তা হলেই সাহিত্যকে চিনতেও দেরী হবে না।

অবশ্য যদি আপনাদের জানাশোনার মধ্যে কেউ এমন থাকেন, যাঁকে সাহিত্যের 'সৃষ্টি' ডাক দিয়েছে, তিনি কারও তাগিদের অপেক্ষায় নেই। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর প্রকাশ-পথ খুঁজছেন। জানবেন, তাঁর পক্ষে সে ডাক না শুনে উপায় নেই। কানে মোম পুরেও যদি নিজেকে তিনি কোনো কাজের জাহাজের মাস্তুলে বেঁধে রাখেন, তা হলেও তিনি নিষ্কৃতি পাবেন না। তাঁর কানে বাজবেই সেই আহ্বান, আর তাঁর কলমে ফুটবেই তাঁর মনের রূপ—সে পিওর আর্টই হোক আর সংকর আর্টই হোক। কিন্তু জানেনই তো সমস্ত বাংলা দেশেই এমন লোক আছেন জন পাঁচ ছয়। বাকী যে পাঁচশ' জন লেখক কলম চালান, তাঁরা জন্মসূত্রে সে কলম পাননি। লেখা তাঁদের সখ, লেখা তাঁদের

সামাজিক অ্যাম্বিশান, লেখা কারও পক্ষে সামাজিক দায়িত্ব থেকে আত্মগোপনের পথ, দেশকে বঞ্চনা ও বঞ্চনা নিজকে। এঁরাই সবচেয়ে বেশি 'নিত্যকালীন দাবি' আওড়ান, 'স্বরাজ' কিম্বা 'সমাজ' আন্দোলনকে পরিহাস করেন। এ হচ্ছে তাঁদের আত্ম-বিদ্রূপ, এ হচ্ছে তাঁদের আত্মবিদ্রোহ, কিংবা জীবন থেকে ভয়-ভাবনায় পিছিয়ে-যাওয়া মনের rationalisation ; আত্মপ্রসাদ নয়, মূলত আত্ম-ধিক্কার—জেনে আর না জেনে। অধিকাংশ লেখকই হচ্ছেন লেখার কারিগর। কিন্তু এঁরাই তবু আসর জমিয়ে রাখেন। আর তাই কলাবিদের আবির্ভাব না হলেও আসরটা টিকে থাকে। সেটা কত দরকারী, তা বলাই বাহুল্য। এ শ্রেণীর লোক চেষ্টা করলে কিছু-না-কিছু লিখতে পারেন—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, চলনসই কিছু। একটু ভালো, কি একটু মন্দ। এসব তাঁরা দিতে পারেন আমাদের। দিতে পারেন সেই অর্কিড। কিন্তু তার চেয়ে ভালো কাজ হয় তাঁরাই যদি আমাদের জমি তৈরী করেন, রুচি গঠন করেন। কি করে করবেন? পুরনো-নতুন হাজার খানেক দেশী বিলেতী বই তর্জমা করে। স্পষ্ট কথা বলচি, বাঙলায় ভালো বই অনুবাদ করে। শুনে এসব লেখকরা রাগ করবেন কি? কেন? সমস্ত বাংলা সাহিত্যই দেখেছেন বিলেতের সাহিত্যের ভাবানুবাদ। আমাদের জন্ম-লেখকের দলও জেনে-শুনে বাংলায় ইউরোপীয় চিন্তাই ঢেলে সাজছেন। তা' করতেও হবে যতদিন আমরা ইউরোপের সমান হয়ে না উঠি। তখন দুনিয়ার মানসিক ইতিহাসে এত বড় ভেদ থাকবে না। আর তখন আমাদের জন্মাধিকারী লেখকও হয়ত ইউরোপীয় চিন্তাজগতের ভাবগুরু হয়ে পড়বেন। কিন্তু যতদিন আমরা এগুতে না পারছি ততদিন তা সম্ভব নয়। তাই আমাদের মানসিক স্তরটা

দরকার তাড়াতাড়ি উন্নীত করা। দরকার রুচি গঠন আর বোধশক্তির উজ্জীবন। দরকার জমি তৈরী করা। তারই একটা মানে—বিষয় ঠিক করে নিয়ে বিলেতী হোম ইউনিভার্সিটি সিরিজ বা থিংকার্‌স্‌ লাইব্রেরীর মতো বাঙলায় হাজার খানেক বই তৈরী করা—নানাবিষয়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক সংবাদ বাংলায় পরিবেশন করা। বিশেষজ্ঞরা লিখলে ভালো হ'ত, কিন্তু তাঁরা বাঙলায় লেখেন না। অতএব, সাধারণ লেখকরাই বিলেতী বিশেষজ্ঞদের বইগুলি ঢেলে সাজাক। তার সঙ্গে সঙ্গে রাখুন শত দুই পুরনো বইর অনুবাদ। পশ্চিমী ক্লাসিক্‌স ও দেশীয় ক্লাসিক্‌স বাংলায় অনুবাদ করুন—স্যাগা আর এদ্দা, গ্রীক নাট্য আর মহাকাব্য, মূল আরব্য উপন্যাস আর শাহনামা (দোহাই আবার তা যেন সচিত্র করা না হয়), আর তামিল, শৈব আলোয়াড়দের গান, গুজরাটী ও মারাঠী প্রাচীনদের গাথা, আর হিন্দী পৃথ্বীরাজ রসো, রাজপুত বীরত্বগাথা, আলহার গান ইত্যাদি। এ সবের প্রসাদে আমরা পাব ঠিক পরিপ্রেক্ষিত—জীবনের ও জাতির, সমাজের আর যুগের। আর ততক্ষণ পড়ুন ইংরাজিতে কন্‌টিনেণ্টাল সাহিত্য, ইচ্ছা হয় করুন তারও অনুবাদ।

তা'হলে দরকার জমি তৈরী করা—শুধু লেখাও নয়, মাঠে নামা। সত্যি জমি তৈরী করার—অনেককাল যে জমি পতিত পড়ে রইল, যাতে আবাদ করলে ফলত সোনা। অনেককাল রয়েছে পতিত—কবে থেকে? জানি না, হয়ত আকবরের পর থেকে, হয়ত আরো আগে থেকে ;কিন্তু পতিত রয়েছে অনেককাল, তাতে সন্দেহ নেই। সেই জমি আবার তৈরী করতে হবে—অনেক আগাছা সাফ করতে হবে, অনেক জঙ্গল কাটতে হবে, উপড়ে ফেলতে হবে মূল শুদ্ধ অনেক গাছ-গাছড়া, খুঁড়ে তুলতে হবে মাটির তল থেকে জল, নদী কেটে আনতে হবে নহর। জমি তৈরী করতে

হবে। এটাই আজ আমাদের কাজ, আর তারই নাম বিপ্লব—খুলে দেওয়া বন্ধ ঘরের দুয়ার, মুক্ত করা চাপা-পড়া জীবন-ধারা, এগিয়ে দেওয়া ইতিহাসের বিকাশ-শক্তি। একাজ শুধু কলমের জোরে হবে না—হবে কোদালির কোপে, তারপরে কাস্তের ঘায়ে, হাতুড়ীর জোরে। সেটাই আসল অস্ত্র,—আজ স্বষ্টির আসল উপকরণ। আর তাই নামতে হবে মাঠে—আগাছার বনে।

কিন্তু কোদালিই কি সব? তা নয়। দেখেছি, কলমের কাজও আছে। এই জমি তৈরীর দায়েই আবার দরকার মনের জমিও সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করা। তা তৈরী করতে পারি আমরা বুদ্ধিকে তীক্ষ্ম করে আর হৃদয়ের বোধ-শক্তিকে উজ্জীবিত করে। বুদ্ধিকে তীক্ষ্ম করতে চাই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ইস্পাত, আর বোধশক্তিকে উজ্জীবিত করতে চাই কাব্য, আর জোর প্রাণরস। বুদ্ধিকে নির্মল করতে চাই সাদা কথা, খাঁটি গদ্য। তার কাজ বুঝানো আর পড়ানো: মনকে মতের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলা, আর মনের গতিকে করা সুনিশ্চিত। অন্যদিকে কাব্য আর কল্পনা দোলা দেয় হৃদযবৃত্তিকে, তার যুক্তি হল logic of emotion—আর তা'ই logic of creation, তাই তা স্বষ্টি। স্বষ্টি বলেই তা হৃদয়কে স্পর্শ করে। প্রাণকে স্বষ্টির আকাঙ্ক্ষায় পাগল করে দেয়। আর এই ভাবে বুদ্ধি আর অন্তরাবেগ আর চঞ্চল পৃথিবীর জীবন-ধারা—সবে মিলে জীবনের উত্তাপে রচনা করে নূতন স্বষ্টি, দেখা দেয় নূতন সমাজ ব্যবস্থা,—আর তাই বিপ্লব।

তার জমিই তৈরী করতে হবে কোদালি দিয়ে আর কলম দিযে, হাতে-কলমে এবং হাতে আর কলমে।

বক্সা, ১৯৩৩।

সাহিত্যের স্বরাজ

ছিলাম ভালো। কিন্তু মানুষ ভালো থাক্‌তে পারে না। কারণ কিছু তাকে করতেই হয়! আর এমন জিনিস পৃথিবীতে কি হতে পারে যা শুধু ভালো? মানে, নিছক ভালো, নির্জলা ভালো, pure good? জীবনে কিছুই তেমন pure নেই, আছে কি? সৃষ্টি এই purism বা puritanism পারে বরদাস্ত করতে? জীবন ভালোও নয় মন্দও নয়, তা তুইই। আর এ তু'এর থেকেও বেশি, অনেক বেশি, একেবারে দোস্‌রা ব্যাপার—মানে, তা জীবন, তা সৃষ্টি করতে পারে। তা 'আছে' আর 'নেই' একই কালে। কারণ, তা কেবলি 'হচ্ছে,' হচ্ছে আর হচ্ছে। যা ছিল তা আর নেই, যা ছিল তা থাকে না। আমিও যা ছিলাম, তা থাক্‌তে পারলাম কোথায়? ছিলাম ভালো, কিন্তু ভালো থাক্‌তে পারলাম কই? কিছু করতে গেলাম, আড্ডা আর গল্প, তর্ক ও তাকিয়া ছাড়াও কিছু করতে গেলাম। বল্‌তে গেলাম—pure বলে কিছু নেই, pure poetryও কিছু নেই—আর ভালো থাক্‌তে পারলাম না—সাহিত্যিক বন্ধুরা খাড়া হয়ে উঠ্‌লেন। আমি ছিলাম ভালো, কিন্তু সে বন্ধুরা আমাকে ভালো থাকতে দিলেন না। বলেছিলাম—জীবনে pure কিছু নেই, কি কবিতা কি সাহিত্য। তাতেই বিপদ ডেকে আন্‌লাম। বল্‌তে গেলাম—কলম আর কোদালিতে একই কাজ চলে; জীবনের ক্ষেত নিড়ানো আর ফসল ফলানো,—তুকাজ হলেও আবার একই কাজ। আর তা বল্‌তেই বিপদ বেড়ে গেল। ছিলাম ভালো; কিন্তু বিপদ ডেকে আন্‌লাম, বিপদ বাড়িযে তুললাম—এমনি জীবনের নিয়ম। সে বাড়ে, তাই বিপদও বাড়ায়। আবার বিপদ থেকে নিজেকে ছাড়ায়ও;—তাতেই

সে বাড়ে। সে বাড়ে। নইলে সে তো থাক্‌ত নিশ্চল, তা'ই status quo ; কিন্তু জীবনের নিয়মই তা নয়—সে বিপদে ঠেলে দেয়, বিপথে নিয়ে চলে। আমারও তাই বিপদে পা বাড়াতে হল। এত অনুশাসন সত্ত্বেও পা বাড়াতে হল বিপথে,—সাহিত্যর এলেকায়,—যেখানে দেবদূতরাও যান না ভয়ে, মূর্খরা সদর্পে প্রবেশ করে। আমিও প্রবেশ করলাম কিছু না ভেবে।

'আমরা সাহিত্যিক',—আমার এখানকার লেখক বন্ধু জানালেন. জানালেন রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধৃত করে, অথবা সে কথাকে তাঁর নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করে,—"আমাদের উপর দাবি একমাত্র স্বষ্টির—কোদালিরও নয়, হাতুড়িরও নয়, এমন কি স্বরাজেরও নয়, স্বাধীনতারও নয়। কারণ, আমাদের নিয়মে স্বাধীনতা হচ্ছে স্বষ্টির স্বাধীনতা, আর স্বরাজ হচ্ছে সাহিত্যের স্বরাজ। অন্য স্বরাজ আমরা মানি না। রাষ্ট্রীয় স্বরাজ চাই, তা প্রয়োজন বলে। যেমন কালিদাসও নিশ্চয় চাইতেন উজ্জয়িনীর কৃষকদের ক্ষেতে পরিমিত বর্ষণ হোক্ ; কিন্তু সত্য বলে মানতেন শিপ্রাতীরে নির্বাসিত যক্ষের বিরহকে। চাইতেন ক্ষেতে কোদালি চলুক, ফসল ফলুক ; কিন্তু জানতেন স্বষ্টির দাবি এই যে—চলুক তাঁর কলম, আর রচিত হোক্ মন্দাক্রান্তার শ্লোক।"

আমি সাহিত্যিক নই—লিখি, তবু লেখক নই। লিখি নিতান্তই জীবিকার দায়ে, আর তাই লিখি জীবনের তাগিদে। আমি সাহিত্যিক নই, কিন্তু চিনি জীবনযাত্রার রূপ ; তাই পড়ি—জীবনের বড় সাক্ষ্য। আর গর্ব করেই বলি—এ যখন চিনি, এ যখন পড়তে পারি, তখন সাহিত্যও বুঝতে পারি, বুঝতে পারি সাহিত্যের সত্য। ধরে নিয়েছি—জীবনের সহায় বলে—তার সহগামী বলেই—না সাহিত্য হয় সাহিত্য।

ওই সহার্থক শব্দটা তার জন্ম-গোত্রের সাক্ষী। তার সকল রূপের খোঁজ—আর সকল রূপহীনতারও নির্দেশ—ওই কথাটিতেই রয়েছে। যত বলি 'বিশুদ্ধ কবিতা' জানি তা জীবনেরই একটা রূপ আর বাণী; যত বলি 'সাহিত্যের স্বরাজ' জানব তা জীবনেরই একটা দাবি—নইলে তার মানে নেই, তাতে সত্য নেই।

কিন্তু শুন্‌বেন কেন তাঁরা, সাহিত্য যাঁদের ধর্ম, যাঁরা জাত সাহিত্যিক? তাঁরা জানালেন সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য আর ঘোষণা করলেন তার স্বাধীনতা। ভেবে পাই না, কি সত্য আছে ওই সাহিত্যিক Declaration of Independenceএ? ততটুকু আছে কি যতটুকু আছে মার্কিনি গণতান্ত্রিকদের সেই স্বাধীনতা ঘোষণায়? ততটুকুও নেই, তার সিকি সত্যও নেই। সে মন্ত্র ঘোষণার কথা তো জানি। সে মার্কিনি-মন্ত্রের পিছনে একদিন এক বড় সত্য ছিল—গভীর সত্য ছিল, উদার সত্য ছিল। মানুষের মহিমার সেদিন নতুন খোঁজ মিলেছে। সেদিনকার সমাজ তারই আবেগে আনন্দে কাঁপছে; তা আর পুরনো কাঠামোতে আঁটা থাকতে পারছে না। তাই মাতৃভূমির ধনিকের আর ব্যবসায়ীর আঁচল-বাঁধা থাক্‌ল না উপনিবেশের সাবালক সন্তানেরা। তাঁরা নতুন সত্য ঘোষণা করলে। আর তা'ই আবার ১৭৮৯-এর রক্ত-স্নানে 'মানুষের অধিকার' বলে রূপ গ্রহণ করলে। সে কী আশ্চর্য সত্য! কী তার ইতিহাস! পঞ্চাশ বছরে ইউরোপে তার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হল। সাহিত্যেও সে স্বাধীনতার হাওয়া লাগ্‌ল। তারপর পৃথিবীতে 'মানুষের অধিকার' জয়ী হল,—আর সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী হতে চাইল তা মানুষের বৈষম্য রূপে। 'অধিকার-ভেদ' এমনি ভাবেই সব দেশে সব কালে শেষ হয় এসে জাতিভেদে, শ্রেণীভেদে। মার্কিনি সত্যও এমনি করেই আজ

অ-সত্য হয়ে পড়েছে। সেদিনকার Declaration of Independence শুধু জন কয়েকের স্বাধীনতা দিয়েছে, আর নব্বুই জনের অধীনতাই কায়েম করেছে। শতকরা দশজনের এই স্বাধীনতা ঘোষণা হয়ে উঠেছে নব্বুই জনের অধীনতা ঘোষণা। আমরা তো আমেরিকাতেই তার প্রমাণ দেখছি। তাই ওই ঘোষণায় মাত্র দশভাগ আছে—আর নব্বুই ভাগ অ-সত্য। 'স্বাধীন দেশে' দশজন আছে মানুষ—যাদের মনুষ্যত্বের অধিকার আছে, আর নব্বুই জন তো মানুষ নয়—যন্ত্র,—'হাতুড়ি আর কাস্তে'। 'মানুষের অধিকার' কতটুকু আছে সাধারণ মানুষের—নব্বুই জনের? যতটুকু ওই দশজন স্বাধীন শাসক দেন, ওই দশজন গণ্যমান্যরা দিতে চান,—মানে, যতখানি ওই নব্বুই জন গণ-মানবদের না দেওয়া যায়, ওই নব্বুই জনকে যতটা রাখা যায় মানুষের অধিকার থেকে ঠেকিয়ে। কলমের স্বাধীনতাই বা তা হলে কতটুকু? এই দশজনের হাতে তা শোভা পাবে। বাদবাকীর হাতে কলম থাকবে না, থাক্‌বে কাস্তে আর হাতুড়ি। উপরওয়ালার 'কলমচি' আমরা—মশালচি আর বাবুর্চি নই; বলি, "আমরা মেঘদূত লিখি, যক্ষের বেদনা বুঝি,—উজ্জয়িনীর ক্ষেতের চাষী আর কামারশালার কারিগরের জন্য লেখা আমাদের দায়িত্ব নয়"। আমরা কলমচি, কলম বড় লোকের হাতে শোভা পায়; তাই আমাদের আদর—আমরা বাবুর্চি নই, মশালচি নই—মশালচি হল সাংবাদিকরা।

কথাটা বুঝি ঠিক হল না। সত্যই তো মাত্র দশজনের জন্য তো সাহিত্যিকরা লেখেন না। লেখেন তাঁরা সকলেরই জন্য—একশো জনের জন্যই। এমন কি আরও বেশি, সকল যুগের সকল মানুষের জন্য।

এ তো মিথ্যা নয়। নব্বু ইজনকেও যে তাঁরা চান ওই দশজনের সমান করে নিতে, সমানাধিকার দিতে, এখানে তো তাঁরা শ্রেণীভেদ চান না, মানেনও না। তাঁরা 'Republic of Letters' মানেন; মানেন The Classless Republic of Letters; মানেন না বরং Dictatorship of the Proletariat বা নব্বু ইজনের দৌরাত্ম্য, কিংবা Dictatorship of Capital বা দশজনের কর্তৃত্ব।

ঠিক কথা। সাহিত্যকরা সকলের জন্যই লেখেন; তাঁরাই জাতিভেদ মানেন না—শূদ্ররাজও না, বৈশ্যরাজও না। খুব সত্য এই কথা। তাঁরা বরং চান সাহিত্যের স্বরাজ, মানে Republic of Letters. কিন্তু তা বলে সে রাজ্যের অধিকারী কি সবাই? রামা-শ্যামা যেদো-মেধো সবাই? রায়বাহাদুর আর রাজাবাহাদুর, গেঙারীরাম আর ঝুনঝুনওয়ালা? মোটেই তা নয়। সেখানে একমাত্র অধিকারী রসিক। রসজ্ঞান যাঁর আছে তিনিই একমাত্র সেই স্বরাজ্যের citizen. এ রিপাব্লিক আসলে এক Oligarchy of Letters, শুধু রসিকের স্বরাজ্য—সে রসিক শতকরা দশজনের শ্রেণী থেকেও আসতে পারেন কিংবা ওই নব্বু ইজনের শ্রেণী থেকেও উঠতে পারেন। বঙ্কিমের উপন্যাস আমরাও পড়ি, বাংলাদেশের যাঁরা পড়তে জানেন সবাই পড়েন। আমিও পড়ি আর আমার চাকর রজনীও পড়ে। আমার থেকে বেশিই পড়ে, হয়ত আমার থেকে কম আনন্দও সে পায় না। পাঠকের প্রাণে তাই রস থাকলেই হল—কি যায় আসে তিনি যদি হন পাটের দালাল? কি যায় আসে সে যদি হয় পাটের চাষী?

যায় আসে না কি? আমি তো দেখেছি—যায় আসে। এই তো একক্ষেত্রে পাঠক 'তিনি', আর একক্ষেত্রে পাঠক 'সে'; আর ওকথা

দু’টোর মানে পরিষ্কার, তাদের ইঙ্গিত ভুল করবার নয়। না, সে ইঙ্গিত ভুলবারও নয়। লেখকও ভুল করবেন না। ওকথা দু’টোর মানে হচ্ছে এই, এই সমাজে পাটের দালাল ও পাটের চাষী এক সমান নয়; আর তার ইঙ্গিত এই—রসের জগতেও তারা সমান হতে পারে না। তাদের রসবোধ যদিই বা সমান হয়, তবু তাদের রসগ্রহণের শক্তি সমান হবে না। রসের অনুভূতির ক্ষমতা হয়ত সমান ছিল। কিন্তু সব ক্ষমতারই তো অনুশীলন দরকার। সেই অনুশীলনেই শক্তি বিকাশ লাভ করে; নইলে তা বেঁকেচুরে হয়ত নানা পথে তৃপ্তি লাভ করে, কিন্তু ঠিক বিকাশ লাভ করতে পারে না। পারে না, তাই চাষারা পাঁচালি পড়বে, আমরা পড়ব রবীন্দ্রনাথ। উজ্জয়িনীর সব চাষাই অনুভূতিহীন ছিল না; আর নবরত্নের সব রত্নই যে রসজ্ঞানে জন্ম-রসিক ছিলেন তাও নয়। তাঁদের অনুশীলনের সুযোগ ছিল—আর ওদের পক্ষে তা ছিল না। তাঁরা জন্মেছিলেন ভাগ্যবানদের ঘরে, আর পেয়েছিলেন বিকাশের অনুকূল পরিবেশ; আর ওরা জন্মেছিল কৃষকের ঘরে, পেয়েছিল কৃষিকাজের দরকারী পরিবেশ। তাঁদের রুচি গঠিত হল—ওদের রুচি গঠিত হল না। তাই ওরা বড় জোর সে যুগের কাজরী গান শুনেছে, নেচেছে, গেয়েছে, আনন্দ পেয়েছে; আর তাতেই ওদের রসবোধ তপ্ত হয়েছে, সার্থক হয়েছে। আর রাজসভায় বিদগ্ধজন শুনেছেন ‘মেঘদূত,’ তর্ক করেছেন কেউ মন্দাক্রান্তা নিয়ে, কেউ শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দ নিয়ে; বিচার করেছেন কেউ অলংকারের গৌরব নিয়ে, কেউ কাব্যের স্বভাব নিয়ে। তাঁদের রুচিজ্ঞানে পুলকিত হয়ে কখনো হয়ত মহাকবি ঘরে ফিরেছেন জয়মাল্য মাথায়; আর কখনো তাঁদের রসবোধে হতাশ হয়ে বররুচির মতো বলেছেন, “অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ,

মা লিখ।” কারণ, রাজসভায় রুচি হয়ত সবাইকার মার্জিত ছিল খুব, কিন্তু সবাইকার তা বলে রসবোধ তো সমান গভীর ছিল না। বরাহ হয়ত ভেবেছেন, ‘মেঘদূতে’ জ্যোতিষের কিছু প্রমাণ হয় না—যদিও বরাহও প্রকাণ্ড প্রতিভা, রুচিও তাঁর হয়ত ছিল। এরূপ অনুমান একেবারে অসম্ভব নয়। শুনেছি, নিউটনও নাকি সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক শুনে বলছেন—‘এতে কি প্রমাণ হল’? প্রমাণ যা হল তা এই—রসবোধ আর জ্ঞান এক জিনিস নয় এবং রসবোধও সকলের সমান থাকে না। আরও প্রমাণ যা হল তা এই—রুচি আর রসবোধ এক জিনিস নয়। তবে রুচি স্বচ্ছ হলে রসবোধ স্বচ্ছ হয়, নইলে রসবোধও নানা বাজে জিনিস নিয়ে ভুলে থাকতে পারে। আবার এটাও ঠিক, রুচিও সকলকার গঠিত হয় না, তা জন্মসূত্রে মানুষ পায় না। রসবোধ হয়ত অনেকটা পায় জন্মসূত্রে। তবু তাও রুচি দিয়ে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল করে তুলতে হয়। আর রুচি পায় পরিবেশ-সূত্রে—মানে, পরিবার-সূত্রে আর শ্রেণী-সূত্রে। তাই পাটের দালাল যে সুযোগ পান, পাটের চাষী সে সুযোগ পায় না। রসের জগতেও তাই একজন হবেন ‘তিনি’, আর জন হয় ‘সে’। তাই রসের বাজারে আমাদের রজনী আর আমিও সমান অংশীদার নই। অনেক দিনে বঙ্কিমের জগৎ আমাদের এতটা পরিচিত হয়ে উঠেছে যে, তাতে প্রবেশের পথে অনেক বাধা কমে গেছে। তার জন্য যতটুকু রুচি পরিবর্তন দরকার তা এদেশের বাঙালীর মোটামুটি হয়েছে। তাই রজনীও তাতে প্রবেশ করে, আর এসে বসে যায়। কিন্তু তার গ্রহণশক্তি আর আমার গ্রহণশক্তি এখনো তবু স্বতন্ত্র। তবু একই ট্রেনে আমরা যাচ্ছি, আমি অন্ততঃ ইণ্টারে আর রজনী থার্ড ক্লাশে শ্রেণীভেদে। আমি রুচির মালিক, আর রজনীর রুচির পালিশ নেই। আমি

রবীন্দ্রনাথ পড়ি, কিন্তু রজনীর কাছে সেখানকার চাবি এখনো নেই। আমি ভদ্রলোক, রুচিও আমার সহজে এযুগের ভদ্রলোকের মত হয়েছে; রজনী রয়েছে শতকরা নব্বুইজনের মতো, রুচি তার নেই। সাহিত্যরাজ্যেও তাই ঢুকতে পান শতকরা দশজনের যে কেউ রুচির অধিকারী। আর তাঁরাও, যারা সেই দশজনের শ্রেণীর—থাক্ বা না থাক্ তাঁদের রসবোধ, আছে তাঁদের মোটামুটি রুচি; মানে, নিজ শ্রেণীর সাধারণ পালিশ। আর আছে তা ছাড়াও শ্রেণীগত শক্তি, টাকা কড়ি, বন্ধু-বান্ধব। রসের রাজ্যও তাই শুধু রসিকেরই রাজ্য নয়। না, Republic of Lettersও সাহিত্যের একান্ত আসর নয়।

রসের রিপাব্লিকই আসলে ভুয়ো। তবে আছে oligarchy of the ruling class. সাহিত্যিক তারই সহিত চলেছে—রাজসভার রাজকবি। আসলে বরাবরই সাহিত্যিককে ruling classএর গান গাইতে হয়েছে—অবশ্য যেদিন থেকে ruling class জন্মেছে। কারণ এক সময় তারা ছিল না। গোড়ায় অবশ্য শিল্প সাহিত্য নৃত্য গীত সবই ছিল এক সঙ্গে। তখনো মানুষের কাজ ভাগ হয়নি, অনুভূতিও সূক্ষ্ম হয়নি, ভিন্ন ভিন্ন ধারায় তার প্রকাশের পথও তাই দরকার হয়নি। হয়ত সেদিনকার সমাজে সবাই নাচ্‌ত, গাইত, ছবি আঁকত। আর সেই নাচ-গানও ছিল আবার তাদের শিকারের উৎসব। হল নবান্নের উৎসব, মানে, হল 'বর্ষা-মঙ্গল'—শস্যস্বপ্ন। আর হল তা আবার একই কালে প্রার্থনা আর কবিতা, শিল্প আর ধর্ম। মানব সৃষ্টির পৃথক্ পৃথক্ এলেকা তখনো চিহ্নিত হয়ে ওঠেনি, সবই একাকার। কারণ

সেদিনকার সমাজই যে ছিল একাকার—সবাই শিকারে যায়, এক সঙ্গে মারে ভাগ করে খায়, একত্র হয়ে নাচে-গায়, আর তা দিয়ে দেবতার নিকট প্রার্থনা জানায়। এই ছিল এক আদিম যুগ। তখনকার নাচ-গান, মন্ত্রতন্ত্র, পূজা-পার্বণ,—সব প্রায় 'ধর্ম', সব প্রায় প্রাণধারণের চেষ্টা, সব জীবিকার প্রয়াস। তার থেকে ক্রমশ এলেকা ভাগ হল, সাহিত্যও একটা নতুন দেশ হয়ে উঠ্‌ল, হল স্বতন্ত্র এলেকা। আর তারও আবার হল ক্রমে ক্রমে কত প্রদেশ, কত জনপদ, কত গ্রামনগর। কারণ, একাকার সমাজও যে ভাগ হয়েছে; গড়ে উঠেছে বিশেষ বিশেষ কাজের ভার নিয়ে বিশেষ বিশেষ স্তর,—কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য, কেউ শূদ্র; মানে হয়েছে কেউ শাসক আর কেউ শাসিত। কখনো তারপর কেউ হয় রাজা, কেউ প্রজা। তাদেরও কেউ হয় সম্রাট বিক্রমাদিত্য, আর কেউ তার করদ রাজা, অসংখ্য প্রজা; আবার কেউ লিচ্ছবী বা এথেন্সের নগরের পৌরজন আর কেউ তার দাস; কেউ সামন্ত ও জায়গীরদার ভূঞা, কেউ তার গোলাম; কেউ জমিদার কেউ রায়ত; কেউ বৈশ্য বণিক, অনাথ-পিণ্ডদ কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, কেউ শুধু তার পণ্য-উৎপাদক; কেউ ধনিক, ফোর্ড কি টাটা, কেউ শ্রমিক; কেউ ব্যাংক আর ট্রাষ্টের মালিক, মর্গ্যান কিংবা ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালস্, কেউ শুধু নিজের গতরের মালিক, বিত্তহীন আর প্রায়ই বৃত্তিহীন। এমনিকরে গড়ে উঠেছে ইতিহাস—শাসক আর শাসিত, দুটা শ্রেণী বরাবর রয়েছে। নিচেকার মানুষ এক এক দলে উপরে উঠে এসেছে, উপরে এসেছে সামন্তরা, তারপর বণিকেরা, তারও পরে ধনিকেরা। কিন্তু একেবারে তলাকার মানুষ তবু তলেই রয়েছে, কৃষকেরা শুধু চাষই করেছে,

শ্রমিকেরা শুধু শ্রমই জুগিয়েছে। যে যখন উপরে উঠেছে সে শাসকের আসনে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু শাসিতের শ্রেণীর দিন কেটেছে যে তিমিরে সে তিমিরে। শাসন আর শোষণ চলেছে এক সঙ্গে,—লর্ড কার্জন তা বল্‌বার আগেও—বহু শতাব্দী থেকে প্রায় সকল সমাজে। শাসক বরাবরই শোষক, আর শাসিতও বরাবরই শোষিত। তবে শোষিতের দল থেকেও এক-এক পর্যায় উপরে উঠে এসেছে, শাসন কেড়ে নিয়েছে।

যে দল যখন শাসন কেড়ে নিয়েছে, নিয়েছে তার যোগ্যতা ছিল বলে—সমাজের দেহে তার শক্তি নতুন শক্তি-সঞ্চার করতে পারছিল বলে। তাই সামন্তরা রাজার হাত থেকে রাজশক্তি কেড়ে নেয় ; জায়গীর-দারের গড়খাই-ঘেরা কেল্লা ওঠে, তার চারদিকে চাষী ছুতোর মিস্ত্রী কারিগর নতুন নতুন শহর পত্তন করে। শহরে আবার বেড়ে উঠ্‌ল সওদাগরেরা, তারা বাণিজ্য চালায় শহরে-শহরে, সামন্তরা দেয় বাধা। সামন্তদের হাত থেকে বণিকেরাও ক্ষমতা একদিন তাই কেড়ে নিলে—মুক্তি পেল সামন্তদের গোলামেরা। বণিকেরা শাসন হাতে পেলে ব্যবসা-বাণিজ্য ফেঁপে উঠ্‌ল। খুঁজল তারা আরও উৎপন্ন জিনিস, আরও পণ্য ; এল তার দায়ে যন্ত্র। বসল কল-কারখানা, বণিক হল ধনিক। সভ্যতা সাত-সাগর পাড়ি দিলে, সাম্রাজ্য বিস্তার করলে। এল সাম্রাজ্যবাদের যুগ—এশিয়া জুড়ে তার 'বাজার', আফ্রিকা জুড়ে তার কাঁচা মালের আড়ৎ, পৃথিবী জুড়ে তার মাকড়সার জাল। দুনিয়ার হাটে হাটে তার মাল, পাড়ায় পাড়ায় তার ফেরিওয়ালা, গাঁয়ে গাঁয়ে তার রেলপথ আর মালগাড়ী। দুনিয়ার ভাগভাগি নিয়ে ধনিকদের মধ্যে তখন পড়ল কাড়াকাড়ি, বাধল সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পরের লড়াই, আর এল তারপরে—

কিন্তু থাক্ তা, কথা হল—দেখছি যখন সমাজে যে শক্তি-সঞ্চার করেছে তখনি সে শাসন আয়ত্ত করেছে। আর যখন শাসন যে আয়ত্ত করেছে তখনি সাহিত্য গেয়েছে তার গান—তার জয়গান, তার আশার গান, আর তার স্তবগানও। মোটের উপর সাহিত্য অন্যায় কাজও করে নি—কারণ সে গেয়েছে বিজয়ীর গান, আর তা বিজয়ের গানও। আর বিজয় তো শুধু শ্রেণী বিশেষেরও হয়নি, সে বিজয় যে মানুষেরই ক্রম-বিজয়, সমাজের সে বিন্যাস যে সমাজেরই ক্রমবিকাশ। আর সে বিজয় যে তাই সাহিত্যেরও বিজয় আর তারও ক্রম-বিকাশ। অবশ্য এ সব বিজয়েও মানুষের চূড়ান্ত জয় হয় নি। মাত্র দশজনকে আজ পর্যন্ত সে দিয়েছে মুক্তি, স্বাধীনতা, শক্তি ; নব্বুই জন রয়েছে বন্দী, শাসিত ও শোষিত। আর বারে বারে এক একবার এক পা এগোবার পরই আবার সমাজ স্থাণু হতে চেয়েছে—যারাই শাসনশক্তি হাতে পেয়েছে তারাই শাসন-শক্তি আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে। শাসনদণ্ডের জোরে অন্যদের চেয়েছে শায়েস্তা করতে, আইন ক'রে চেয়েছে নিজেদের সুখ সৌভাগ্য সব পাকা করে নিতে—অর্থাৎ বাদবাকীদের ওপর শোষণ আর অত্যাচার কায়েম করে রাখতে। অবশ্য কেউ তা পাকা করে রাখতে পারে নি, সামন্ত-কর্তারা পারে নি, বণিকেরা পারে নি, আজ ধনিকেরাও পারছে না। কারণ তাদের যার যখন যা দেবার ছিল তা চুকিয়ে দেওয়ার পর আর সমাজে তাদের কিছু দেবার থাকে নি। সমাজ তাদের দান পেয়ে বেড়েছে ; কিন্তু তার পরে আরও নতুন শক্তি না পেলে তো সে আবার বাড়তেও পারে না। তখন সমাজে একটা জরার ভাব দেখা দেয়। অথচ নতুন শক্তিকে শাসকেরা কি সহজে পথ ছেড়ে দেয়? কখনো না। মানুষের

ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আছে নাকি? নেই বলেই দ্বন্দ্ব বাড়ে, মারামারি বাড়ে। এদিকে সমাজও এগোতে না পেয়ে কেবলই ঘূর্ণীপাকে পাক খায়। এমন কি একটা সংকটের দিনও সমাজের বারেবারে আসে—মানুষের ইতিহাসে যখন এক একবার ঘূর্ণীপাক সৃষ্টি হয়। আর সাহিত্য? সমাজের সহিতই সাহিত্য চল্‌ছে তো; তখন তাহলে কি করে সাহিত্য? ঘূর্ণীপাকে পাক খায়, দিশা হারায়, ওলট-পালট হয়; ডিগবাজি খায়, পথ খুঁজে পায় না। পথ খুঁজে পায় না—তাই করে **backward march**, তারা পিছু হটে, কিংবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করে **mark time**, কস্‌রৎ। আর—আর যখন দেখে যুগের ব্যর্থতা আর দেখে নতুন শক্তির উদয়াভাস—তখন গেয়ে ওঠে নতুন উৎসাহে তার আগমনী, গায় নতুনের নিমন্ত্রণ গান, গায় সৃষ্টির সংবাদ, জীবনের জয়গান—আর দেখা দেয় মানুষের ইতিহাসে আর এক আবির্ভাব।

এই তো সাহিত্যের ইতিহাস—তার স্বতন্ত্র ইতিহাস আবার কি? কি তার স্বাধীনতার মানে? স্বতন্ত্র অবশ্য সাহিত্য হয়েছে তা তো দেখেছি। শিল্পেরও একটা বিশেষ দেশ বলে গণ্য হয়েছে সাহিত্য; তেমনি সাহিত্যেরও আবার বিশেষ বিশেষ প্রদেশ, জনপদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এটা হল বিকাশ, বিকাশেরই নিয়ম। স্বতন্ত্র মানে তা বলে 'বিচ্ছিন্ন' নয়। আসলে এ স্বাতন্ত্র্য কতটুকু? জীবনেরই একটা কোঠা সাহিত্য, হয়ত তার চূড়া, জীবন থেকে নিচ্ছে আর জীবনকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। আবার ফিরে নিচ্ছে, আর তেমনি ফিরিয়ে দিচ্ছেও—আদান-প্রদান চলেছে বরাবর, চল্‌ছে প্রত্যেক নিমেষে। পৃথিবীতে এই জন্য pure কোনো শিল্প নেই, আর স্থির সত্যও কোনো কিছু নেই—

pure কোনো-কিছুই নেই, মানে, বিচ্ছিন্ন বা বিশুদ্ধ—সবই পরস্পরে সম্পর্কিত, আর সবই ক্ষণে ক্ষণে সেই দেনা-পাওনার ফলে আবার নতুন হচ্ছে। সাহিত্যকেও তাই বিচ্ছিন্ন করবার উপায় নেই—তার নিজের এলেকা আছে, কিন্তু তাও জীবনের ওলট-পালটে নতুন হচ্ছে—বিজ্ঞান তাকে বদ্‌লায়, জীবনযাত্রার তাগিদে তার আয়োজন নতুন হয়, আবার তার নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়। এমনি শতভাবে তা শতপাকে জড়ানো জীবনের শত ভাগ-বিভাগের সঙ্গে। শুধু সাহিত্য, নিছক সাহিত্য, এসব কথার তা হলে মানে কোথায়? মানে নেই। তাই আঁরি ব্রিমোঁ pure poetry বলেন প্রার্থনার মতো কবিতাকে, আর পল্ ভালেরি pure poetry বল্‌তে বোঝেন গানের মতো কবিতাকে। দুইই সত্য, আর দুইই মিথ্যাও। কারণ কবিতারও নিজ এলেকা আছে। আর কবিতার সে এলেকায় সেই শাস্তরসাস্পদ মন্ত্রও শুন্‌তে পাই, আর সঙ্গীতময় গুঞ্জনও শুন্‌তে পাই—কিন্তু তা ছাড়াও আরও শুন্‌তে পাই অনেক কিছু—শুন্‌তে পাই বরাবর সৃষ্টির বাণী। আর কবিতাও সাহিত্যের একটা এলেকা শুধু, কবিতা ছাড়াও কাব্য হয়, কথা ফোটে।

সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য এমনিতরই। তার স্বাতন্ত্র্য এই—তাতে তত্ত্ব বড় কথা নয়, তাতে তথ্যও বড় কথা নয়; তা নিজের ঐতিহ্য মেনেও চলে, আবার তা ঐতিহ্য ভেঙেও চলে; তাতে শাস্ত্রের দোহাই কোনো কাজ দেয় না; এমন কি, হিতাহিতের দোহাইও নিষ্ফল—শুধু তা জীবনযাত্রার সহযাত্রী, সৃষ্টির নিয়মে-ধরা।

আর এ যখন সাহিত্যের মূল কথা, তখন সাহিত্যিকের স্বাতন্ত্র্য আর স্বাধীনতাই বা কতটুকু? যতটুকু যখনকার জীবনযাত্রা তাকে দেয় তখন ততটুকু; যতটুকু যে সমাজ মানুষকে দেয় ততটুকুই।

জীবনযাত্রায় যতদিন শাসক ও শোষক কর্তৃত্ব করবে, ততদিন শাসকদেরই আছে স্বাধীনতা। আর শিল্পীর বা সাহিত্যিকের তখন স্বাধীনতা থাকে শাসক-ও-শোষকের সংগে এক হতে পারে বলে—সেই সংগে চলেছে বলে, তাদের কলমচি বলে। তাই, যেমন শাসিতের স্তর থেকে শাসক সমাজে এক-এক দল প্রোমোশ্যান পায়, শিল্পীর বা সাহিত্যিকের আসর সেই পরিমাণে বড়ও হয়, তাদের সৃষ্টির এলেকাও বিস্তৃত হয়। জীবনযাত্রার সীমারেখা বেড়ে যায়, আর শিল্পী আর সাহিত্যিকও সেই পরিমাণেই আবার জীবনযাত্রায় ব্যাপ্তি দেখে, মুক্তি পায়। কথাটা বোঝা সহজ। একদিন তো সাহিত্যিক ছিল রাজার পারিষদ—অবশ্য খুব বেশি সাহিত্যিকই কি আর সেই সৌভাগ্য পেয়েছেন? আর যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরাও খুব সাবধানেই সে সৌভাগ্য বজায় রেখেছেন। তবু, একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে তখন উজ্জয়িনীর বিজনপ্রান্তে কানন ঘেরা বাড়ি পাওয়া যেত—আর এই স্তুতি গেয়েই কবি বাঁচতেন। কবি বাঁচতেন রাজার প্রসাদে—রাজসভায় সেদিন তবু সেনাপতি আর বীরের যুগ; কবি আর কবিতার সম্মান কতটুকু ছিল কে জানে? তারপরে তো কবি বাঁচতেন রাজা-রাজড়ার সভায়। বাঁচতেন সামন্তদের বীর্যের আর শৌর্যের গান গেয়ে, প্রেরণা জাগিয়ে। তেমনি কবি চারণ আর ভাট। কতকাল ধরে এমনি গেছে সাহিত্যিকের জীবন—গেয়েছেন 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'। সব সময়ে কি তবু কবি পেয়েছেন শান্তি বা স্বস্তি? দামুন্যায় অত্যাচার সয়েছেন, বর্ধমানের জন্মভূমি ছেড়ে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় আশ্রয় নিয়েছেন। ওদিকে ছিল রাজা-রাজড়ার সভার নর্ম জোগাবার জন্য নটনটী—ইউরোপে ছিল রাজা আর সামন্তদের খাশ নটকের দল।

তাদেরই মূর্তি গড়তেন শিল্পী, তাদেরই মর্জি হলে গড়তেন মন্দির মস্‌জিদ গির্জা। তারপর বণিক-রাজ দেখা দিল। সাহিত্যিকরাও আরও একটু স্বাধীন হতে পারল। আর এল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, এল গণতন্ত্র। সাহিত্যিকরা হলেন এবার গণতন্ত্রের গুরু, জনগণের রাজকবি। তাদের লেখার দাম হল—পৃথিবীতে দামের ও বাজারের নিয়ম এসে গেছল। সাহিত্যিকরাও পেলেন সাহিত্যিক হিসাবে স্বাতন্ত্র্য, পারিষদ আর তাঁরা নেই—সংবাদপত্রে, রেডিয়োতে, সিনেমাতে আজ গণতন্ত্রের যুগে তাঁরাই পান রাজসম্মান—ভাস্কর বা স্থপতি আগে পেতেন প্রিন্‌স্ পোপের হুকুম, এখন পান পৌরসভার অর্ডার কিংবা ধণিকগোষ্ঠীর অর্ডার, আর চিত্রশিল্পীর চিত্র নিয়ে বাজার বাড়ান পিয়ার্স কোম্পানি কিংবা বেঙ্গল কেমিক্যাল, কাড়াকাড়ি পড়ে ধনকুবেরের বংশে।

এই গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগে সাহিত্যিক অনেকটা স্বাধীন হয়েছেন। তা'ই তাঁরা মনে করেন, আর তাই অন্যেরাও মনে করে। নইলে এ যুগের এই ঠাট টিক্‌ত না। বণিকেরা শোনায় মজুরকেও,—'মজুর, তোমার স্বাধীনতা আছে। তুমি ইচ্ছা করলে কাজ না করেও পার, তুমি তো কলের মালিকের ক্রীতদাস নও। সামন্ত যুগ তো নেই, গোলামিও নেই।' কিন্তু কতটুকু তা নেই—তাই শুধু বুঝতে ভুল হয়। ভুল হয় মজুরের, ভুল হয় লেখকের। ক্রীতদাস আজ কেউ নেই। কিন্তু খেতে হবে, আর তাই চাই জমি গরু আর লাঙ্গল; তাও নেই মজুরের হাতে। তা হলে হতে হয় তাকে কারিগর; চাই তার কারিগর মিস্ত্রীর যন্ত্র। তারও দিন শেষ হয়েছে কল-কারখানার দাপটে; আর সে কল-কারখানা মালিকের হাতে। তা হলে যাও কল-কারখানায়—আর উপায় যখন নেই।

"স্বাধীন" মজুরের উপায় নেই, বাধ্য হয়েই "স্বাধীন"ভাবে বাজার বুঝে মেনে নেয় যা পায় "মজুরী"। এই তার দাম। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই মূল্য, শতকরা নব্বুইজনের এই হল বাজার দর। ক্রীতদাস নেই, আছে 'মজুরীর দাস', বা 'দরের দাস'। আর সাহিত্যিকেরও কদর তাঁর দর আছে বলে; সে দরও ওর থেকে ভিন্ন রকমের কিছু নয়। আজ তো তাঁরা আর রাজারাজড়ার পারিষদ নন, সামন্তদের তাঁবেদার নন,—তাঁরা লেখেন জনসাধারণের জন্য, মানে যারা পড়তে পারে তাঁরা তাদের সাহিত্যিক—এদেশে পড়তে পারে শতকরা ন'জন;—আবার যারা কিনতে পারে তাঁরা তাদের সাহিত্যিক;—এ দেশে কিনতে পারে শতকরা ক'জন?—তা হলে লেখককেও বুঝতে হয় এ 'বাজারের ভাও'। সাহিত্যিক অনেকটা স্বাধীন, আর বড়লোকের মোসাহেব নেই তাঁরা;—কিন্তু কতটা স্বাধীন? পাঠক নয় পরোক্ষে থাকেন, প্রত্যক্ষে আছে কাট্তির ভাবনা, আছে প্রকাশকের শাসন, আর শাসকদেরও পরওয়ানা। তাই, বাজার বুঝে চল্‌তে হয়—বাজারের দালালের মর্জি জানতে হয়। এই 'বাজার' সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ,—কত লেখা কত শাখা আজ সাহিত্যের! এই 'বাজার' সাহিত্যের শ্রীহীনতারও কারণ—বাজার বেতালা। এদিকে মন্দা, ওদিকে বেকার। এদিকে ক্ষেতভরা গম পুড়ে দিতে হচ্ছে, ওদিকে লোকে খেতে পায় না। এদিকে জাহাজ-বোঝাই কফি যাচ্ছে সমুদ্রের তলে, ওদিকে লোকে তা চোখে দেখে নি। এদিকে খেটে খেটে মানুষের বুকের রক্ত মুখে উঠ্‌ছে, আর ওদিকে বেকার মানুষের বুকের রক্ত শুকিয়ে হিম হয়ে যাচ্ছে। এদিকেও বেকার ধনী, leisure class; ওদিকেও বেকার

মজুর unemployed workers. এদিকে বেকার ধনীর চাই সূক্ষ্ম কথা, সরু কাজ, ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প, thriller, sex appeal, যৌন বিশ্লেষণ—অমনিতর কৃত্রিম কিছু, চাই 'good time,'; আর ওদিকে বেকার মজুরের চাই উত্তেজক নেশা—উন্মাদনা, রোমাঞ্চ, সেক্‌স, সিনেমা; crude ও violent কৃত্রিম কিছু। বাজার আজ বেতালা, সাহিত্যও আজ বেতালা। তাতে বিকারই বেশী। বিকারের ছাপ পাতায় পাতায়—লরেন্সের চিত্তবিক্ষোভে, প্রুস্তের প্রাক্তন-উজ্জীবনে, অল্‌ডাস্‌ হাক্‌সলির ঝরা পাতায়, আর এপিঠ-ওপিঠের দ্বন্দ্বে, এলিয়টের ধ্বংসলোকে। সমাজ ঘূর্ণীপাকে পাক খাচ্ছে, সাহিত্যেও ঘূর্ণীপাক। তবু সাহিত্যিকের আছে স্বাধীনতা আর মজুরের আছে স্বাধীনতা?—

'সাহিত্যিক বাজারের দাস নন'। সত্যি কথাই। বই এর কাটতির উপর ভরসা করে থাকতে হলে আমাদের দেশে অন্তত সাহিত্যিকের জীবনই কাটত না। শরৎ বাবু তবু পারছেন সেভাবেও বাঁচতে। কারণ, শরৎ বাবু সত্যি আমাদের মধ্যবিত্তের সাহিত্যিক—আমাদের আশার নিরাশার, আবেগের আনন্দের, সংস্কারের আর বিকারের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে তিনি চলেছেন। আমাদেরই একজন তিনি—জ্ঞানে-অজ্ঞানে। কিন্তু আর কোনো সাহিত্যিক পেরেছেন কি সে ভাবে বাঁচতে, সেভাবে লিখতে? রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান—সেটা আমাদেরই সৌভাগ্য—নইলে তাঁকে খুঁজতে হত ডিপুটিগিরি। নিদেন—হতেন সাংবাদিক, লিখতেন সম্পাদকীয় লেখা। টেক্‌স্‌ট বই লিখতেন, নাটক লিখতেন, আর লিখতেন সিনেমার গল্প। আমাদের দেশ আবার বণিকরাজের দেশও নয়—এটা বণিকের চাকরের রাজত্ব। আমাদের গোলাম-রাজার দেশ—গোলামির চেয়ে প্রশস্ত পথ জীবিকার আর

নেই। বঙ্কিম গোলামী করলেন, মাইকেল তা না করতে পেয়ে মরলেন। আজকের সাহিত্যিকরাও সেই গোলামীর তখ্‌তে বস্‌তে পেলে হাতে চাঁদ পান। আমি কবি হতে চাইলে আমার পরিবার কপালে করাঘাত করবে। আমি কেরাণী হতে চাইলে আমার পরিবার তবু আশ্বস্ত হবে। আর আমি ডিপুটি না হয়ে সাহিত্যিক হতে চাইলে বলবে—'মনে করো বঙ্কিম, মনে করো নবীন, মনে করো—' আমাদের সাহিত্য চাকুরেয়র সাহিত্য। এই চাকুরেয়র সাহিত্য আসলে 'চাকরের সাহিত্য'। হবেই ; কারণ এযে গোলাম-রাজার দেশ। আমাদের সাহিত্য-সভা হবে—সভাপতি হবেন বড় চাকুরে্য। মেয়েদের আসরে কর্ত্রী হবেন বড় চাকুরেয়র গিন্নী। আমাদের সভায় চাকুরে্য এলে আমরা বর্তে যাই—একটা লোক এল! নামের পিছনে একটা আই-সি-এস্ দেখলে আমাদের মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা আভূমি-প্রণত সেলাম করেন। চাকুরেয়রা বই লিখলে আমাদের ভাষা ধন্য হয়। তারা সাহিত্যিক হলে আমাদের সাহিত্যিকদের আর গর্বের শেষ থাকে না। তারা ডাকলে আমাদের লেখকরা ছুটে যান। না ডাকলে আমাদের লেখকদের মান ম্লান হয়ে যায়। তারা আমার বই পড়েছে জান্‌লে আমার মনে নতুন গর্ব আসে, আমি নতুন প্রেরণা পাই—দেশশুদ্ধ লোকেই মনে করে আমিও একটা মানুষ। এই গোলাম-রাজার দেশে তা হলে কতটুকু স্বাধীন সাহিত্যিক? কতটুকু স্বাধীন সাহিত্যিক-মনের দিক দিয়েই বা? কতটুকু সাহিত্যিক স্বাধীন প্রকাশের দিক দিয়ে, বিকাশের দিক দিয়ে? কতটুকু সে স্বাধীন জীবিকায়,—আর কতটুকু স্বাধীন তাই জীবনে? আর কতটুকু স্বাধীনই বা ধনিকরাজের দেশে সে দেশের সাহিত্যিকরা? তবু

সৌভাগ্য তাঁদের তাঁরা চাকরের সাহিত্য লেখেন না। কিন্তু লেখেন কি? লেখেন দালালের সাহিত্য। সমাজে সেখানে দালালিতে সুবিধা বেশি—'বাজার' সেখানে বড় সত্য, তা পরোক্ষ জিনিস নয়। সাহিত্যিক হওয়ার চেয়ে সেখানে শেয়ার মার্কেটে ঘোরা বেশি লাভের—আর বেশি লোভের। ক'জন পারেন সাহিত্যের নামে সেই লোভ ছাড়তে? আবার, বই লেখার থেকে সেখানে বই বেচার কথাটা আরও বড়; ক'জন পারেন বিক্রীর কথা ভুলে শুধু বই লিখতে? আর, সেখানেও জীবনে কত বড় ঘূর্ণাবর্ত; কি করে উঠবেন সাহিত্যিক তার উপরে? কতটুকু তা হলে সে দেশেও সাহিত্যিকের স্বাধীনতা—মনের, মতের, প্রকাশের, বিকাশের, জীবিকার, জীবনের? বাজারের দরই তাঁরও দর—কতটুকু তার স্বাধীনতা?

যতটুকু ধনিকের সমাজ সইতে পারে ততটুকু—ততটুকুই। যতটুকু নব্বুইজনের অধীনতার সঙ্গে পাওয়া যায় ততটুকু—ততটুকুই।

তা'হলে কি করেন সাহিত্যিক? শুধুই দশজনের কথা করেন প্রকাশ—যেমন, আমরা অসাহিত্যকরা করি তাদের কথা প্রচার। দশজনের শ্রেণীকে আমরা চিনি। সেখানেই আমরা বাঁচতে চাই, সে বাঁচা মোটের উপর আরামের। নব্বুইজনের শ্রেণী আর জীবন এক বিভীষিকা। তাই আমরা নিই সেই উপরওয়ালা শ্রেণীর প্রচারের ভার, হই খবরের কাগজের লেখক। আর দশজনের শ্রেণীতে বাঁচতে চান সাহিত্যিকও। তিনিই বা কেন পৃথিবীতে শক্তি নিয়ে জন্মে বইবেন অভাবের অভিশাপ? নব্বুই জনই তাঁরও কাছে এক বিষম দুঃস্বপ্ন। ওই ওপরওয়ালা শ্রেণীর কথা আর ভাবনাকেই তিনিও প্রকাশ করেন। আমরা প্রচার করি, তাঁরা প্রকাশ করেন। আমরা সরাসরি দশজনের

ক্ষেত নিড়োই, তাঁরা সে ক্ষেতে ফসল ফলান,—কিংবা ফুটান তাদের সখের বাগানে ফুল।

প্রচারে আর প্রকাশে তফাৎ আছে। অবশ্য সব জিনিসের মতোই এই দুই লোকেও দেনা-পাওনা চলে। প্রচারও কত নিপুণ হতে পারে, তা কত লেখায় আমরা দেখি। আর প্রকাশ যে কত সুন্দর প্রচার হতে পারে তার প্রমাণ মহাকাব্য থেকে ছোট গল্পে পর্যন্ত রয়েছে। তবু প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্পষ্ট বিজ্ঞাপন। প্রকাশের একদিকে ফল হয় জ্ঞাপন, আমাদের সম্মতি আদায় করে নেওয়া,—বিশেষ করে ওটাই প্রবন্ধ সাহিত্যের লক্ষ্য; তা সুলিখিত হলে তাতে আমরা সায় দিই। আর দিকে রস-সাহিত্যের ফল হল স্বীকৃতি—কথাচিত্রের মধ্য দিয়ে তা আমাদের অনুভূতিকে পরোক্ষে স্বীকার করিয়ে নেয়, কল্পনা ও ছন্দের মধ্য দিয়ে তা আমাদের অনুভূতিকে একেবারে সরাসরি স্বীকার করিয়ে নেয়। তবু, আমরাও যার কথা বলি সাহিত্যিকরাও তার কথাই বলেন—এদেশে বল্‌তে হয় গোলাম-দেশের ভদ্রলোকদের কথা, বাবুগোলামের কথা! আর ওদেশ ধনিক-দেশের ধনিক আর তার দালালের কথা—মোটামুটি, উপরওয়ালা শ্রেণীর কথা। শ্রেণীর কথাই বলতে হয়—শ্রেণী যতদিন আছে।

কিন্তু শ্রেণীর কথাই কি শুধু বলেন সাহিত্যিকরা, কিংবা বলি আমরাও? 'বলি না আমাদের নিজের কথা? আমার কথা—যা আমারই কথাও'? বন্ধুরা বেশ ব্যঙ্গভরেই হাসেন। প্রচার যদি নৈর্বক্তিক হত, তা'হলে সব প্রচারকই হতেন একরূপ। কিন্তু দেখেছি—সাংবাদিকে সাংবাদিকে লেখার কত সূক্ষ্ম তফাৎ; আর লেখকে-লেখকে তফাৎ কত সূক্ষ্মতর? লেখক তো নৈর্ব্যক্তিক নয়।

সব লেখাই একটা বিশেষ মানুষেরও মনের কথা—তার মধ্যে ব্যক্তির ছাপ আছে। আর ব্যক্তির পরিচয় আছে বলেই তা মানুষকে সচেতন করে। আর সত্যি, সাহিত্য কি শুধুই শ্রেণীগত প্রচার বা শ্রেণীগত প্রকাশ? সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে সাহিত্যিক আপনাকে আবিষ্কার করেন। লেখা যে দরকার তাঁর নিজের জন্য, আত্ম-পরিচয়ের জন্য, আত্ম-উদ্ঘাটনের জন্য। কথাটা মিথ্যা বলি কি করে?—আমরা জন্মেছি আর একটু একটু করে নিজেকে চিন্‌ছি, নিজেকে আবিষ্কার করছি। শিশুর চেতনায় কতটুকু থাকে তার বৈশিষ্ট্য আর নিজস্বতা? শিশুর সত্তা হচ্ছে অব্যক্ত। সে বড় হয়, বাইরের সংবন্ধে সচেতন হয়—মায়ের দেহ থেকে তফাৎ হয়ে প্রথম সে পায় 'স্ব'-দেহ। তার আগে তার দেহও নেই 'স্ব'-ও নেই—একদিন মানুষেরও তেমনি ছিল জীবজগতের সঙ্গে একাঙ্গতা। চোখ মেলে চেতনায় শিশু দেখে—মাকে, অপরকে, যা সে নয় তাকে। অপরকে চিনে সে, তাতেই নিজকেও চিনে। এমনি চলে মানুষের আত্ম-পরিচয়। এরূপেই আমরা সমাজের সংঘাতে প্রতিদিন নিজেকেই চিন্‌তে চলেছি, আবিষ্কার করেছি। সেই পরিচয়ই আমরা লিখেছি আমাদের কাজে প্রথমে, তারপরে কথায়; আরও পরে লেখায়, ছাপায়, কত কিছুতে। আবার লিখতে লিখতে সে পরিচয় ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে, লেখা আমাদের ঢেকে দেয়, তা হয় ছদ্মবেশ, চিন্তার আত্মগোপন। কিন্তু মজা এই—লেখার এই ছদ্মবেশের মধ্য দিয়েই মানুষ সব চেয়ে বেশি ধরাও পড়ে। যা সে নয় যতই সে জোর দিয়ে তা ঘোষণা করুক, তার নিজের স্বর তবু ধরা যাবে, ধরা যাবে তার নিজের অ্যাক্‌সেণ্ট। তার নিজের চিন্তার, কল্পনার ও জীবনাবেগের সমস্ত সুর ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আস্‌বে। আর যদি

খুব সাধুভাবে কেউ লেখায় খুলতে চায় নিজের মন—সজ্ঞানে চেষ্টা করে নিজের পরিচয় নিতে ও নিজের পরিচয় দিতে—তা হলেও সে মানুষকে চেনা যাবে। তার নিজের যে রূপ সে আঁকতে চায়, তারও পশ্চাতে রয়েছে যে তার অপরিচিত তার ছায়া-দেহ, তা পর্যন্ত দেখা যাবে সে লেখায়। ওজন্য মনোবিদের শরণ নিতে হয় না। পড়ুন যে কোনো স্মৃতি-গ্রন্থ, যে কোনো আত্ম-চরিত, কিংবা ডায়েরি। লেখার মধ্য দিয়ে মানুষ ফুটে বেরুবেই—জেনে হোক্, না জেনে হোক্। কিন্তু জেনে যে মানুষ লেখার মধ্যে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে, আত্ম-পরিচয় ও আত্ম-উদ্ঘাটনের জন্য যে হাতে নেয় কলম, তার কাছে লেখা হয় রিলিজিয়ন। জানেনই তো, 'আত্মানং বিদ্ধি' এই হল আমাদের সব শাস্ত্রের মূল কথা। 'Know thyself'—বৃদ্ধ পোলোনিয়াসও বল্‌ছেন তাঁর ছেলেকে, বল্‌ছেন 'Above all to thy own self be true', জানো নিজেকে, আর তোমার নিজের কাছে তুমি সত্য হও—পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম ও জ্ঞানের এই শেষ যুক্তি।

পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের সেরা রহস্যও এই মতে নিজে, এই সত্তা। কি ওর স্বরূপ? কি সে, তাই জিজ্ঞাসা করে করে এগিয়ে চলে মানুষ; প্রশ্নের উত্তর আর শেষ হয় না। শেষ হবে কি করে? কি আপনার আমার সত্তা, আমিই কি তা জানি, না আপনি তা জান্‌তে পারেন? এবেলা আপনার যা ভালো লাগে ওবেলা তাতে রুচি হয় না। অস্থির মানুষের মন, আর অস্থিরতাই হল জীবনের ধর্ম। তবু নাকি সত্তা এরই মধ্যে আছে স্থির, অচঞ্চল। পরিবর্তনের স্রোতে সব ভেসে যায়, শুধু সত্তাই থাকে অপরিবর্তনীয়। অথবা, সত্তা তাতে হয়ে ওঠে

পূর্ণতর।—এই হল বন্ধুদের কথা। কতটা এ ধারণা বিচারে তর্কে টেকে তা বলা শক্ত। এই মানব-চৈতন্যের সঙ্গে কুকুর-চেতনার কতটা তফাৎ তা কে বল্‌বে? বল্‌ছেন তো পণ্ডিতেরা—এই আমাদের সত্তাও হয়ত মাত্র কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সের সমষ্টি। ঠিক সময়ে এক পেয়ালা চা না পেলে মনে হয় তুনিয়া বিস্বাদ,—আর এক চুমুক শ্যাম্পেন পেলে তুনিয়া রঙীন। মাত্রা চড়লে আপনিই অতি সহজে হতে পারেন সম্রাট আলমগীর। অন্তত, সত্তা যে হেরিডিটি ও পরিবেশের মিশ্র পূরণ-ভাগ তা মানতেই হয়। বিজ্ঞান একদিন হয়ত পরীক্ষা করেই বলে দেবে আপনার স্বরূপ। যা'ই ভাবুন, মোটের উপর আপনার সত্তার খোঁজ শুধু আপনাতে পাবেন না। পিরাণ্ডেলোর Six Characters in Search of the Dramatist এর থেকেও অদ্ভুততর হবে আপনার এই অনুসন্ধান। দেখবেন আপনারও ভেতরে শুধু six characters নয়, ছ'শো ক্যারেক্‌টার। তার কে অভিনেতা আর কে মূল পাত্র তা বলা অসম্ভব। আর কোন্‌ রসস্রষ্টা নাট্যকার বা কোন্‌ রসবেত্তা দর্শক যে তাদের এই অভিনয় উপভোগ করছে তা জানা আরো অসম্ভব। হয়ত সেও গেছে এই অভিনেতার দলে মিশে—যেমন রবীন্দ্রনাথের নাটকের কবি বা রাজা নেমে পড়েন রঙ্গমঞ্চে। হয়ত সে রয়েছে এদের সবার থেকে স্বতন্ত্র—সাংখ্যের পুরুষের মতো। সত্যই, আপনি অনেক শীর্ষ, অনেক পাদ, অনেক বাহু। কিংবা সত্যই আপনি বহুরূপী। প্রত্যেকেই তাই। তবু, নিজের এই বহুরূপের আড়ালে স্বরূপ একটা আছে, এই হল আমাদের বিশ্বাস। আর তা একেবারে অসম্ভবও নয়। জন্মসূত্রেও আমরা সবাই বিচিত্র-দেহ, যদিও সবাই মানুষ। একটু বিচিত্র তেমনি হয়ত

জন্মসূত্রেই আমাদের মনও,—এক একটা ব্যতিক্রম বিশেষ। তা আবার পরিবেশের যোগ-বিয়োগে বিচিত্রতর হয় মুহূর্তে মুহূর্তে। পিরাণ্ডেলোর মতো তার খোঁজে নামলে তাই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি; দেখি শুধু চারদিকে হাজার 'আমি'র কোলাহল। একেই তো জটিল জীব আমি। তারপর, জটিলতর সমাজে আমি আত্মসচেতন হই—কত জটিলতার মিশ্রপূরণের ফল আমার প্রত্যেকটি mood. তারপর, টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে আজ সমাজ; আপনার, আমার ব্যক্তিত্ব আর সত্তাও খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ছে না তো কি? তা অনুসন্ধান তবু করতে হয়, পিরাণ্ডেলোও তা ছাড়েন নি। আপনার আমার পক্ষেও ছাড়াবার পথ নেই। বরং যতই জীবনের অন্য প্রকাশ-পথ বন্ধ হবে ততই এ নেশা বাড়বে। দেখবেন—আপনার রূপের উপর রূপ ধরা পড়বে, আপনার খোলস ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে কেবলি আপনি এগিয়ে চল্‌বেন—এরই নাম আজ 'স্বরূপ'-আবিষ্কার। মানে, আত্ম-ব্যবচ্ছেদ। কারণ, আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত হয়ত কিছুই করবেন না। কারণ আবিষ্কার করবার মতো সত্যই যা আছে তা বড় ভয়ানক—ভয়ঙ্কর আর তা প্রলয়ঙ্কর। সে আবিষ্কার আপনার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে দেখা দেবে, আপনি তা বুঝুন আর না বুঝুন। আপনার প্রত্যেকটি রূপই তো এক আবিষ্কার। প্রত্যেকবার আপনি যেমন নিরাশ হয়ে ছুটছেন এগিয়ে অমনি পাচ্ছেন আর এক নূতন আবিষ্কার। আবার তা ফেলে যান। কারণ তাও তো একটা-মাত্র রূপ, আপনার সবটা নয়; আপনার খণ্ডরূপ, আপনার স্বরূপ নয়। ছুটলেন নতুন আবিষ্কারের দিকে। তাও আবার তেমনি ভাবে আপনাকে নিরাশ করবে—এও তো আপনার আদি অন্ত নয়।

আপনার স্বরূপ আবিষ্কার আর হবে না। আপনি জান্‌বেনও না যে এই সমস্ত রূপ তার থেকে পৃথক নয়। জানবেন না যে, এই শত শত রূপেই আপনার স্বরূপ। আর সে রূপ ফোটে সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতে। দেখবেন না যে, আপনি দশ দিকের ঘাত-প্রতিঘাতে ভেঙে ভেঙে চলেছেন আর গড়ে গড়ে উঠ্‌ছেন। এই আপনার পরিচয়—এর কোনো-একটিমাত্র নয়, সব কয়টি। তার চেয়েও বেশি—আপনি আপনি হিসাবেও সমাজকে ভাঙছেন, গড়ছেন—ভাগ্যবিধাতা।

এ পরিচয় শুধু লেখার মধ্য দিয়েই সম্ভব, এরূপ ভাববারও তা হলে কারণ নেই। জেনে আর না জেনে মানুষ সব-কিছুর মধ্য দিয়েই কি এই আত্মপরিচয় দান করছে না?—লেখার মধ্য দিয়ে, গানের মধ্য দিয়ে, ছবির মধ্য দিয়ে, নাচের মধ্য দিয়ে। কথার মধ্য দিয়ে আর কাজের মধ্য দিয়েও কি এই পরিচয়ই ফোটে না? তবে, কারও পরিচয় নিজের কাছেও ঝাপ্‌সা থাকে, অপরের কাছেও থাকে ঝাপ্‌সা। তাদের যা বৈশিষ্ট্য তা চোখে পড়েও চোখে পড়ে না। তারা সামান্য-ধর্মা। হয়ত জন্মাধিকার তাদের অল্প, আর পরিবেশের প্রতিকূলতা করেছে তা স্বল্পতর। আবার, কারো পরিচয় স্বল্পস্থায়ীও। কথার আর কাজের থেকে লেখার আর ছবির আয়ু দীর্ঘতর। গানের আর নাচেরও জীবন এখন থেকে দীর্ঘতর হবে। এসবের মারফৎ যাঁরা নিজেদের উদ্ঘাটন করবেন তাঁদের নাম বেশি দিন টিকৃবে। কিন্তু শীঘ্রই হয়ত সে সব নামও সংখ্যায় ভয়ানক বেড়ে যাবে। এখন আমরা কিছুই ধ্বংস হতে দিই না, সব কুড়িয়ে রাখি,—গজে গজে ফিল্‌ম, ইঞ্চি ইঞ্চি রেকর্ড সব জমা করি। ফলে, জমে উঠ্‌বে লক্ষ লক্ষ কৃতী পুরুষের নাম, thick

as leaves of Vellombrosa. তখন আবার ছেঁটে ফেল্‌তে হবে কিছু নাম। এমনি করে মহাকালের কাস্তের সাম্‌নে আমার মতো আপনার মতো প্রায় সবাই যাবে শেষ হয়ে। তবু, আপাতত কিছুদিন কৃতীদের নাম শোনা যাবে, আর তাই কি কম? দু'দিন বেশি বাঁচতে পেলে মানুষ কি না দেয়?

কিন্তু, ঠিক মতো আত্ম-পরিচয়ও মানুষ আজ কিছুতেই দিয়ে উঠ্‌তে পারে না। ঠিক মতো নিজের স্বরূপ যেমন আজ আমরা জানতে চাই না, তেমনি যতটুকু জানি তারও পরিচয় আমরা আজ দিয়ে উঠ্‌তে পারি না। গানে, লেখায়, ছবিতে, কথায়, কাজে, কোনোটাতেই সম্পূর্ণ পরিচয় আজ ফোটে না। খুব ভালো করে ওসব পথের বিশেষ আঙ্গিক অধিকার করছি, তবু পরিচয়ে ফুটছে না। শুধু আত্ম-সাধনায়ও তা হয় না—জন্মাধিকারের সঙ্গে অবশ্য থাকা চাই সাধনা, আর থাকা চাই নিপুণতা, কৌশল। অনেকটা মেরে দেওয়া যায় বুদ্ধির কৌশলেও। এসব থাকলে অবশ্য নিজেকে খানিকটা উদ্ঘাটন করা সম্ভব। তবুও অনেক বাকী থাকে। কেউ আরো অনেকটা প্রকাশিত করে দেন—যতটুকু রূপ অপর-গ্রাহ্য প্রায় সব। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় আজ কেউ দিয়ে উঠ্‌তে পারে না। কতটুকু দিতে পারি? যতটুকু এই সমাজের কাঠামোর মধ্যে দেবার সুযোগ আছে। মানুষের কাছে মানুষ যতটা প্রকাশিত হতে পারে, যতটা পারে মানুষ মানুষকে দিতে,—তাও আর দিতে পারি না আমরা আজ। কি করে পারব? এ যে পতিত জমি—Wasteland. জন্মসূত্রে যদি কবি হয়ে থাকি, তবু আজ গোলাম দেশে আমি হব মুনসেফ্‌, হব ডাক্তার, হব পুলিশ কোর্টের উকীল, আই. সি. এস্‌। কোথায় আমার ব্যক্তিত্ব বিকাশের

পথ—নিজের ভাষা? তা ছাড়া নেবার শক্তিও মানুষের সমান নয় তো। যথেষ্টও নয়—তাও দেখেছি। পাটের দালাল আমাকে নিতে পারবে, কিন্তু পাটের চাষী আমাকে নেবার জন্যই প্রস্তুত হয় নি যে। আজ মানুষের সৃষ্টিশক্তি মুক্তি চাইছে। সে প্রবল হয়েছে, ধনিকের প্রয়োজনের থেকে বড় হয়ে উঠেছে। তাই ধনিকের সমাজ চায় তাকে চাপা দিতে। ব্যক্তির সত্তা আজ চায় তাই এই দশজনের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি, নব্বুই জনের উৎপাদন শক্তিও চায় সার্থকতা। আর সৃষ্টিশক্তির পক্ষে তা'ই স্বাধীনতা। তা হলে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতাই বা আজ কিসে?—মানুষের এই চাপা-গড়া সৃষ্টিশক্তিকে মুক্ত করায়, নব্বুই জনের সৃষ্টিশক্তিকে বিকাশ করায়। এরই মানে সাহিত্যেও আত্মপ্রকাশের সুযোগ। আর এই হল সৃষ্টির স্বাধীনতার মূল অর্থ—দশজনের দৌরাত্ম্য থেকে সকলকার সৃষ্টিশক্তির মুক্তিলাভ।

তা হলে কি কলম ছেড়ে নেবেন সাহিত্যিক কোদাল, কিংবা কাস্তে আর হাতুড়ি? নিলে খুব অন্যায় করবেন না—অন্তত পক্ষে যা সৃষ্টির কাজ তাই করবেন। সে হিসাবে হয়ত কলম দিয়ে নিজের মনকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখার থেকে বেশি সার্থক হবে কোদালি দিয়ে সাহিত্যের জমি গড়ার কাজ। কিন্তু তার চেয়েও দরকারী কাজ আছে কলমদারেরও। সৃষ্টির নিয়মে তার স্থানটা গৌণ নয়। সেইটাও বোঝা দরকার। আর সৃষ্টির সেই দাবি বুঝলে তার কলমও ছুটতে পারবে মুক্ত। মানুষের শিল্প-সাহিত্য অনেকাংশেই তো তার মনের ফসল। সে মন যে আবার সমাজের স্পর্শে গড়ে উঠছে, তা আর বারবার বলে কি লাভ? এই মন যে জীবজন্তুর চেতনার মত একটা অপরিণত

অপরিস্ফুট জিনিস নয়, তাও বলার দরকার আছে কি? আর এই মন যে সভ্যতার স্তরে স্তরে, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে আর বিজয়ে, দিনে দিনে বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে, তাও কি আমরা জানি না? জীবের প্রাণাবেগ আমার মধ্যেও আছে, ছিল তা আদিম মানুষের মধ্যেও, আর আছে জীবজন্তুর মধ্যেও। কিন্তু তাতেও কি তফাৎ ঘটেনি? রূপে আর বলে আর ভঙ্গিতে তাও তো বিভিন্ন ধরণের হয়েছে। জীব তারই তাড়নায় এখনো বাঁচে মরে। কিন্তু আদিম মানুষ পর্যন্ত তারি তাগিদে নিজের জীবনকে আয়ত্ত করত, জীবিকার উপায় জয় করে নিত। তাতেই আবার মানুষের মন-বুদ্ধি-প্রাণ পায় একটু নূতনত্ব। আবেগ-অনুভূতি নাচে-গানে-শিল্পে রূপ নিয়ে তাকে জোগাল প্রেরণা, উৎসব জোগাল উৎপাদন শক্তি, আর উৎপাদনের প্রয়োজনে উৎসবও নতুন হয়ে উঠ্‌ল। পূর্বের সেই জৈবীগ্রন্থিরস মানুষের দেহক্রিয়ায় শেষ না হয়ে মানুষের মনকে সরস করে তুল্‌ল, সক্রিয় করে তুল্‌ল—আর তাই হ'ল প্রথমকার শিল্প, দেহ-মন জুড়ে রসের প্রথম প্রকাশ। তাতেই আবার আয়ত্ত হ'ল জীবনযাত্রার নতুন উপায়। এইভাবে মনের রস-ভাণ্ডার জীবের বাস্তব প্রয়োজন বুঝে জীবনের রসরূপ রচনা করল। সে সৃষ্টিতেই বাস্তব জীবন আপনার ভাবী আভাস দেখল, মানুষ দেখল তার মুখচ্ছবি। আর বাস্তব ক্ষেত্রে সেই রস-রূপের আভাসে গড়ে উঠ্‌ল নূতন উদ্যোগ, নূতন উৎপাদন। সৃষ্টির উদ্যোগ এমনি চলেছে—বাস্তব আর মানসক্রিয়ার সংযোগ রেখে, সংযুক্ত হয়ে। সৃষ্টির সেই বাস্তব প্রকাশের সহিত সংযুক্ত হয়ে ওঠে আবেগ অনুভূতির এক এক বিশেষ প্রকাশ—তাই সাহিত্য। এ যোগ হারালে সাহিত্য হয় রক্তহীন। আর বাস্তবক্ষেত্রেও সাহিত্যের দান হারালে কর্মী

খোয়ায় তার রস-প্রেরণা, খোয়ায় তার জীবনের পূর্ণ আস্বাদ, খোয়ায় তার রূপ-কল্পনা। সৃষ্টির দুই মহলে—বাস্তব-সৃষ্টিতে আর শিল্প-সৃষ্টিতে,—এমনি চলেছে সমান তালে দেওয়া-নেওয়া।

মানুষের ইতিহাসে এত বড় কাজ শিল্পীর ও সাহিত্যিকের। তাঁরা সৃষ্টি করেন; আর শুধু সৃষ্টিই করেন না, মানুষকে আবার সৃষ্টিমুখী করেন, মানুষের সাম্‌নে ধরেন জীবনের নবায়মান রূপ—আর তাই বাস্তব হয়ে ওঠে সত্য। তার সত্য হবার পথে শিল্পীরা জোগান প্রথম দান। এ দান জোগানো মানে প্রচার নয়, তা বলাই বাহুল্য। এ দান জোগান শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকলার মারফৎ, সাহিত্যিক তাঁর ভাষার মারফৎ। এ দান জোগান সাহিত্যিক কবিতায় রসানুভূতি প্রকাশ করে আর সমাজের রসানুভূতিকে উজ্জীবিত করে। এ দান জোগান তাঁরা কথা-শিল্পে সমাজের চিত্রশালা খুলে দিয়ে; আর সেই রসচিত্রের মধ্য দিয়ে বাস্তব-সৃষ্টির ইঙ্গিত অন্তর্নিহিত রেখে। এ দান জোগান তাঁরাই আরও শত শত রচনা-রূপে—গল্পে, প্রবন্ধে, নাট্যে,—হাসির সংগে মিশিয়ে, কান্নার সংগে মিশিয়ে, সমস্ত রসের জোগান দিয়ে। আবার নানা টেক্‌নিকের রচনা-রীতির উদ্ভাবনে, সংমিশ্রণে। এ দান জোগাতে হলেই তাঁদের যোগ থাকা চাই জীবনের সংগে; সৃষ্টির বাস্তব অধিকারীদের সংগে, জীবনযাত্রায় যারা উৎপাদনের অধিকারী, বাস্তব-ক্ষেত্রে যারা স্রষ্টা—তাদের সংগে, নব্বুই জনের সংগে। তা না থাক্‌লেই তাদের সাহিত্য-কর্ম, কবি-কর্ম আর সৃষ্টিধর্মী থাকে না। তা তখনো তৃপ্ত করতে পারে সেই দু' দশজনকে, তার টেক্‌নিক তখনো দু' একজনে তারিফ কর্‌তে পারে, কিন্তু তাতে নতুন সৃষ্টির পথ খুলে যাবে না। বাস্তবক্ষেত্রের স্রষ্টাদের সহিত তাই চলা

দরকার সাহিত্য-স্রষ্টার—সাহিত্যেরই প্রয়োজনে। এটাই হল 'সৃষ্টির স্বাধীনতার' দ্বিতীয় অংগীকার বা 'করোলারি'।

সৃষ্টির এই মূল দাবি স্বীকারেই সম্ভব হয় সাহিত্য-সৃষ্টি। সৃষ্টির যে শক্তি জীবনে মুক্ত হওয়া দরকার সে শক্তিকে মুক্ত করতে সাহায্য করা—এই হ'ল সাহিত্যের কাজ। এ কাজ সাহিত্য করে কাস্তে আর হাতুড়ি দিয়ে নয়—কলম দিয়েই। আর বাস্তবের সেই সৃষ্টিশক্তির সংগে যত নিবিড় হবে তার পরিচয় ততই সত্য হয় সাহিত্যিকের সৃষ্টিও। মানে হাতুড়ির আর কাস্তের সংগে যত হবে কলমের যোগ ততই কলম আপনাকেও সার্থক করতে পারবে। কিন্তু কাজ তাকে কলম দিয়েই করতে হবে—হাতুড়ি দিয়েও নয়, কাস্তে দিয়েও নয়। এই হল 'সাহিত্যের স্বরাজের' মূল কথা—মনের সৃষ্টিশক্তিকে ভাষায় প্রকাশ করা—objectification.

সাহিত্যের সৃষ্টি ভাষা দিয়ে হয়। সাহিত্যের বাহন হল ভাষা। কিন্তু ভাষায় যা কিছু বলা হয় তা সাহিত্য নয়। প্রত্যেক শব্দের পিছনে থাকে অর্থ, থাকে ভাব, থাকে এমন কি লক্ষণ আর ব্যঞ্জনা।

এই সব শক্তি নিয়ে সাহিত্যিক সৃষ্টি করতে বসেন। সাহিত্যের সৃষ্টি হচ্ছে এই প্রকাশ। মানে, বিকাশও। যা ভাষায় প্রকাশিত হল তা'ই সৃষ্টিরূপে বিকশিত হল। বিকাশ তা হলে প্রকাশ-সাপেক্ষ। সাহিত্য হচ্ছে তাই প্রকাশ-ধর্মী। আর, এই প্রকাশেরও তাই রীতি আছে, নিয়ম আছে। সে নিয়ম অবশ্য অনড়-অচল নয়। সৃষ্টির নতুন যেমন মাল-মশলা জোটে, নতুন উপাদান যেমন হাতে আসে, তেমনি প্রকাশের পুরনো রীতির রূপান্তর হয়। নতুন রীতির আবিষ্কার হয়—প্রকাশ-রীতির সীমানা বিস্তৃত হয়—

মহাকাব্য ছাড়িয়ে আমরা এসে গেছি গীতিকাব্যের যুগে, এসে গেছি গদ্যকাব্যের যুগে—যখন সেই পুরনো গদ্যকাব্য আবার নতুন করে জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু আসল লক্ষ্য হল এই—প্রকাশ। সেই প্রকাশেরও নিয়ম তবু আছে, আর সেই নিয়ম মেনেই সাহিত্যিক ভাষার রাজা হন, সৃষ্টিতে সার্থক হন। আবার অমনি নিয়মকে মেনেই সাহিত্যিক নিয়ম-ভাঙা পথে নতুন সৃষ্টিও সৃষ্টি করেন, প্রকাশের রীতিকে করে তোলেন বিচিত্র আর বিস্তীর্ণ। মোটকথা—প্রকাশের দাবিই হল সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম কথা। আর 'সাহিত্যের স্বরাজ' মানে হল এই প্রকাশের রাজদণ্ড চালনা। অবশ্য এই সাহিত্যে প্রকাশ অর্থ হচ্ছে ভাষায় প্রকাশ—মানে, অর্থ, ভাব, ধ্বনি—এদের নতুন নতুন সন্ধি আর সমন্বয়। কখনো তাতে প্রাধান্য পায় কল্পনা আর সঙ্গীত, যেমন কাব্যে; কখনো প্রাধান্য পায় কথাবস্তু বা জীবনচিত্র—যেমন গল্পে, উপন্যাসে। এদেরই নানা জাতি-উপজাতি দেখা দেয়—শব্দের অর্থ, ভাব, ধ্বনির নানা সূক্ষ্ম আদান-প্রদানের দরকার হয়। তাতেই তাদের প্রকাশ হয় সম্ভব, আর প্রকাশ সার্থক হয়। এইজন্য দরকার হয় চেনা—একেবারে সম্পূর্ণ করে চেনা ভাবকে, অর্থাৎ চেনা বিষয়-বস্তুকে আর ভাব-বস্তুকে; চেনা আর তাদের একেবারে কবলিত করে নেওয়া, পাওয়া ভাব-রূপ। মানে, ভাববস্তু ও বিষয়বস্তু, এই দু'য়ের সুসঙ্গতি আনা, চেনা সেই সুসীম রূপ। তার সঙ্গেই আবার দরকার চেনা সেই ভাবের উপযোগী উপকরণকে, মানে ভাষাকে। একেবারে সম্পূর্ণ করে চেনা, চেনা—এই আঙ্গিক (technique)—মানে, ভাষার অর্থকে আর ভাষার পিছনের লক্ষণ ও ব্যঞ্জনাকে, ইঙ্গিতকে,—কল্পনা আর সঙ্গীতকে। কোনো দিকে পথ

ভুল না করে ঠিক আয়ত্ত করা এই ভাষাকে। একটু অসতর্ক হলেই ভাব ঝাপ্‌সা হয়ে যাবে, ঠিক যে ভাষার কাছে যে ভাব বাগ্‌দত্ত তাকেও আর চেনা যাবে না,—নানা ভাব কোলাহল জুড়ে দেবে। লেখা আর রসরূপ লাভ করবে না, হবে বাজে লেখা! objectivity—এইটিই হল তাই 'সাহিত্যের স্বরাজ্যের' creed, মূল লক্ষ্য রূপ দান। ভাব আর ভাষার প্রকাশ-কলা এই রূপায়ন-রহস্য।

এই প্রকাশ-কলার ব্যাকরণ শিখতে তাই বসে যান সাহিত্য জিজ্ঞাসুরা। কেউ বলেন এই প্রকাশের মূল উপকরণ হল অলংকার। কেউ বলেন তা শব্দালংকার, বক্রোক্তি,—যেমন দেখি জয়েসে, এলিয়টে, ভার্জিনিয়া উল্‌ফে। কেউ বলেন—অর্থালংকার, 'ফর্ম', যেমন দেখি ওসব লেখকে, এজরা পাউণ্ডেও। কেউ বলেন শব্দালংকারই বটে, তবে ধ্বন্যাত্মক—যেমন, গীতধর্মী কবিতা বা Pure Poetry ভ্যালারির মতে; কিংবা চিত্রধর্মী—যেমন রসেটির কবিতা। দু'য়েতেই এক স্নায়ুগত প্রতিধ্বনি বা প্রতিলিপি জাগে—রস জমে। এ দেহাত্মবাদীর সাহিত্য-তত্ত্ব। আর কেউবা বলেন—প্রকাশ-কলা রসেরই উজ্জীবন; তবে রস 'লোকোত্তর', 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর,' 'ভাগবতী,' ইত্যাদি ইত্যাদি,—যা অধ্যাত্মবাদীর মামুলী তত্ত্ব। কথার পরে কথা বাড়ে—কিন্তু প্রকাশ-কলার মূল কথা হল এই যে—তা অখণ্ড, এক unity. সৃষ্টি মানেই একটা অখণ্ড আবির্ভাব। আর প্রকাশও তাই। ওর অর্থ ছিঁড়ে, ধ্বনি বিচার করে আর অনুভূতি বিশ্লেষণ করে ওকে গেঁথে তোলা যায় না। এইখানেই সৃষ্টির রহস্য—ওতে বিষয়বস্তু ও ভাববস্তু, শব্দচিত্র আর ধ্বনির ইঙ্গিত, সব এক একটি বিশেষ প্রয়োজনে একটি অখণ্ড রূপ লাভ করে, তাতে সুষমা ফুটে ওঠে, তা অখণ্ড।

প্রত্যেক রসরূপ তাই অখণ্ড (unity) আর অপূর্ব (unique)—বিশেষ করে কবিতা। উপন্যাসে তবু ভাষা একটু গৌণ—কথাবস্তু আর চরিত্রচিত্রই আসল জিনিস, ভাষা তার বাহন মাত্র। কাব্যে কিন্তু এই শব্দের দৌত্যেই সমস্ত খণ্ডতা অখণ্ডরূপ লাভ করে। তা হলে, সাহিত্য শুধু প্রকাশ নয়—একটি অখণ্ডরূপ সৃষ্টি—একটা অপূর্ব সমন্বয়—শব্দের মারফতে ভাবের ও বস্তুর একাত্মতা লাভ। আর এইটিই প্রকাশ-কলার আসল কথা—শিল্প এক অখণ্ড রূপসৃষ্টি।

আজ আবার শিল্পী সেই অখণ্ড রূপ সৃষ্টি করতে পারছেন না। কারণ, প্রথম তো তাঁর নিজের যা সত্তা তা'ই পড়ছে চাপা—গোলামিতে আর দালালিতে, বাজারের দর-দস্তরের চাপে। তারপরে, আমাদেরও প্রত্যেকের প্রাণমন অমনি বাজারের দর-বাঁধা—আমরা যে যাই শক্তি নিয়ে জন্মি, আমরাও তা ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারি না, তার খোঁজও পাই না—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগের আজ এই হয়েছে দশা। ব্যক্তিই আজ আর নেই—আছে working class type, আছে কেরাণী, আছে মিস্ত্রী। পৃথিবীর নব্বুইজনের উপর মাল টানবার ভার—নইলে সমাজের মালগাড়ী অচল হবে। অতএব মানুষ হওয়া তাদের নিষেধ—আর চাপা পড়ল তাদের অনেক শক্তি, অনেক অনুভূতি। উপবাসী রইল আত্মা। তাদের জন্য রইল জমা—মদ আর উত্তেজনা, crime stories, thriller, boxing, sex ribaldry. আর দশজনেরও সমানে খোলা লাভের দুয়ার—লোভ তাদের সেখানে, তারা ডিভিডেণ্ড কুড়োয়, বাজারের উপরতলায় বসে বাজারকে হাত করবার নেশায় থাকে তারা মশগুল। আর যারা তাতে মাতে না—তারা চায় সময় কাটাবার মতো মৌতাত—যেমন বাজার-ফেরতা

বন্ধুরাও তাদের চায়—চায় thriller, চায় sex, ইত্যাদি। উপবাসী রইল তাদেরও আত্মা। সব দিকেই উপবাসী মানুষ আর উপবাসী তার আত্মা। দাবি তাদের—tinned food ও tinned সাহিত্য। কি করে তা হলে তারা নেবে কবির দান, সাহিত্যিকের মনের ফসল ?—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী—মানুষের ঠাঁই নাই, মুনাফার সোণার ধানে গিয়াছে সে ভরি'। অতএব, সাহিত্য হল Escapist সাহিত্য, ছুধের সাধ ঘোলে মেটানো।

তা হলে আজ যখন চাই 'সৃষ্টির স্বাধীনতা' তখন ভুল চাই না, তবে তা ভুল করে চাই। সে ভুল এই যে, সৃষ্টি শুধু সাহিত্যের বা শিল্পের কাজ নয়; কবিকর্মও কর্ম, অন্য সৃষ্টিকর্মের সগোত্র। বৈজ্ঞানিক আর কর্মীও সৃষ্টি করছেন, আর আজ আসলে সৃষ্টি করছেন যাঁরা নব্ব ইজন তাঁরাই। আর 'স্বাধীনতা' মানেও শুধু 'বিচ্ছিন্নতা' নয়, জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো নয়; কিংবা জীবনে যা-খুশী করবার অধিকারও স্বাধীনতা নয়। 'স্বাধীনতার' মানে প্রায় তাই হয়ে উঠেছে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে। আমরা ভাবতে শিখেছি—ব্যক্তির যা-খুশী করতে পারাই বুঝি স্বাধীনতা, তাতেই বুঝি বিকাশ। আসলে যতই দেখছি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ আজ ব্যক্তির প্রকাশের পথ বন্ধ করছে, যতই আমরা উপবাসী থাকছি, ততই স্বাধীনতার মন-গড়া ধারণা তৈরী করছি,—জীবনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ কল্পনা করছি, ভাব্‌ছি, যা-খুশী করতে পারাই স্বাধীনতা—তা'ই বুঝি Rights of Man. আমাদের এই right‌ও abstract, man‌ও abstracted. এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—concrete living বা জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে এরূপ মন-গড়া জিনিসের আশ্রয়ই নিতে হয়।

সামন্তযুগের গোলামিতে পীড়িত হয়ে রুশো ঠাওরালেন, Man was born free and he is everywhere in chains. আর ধনিকবাদে বিকৃত-ব্যক্তিত্ব মানুষকে দেখে ফ্রয়েড্‌ও বল্‌ছেন—Life is hard to endure.—সভ্যতা মানেই হচ্ছে প্রাণাবেগের উপবাস। স্বাধীনতার এই মিথ্যা ধারণা আমাদের জীবন-বিমুখীনতারই ফল। কিন্তু তা আমাদের পেয়ে বসেছে ফ্রয়েডের কল্যাণে আরও বেশি। তা'তে স্বাধীনতার যা স্বরূপ তা'ই আমাদের ভুলিয়ে দিচ্ছে। আর ফলে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই—ডি. এচ্‌. লরেন্‌সের যেমন অনেকটা মত—প্রকৃতির পুতুল হও। কিংবা টি. ই. লরেন্‌সের যেমন দৃষ্টান্ত—পালাও আরব সমাজে যেখানে মানুষের হৃদয়াবেগ ও জীবনযাত্রা এখনো তার প্রাথমিক রূপ একেবারে হারায় নি।—মানুষের সভ্যতার আজকের বিকৃত রূপ ও আজকের বিকৃত মানে থেকেই স্বাধীনতারও এমনিতর বিকৃত থিওরি আজ গড়ে উঠ্‌ছে! অথচ ইতিহাস বলবে—মানুষ স্বাধীন ছিল না, স্বাধীন হচ্ছে। জীবজন্তু স্বাধীন নাকি? 'জঙ্গলে আইনে' স্বাধীনতা কোথায়? সর্বত্র ভয়, সর্বত্র বিভীষিকা, ক্ষুধার তাড়নায় ছুটে ফিরতে হয়, প্রাণের মমতায় পালাতে হয়—প্রকৃতির নিয়মের নিগড়ে জীবজন্তু বাঁধা। সেই নিয়ম থেকে মানুষই একটু একটু করে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে।. সে আপনার জীবিকা-বস্তু আপনি উৎপাদন করতে পারে—জীবন তাই তার হল একটু আয়ত্ত, হল সে একটু আত্মবশ।—সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে পারে, আর ব্যবস্থার দ্বারা তার অবস্থাকেও আবার নতুন করে নিতে পারে, এই তার কারণ। তাই সে আগুন আবিষ্কার করল, হাতিয়ার গড়ল, যন্ত্র গড়ল, প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করল; আর তাতেই নিজেই হল নিয়মের

রাজ্য। নিয়মকে উড়িয়ে দিলে না, নিয়মকে অধিকার করে নিলে জলবায়ু সবই সে মেনে নিলে, বুঝলে তার প্রয়োজন, তার দাবি তাতেই পেল সে শক্তি, পেল মুক্তি। জলকে বেঁধে সে চালায় কল, বায়ুকে ধরে নিয়ে সে বাড়ায় আয়ু, বিদ্যুৎকে নিয়ে সে হল বজ্রধারী। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা, আর ব্যবস্থার দ্বারা সেই অবস্থার পরিবর্তন করা—এই হল তার স্বাধীনতার মূল কথা। স্বাধীনতা মানে মাথা নীচে দিয়ে আর পা উপরে দিয়ে হাঁটা নয়—তেমন যা-খুশী তা করবার "স্বাধীনতা" মানুষের নেই।

জীবিকার দাবিকে বুঝে জীবনযাত্রা গড়া, তা'ই হল স্বাধীনতা। সাহিত্যের স্বরাজ মানে—প্রকাশের দাবিকে সাহিত্যে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করা—যে প্রকাশ অখণ্ড আর অপূর্ব। আর সৃষ্টির স্বাধীনতাও দেখেছি—বাস্তবের সৃষ্টিশক্তির সংগে রসস্রষ্টার নিবিড় সংযোগ রক্ষা। তার মানে, জীবন ও জীবন-সত্যের কাছে সাহিত্যের আত্মসমর্পণ—হাতুড়ি আর কাস্তের সংগে মিলন কলমের—তাতেই কলমের মুক্তি। আর রূপদান মানে—সেই জীবন-সত্যকে প্রকাশ, এক অখণ্ড উপলব্ধির প্রকাশ, বাস্তবের সত্যিকার রূপান্তর। এতেই কলমের সার্থকতা, তা'ই তা'র স্বরাজ্য।

শেষ কথাটি এবার আর একবার বলি—প্রকাশ মানে প্রচার নয়। সৃষ্টি প্রকাশই চায় সাহিত্যিকের কাছে, প্রচার চায় অ-লেখকের কাছে। মাভৈঃ, আমাদের গোলাম-রাজের দেশের সাহিত্যিকরা,—প্রচার আপনাদের করতে হবে না। সে দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা তা পালন করবেন। তাঁরা লড়াই করবেন কলম নিয়ে, কালি নিয়ে। তাঁদের কথা যেমন লোকে পড়ে তেমনি আবার বিরূপ হয়। কারণ প্রচারের রূপ নেই—

আছে বড় জোর বক্রোক্তি। কিন্তু সাহিত্য রূপ দেয়—তাই তাতে বিরূপ হওয়া শক্ত। সে সম্মতি আদায় করে নেয় বাক্যের স্বচ্ছতা দিয়ে, সে স্বীকৃতি আদায় করে নেয় অনুভূতিকে আঘাত ক'রে। তা হ'লে বল্‌ব, এ যুগের সাহিত্যের কাজ হ'ল এই—সৃষ্টি-প্রেরণা যখন জীবনে পথ খুঁজে পাচ্ছে না—গদ্যের কোদালি চালিয়ে গড়তে হবে সেই পতিত জমি সৃষ্টির জন্য; কাব্যের কলম চালিয়ে ফলাতে হবে তাতে সৃষ্টির সোনার ফসল—সৃষ্টি করতে হবে, মানতে হবে সৃষ্টির দায়িত্ব; চাকরের সাহিত্য হবে মানবের সাহিত্য;—আর সৃষ্টির স্বাধীনতা জয়ী হবে জীবনযাত্রায়, জয়ী হবে সাহিত্য-কর্মে, জয়ী হবে জীবনে—এই প্রথম।

১৯৩৪

কয়েদীর আকাশ

আমাদের ছোট আঙিনার দুয়ার বিকালে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য খোলা থাকে। আমরা সাম্‌নেকার বড় আঙিনায় একটু হাওয়া খেতে বেরোই—যে হাওয়া আসে গুটি তিন চার পাঁচিল টপ্‌কিয়ে, একটা দোতালা হাঁসপাতালের রোগীদের নিঃশ্বাস দান ক'রে ও নিঃশ্বাস বহন ক'রে; আর একটা লম্বা দোতালা মহলের কয়েদখানার ফাঁকে গলে, পাশ কাটিয়ে, গরাদের মধ্য দিয়ে। কিন্তু হাওয়া তবুও আসে। আর আমাদের বড় আঙিনাটা নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস নয়। ওর মধ্যখানে আছে একটি পুকুর। তার জল ময়লা, কিন্তু পুকুরটি খুব ছোট নয়, মাঝারি গোছের। তার চারপাশে পথ, খানিকটা করে বসবার ও বেড়াবার জায়গা, আর একটু দূরে চার কোণে আছে চারটি অশ্বত্থ গাছ। আগে গাছের গোড়াগুলো বাঁধানো ছিল, বসা চলত; কিন্তু এখন তার বাঁধানো তলা বাঁধানো স্তূপে পরিণত হয়েছে। আগে স্তূপমূলে বসতাম, এখন আমরা স্তূপ প্রদক্ষিণ করতে পারি, কিন্তু এখন আর গাছতলায় বসতে পারি না। দু'ঘণ্টার মতো এই আঙিনার তিন পার আমাদের অধিকারে আছে—ইচ্ছা হয় আমরা বেড়াই, ইচ্ছা হয় খেলি, ইচ্ছা হয় আঙিনার কোথাও বসি। শেষের ইচ্ছাটাই আমার বেশি হয়—সুস্থ দেহকে ব্যস্ত করার প্রয়োজন আমি দেখি না, আর অসুস্থ দেহ হলে তাকে ব্যস্ত করাইতো নিষিদ্ধ। অবশ্য কেউ কেউ উল্টা মত পোষণ করেন। তিন পারের সরু পথে পরস্পরে ঠোকাঠুকি খেয়ে, এবং ঠোকাঠুকি না খাবার কসরৎ করতে করতে তাঁরা উর্ধ্বশ্বাসে ছোটেন—সুস্থ দেহকে তাঁরা রাখ্‌তে চান সচল, অসুস্থ দেহকে তাঁরা করতে চান সবল। আবার

কেউ কমাতে চান চর্বি, কেউ কমাতে চান অম্বল। তবু আমারও সঙ্গী জুটে যায়, আর না জুটলে পরেও বাইরের সময়টা বেশ কাটে। উপরের আকাশের অনেকটা দেখা যায় ওখান থেকে। অনুমান করা যায় কোন খানটায় গঙ্গার ওপারে মিলের পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পিছনকার পূর্ব আকাশ থেকে একটু একটু করে যখন সূর্যের অস্ত আভা সরে-সরে মাথার উপরে আসে, সামনে এগিয়ে যায়, একে-একে নানা রঙ্ দেখা দেয়, একটু একটু করে রঙ্ হয়ে আসে ম্লান—তখন হঠাৎ শুনি 'টাইম্'স্ আপ'। হয়ে গেল, এবার আমাদের ব্যারাকে বন্ধ হওয়ার সময়। কেউ খেলা ছেড়ে, কেউ ধূলা ঝেড়ে, কেউ ভ্রমণ শেষ করে ঘরে ফেরেন।

এই দু'ঘণ্টার জন্য সারাদিন আমরা বন্ধ দুয়ারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি। এই সময়টা যেন চব্বিশ-ঘণ্টার মতো ধরাবাঁধা নয়। মান্‌তে হবে, এ সময়টা আমার চোখেও একটু স্বতন্ত্র। পুকুরের জল, পাড়ের ঘাস, উপরকার খানিকটা খোলা আকাশ, আর সর্বোপরি চারিদিকে একটু ফাঁকা—দেয়াল অবশ্য আছে, আর তা-ও এক-আধটা নয়। তা ছাড়া চারিদিকেই উঁচু কয়েকখানার উঁচু বাড়ি-ঘরও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তবু এই প্রাঙ্গণের হাত কয়েক দূরে তো সে-সব। খানিকটা ফাঁকা তাই এরই মধ্যে,—দেয়াল ও বাড়ি-ঘরের মধ্যেই—ঘেঁষাঘেঁষি করে একটু স্থান করে নিয়েছে। এই ফাঁকা আঙিনাটুকু বড় কিছু নয়, কিন্তু অনেকখানে অনেকদিন তাও মিলবে না। মেলে না, সত্যই মেলে না। অবশ্য তার জন্য আমাদের কেঁদে ভাসাতে হয় না, কেউ দীর্ঘশ্বাসও ফেলে না। কিন্তু হঠাৎ যখন ঘরের বাইরে পা ফেলা যায়—যেমন ভবানীপুর থানায় যখন কলে জলপান করবার জন্য আমি যেতাম বাইরে—তখন মন চম্‌কে উঠত। হঠাৎ থানার উপরের সেই একফালি

আকাশ মনে হত পরম আত্মীয়। আর সামনেকার হাত কয় খোলা জায়গা—চারপাইতে যেখানে সিপাইরা বসে আড্ডা জমাচ্ছে, কিম্বা ধূলার উপরে যেখানে করছে কুস্তি, অথবা সকাল বেলা যেখানে তারা বসে দাঁতন করছে, সাম্‌নে রয়েছে সুমার্জিত লোটা, কানে রয়েছে তৈলমলিন পবিত্র যজ্ঞসূত্র,—নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্ত তারা, পৃথিবীতে কোনো তাদের তাড়া নেই, কোনো তাদের অস্বস্তি নেই—ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি বসে একমাত্র দাঁতন কাঠিটাকে ঘষে নিঃশেষ করাই তাদের দায়িত্ব—যখন সেই আঙিনাটুকুর, মধ্যে আমি এসে দাঁড়াতাম কল থেকে আঁজলা করে জল পান করবার জন্য, দেখতাম উপরের আকাশ আর কয় হাত সেই ফাঁক জায়গাটুকু, তখন আমার বুক থেকে বেরোত এক অপূর্ব প্রার্থনা—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে। আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম—ওই আকাশে আর আঙিনায়! সেই ফাঁকা যায়গাটা আছে তা আমি জানি; আকাশ উপরে রয়েছে তা-ও আমি জানি; আর তার জন্য এমন নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করবারই বা কি আছে? পৃথিবীর সমস্তটাই দেয়াল, সব হাজতখানা—'সেলের' ভিতরে বসেও এমন ভুল আমার হত না। আর আকাশও জানি কেউ কেটে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে নিতে পারবে না। পৃথিবী নিক্, সমুদ্র নিক্, কিন্তু আকাশ পারবে না কেউ দেয়াল তুলে নিজের বলে ঘিরে নিতে,—এও আমি জানি। তবু আমি ওই থানার ফাঁকে দেখা ছোট্ট আকাশ চোখ ভরে পান করতাম, ওখানকার ছোট্ট ফাঁকা আঙিনাটুকু বুক ভরে গ্রহণ করতাম। আর আমার মনে একটা নতুন হাওয়া লাগত। তাতে এই কথাই যেন জেগে উঠ্‌ত—কোন চেতনাপারের সুপ্তস্মৃতির মত—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে। আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম—এই আকাশে আর আঙিনায়!

কলের জল পান করবার অজুহাতে আমি দিনে দু-তিনবার করে মিছিমিছি বেরিয়ে আসতাম। সব সময় দাবিটা তখন-তখন পূরণ হ'ত না। দেরী করতে হ'ত—কখনো সিপাইর মর্জি হত না; কখনো বা আমার সঙ্গে যে পাহারা থাক্‌বে, সে উঠি উঠি করেও দোস্তদের গল্পটা শেষ পর্যন্ত না শুনে উঠে আসতে পারত না। তবু তিন চারবার করে আমি জলপান করতাম। তখন বৈশাখের দিন, বন্ধ ঘরে আমি দমে সিদ্ধ হতাম। সত্য; তবু অত বার জল না খেলেও চলে,—ওই আকাশ আর ফাঁকা আঙিনাটুকু না হলেও যেমন দিন কাটত,—কিন্তু তবু ওই আকাশ আর আঙিনায় ছিল আমার বড় লোভ। একটুখানি আকাশ আর খানিকটা ফাঁকা আঙিনা, আর তারই মাঝখানে এক-একবার দাঁড়াতে পেয়ে আমার প্রাণ ভরে উঠ্‌ত, মনে হত—এইত আমি আত্মীয়ের মুখ দেখ্‌তে পেলাম!

ভবানীপুর থানা তেমন ভয়ানক জায়গা নয়। বরং থানা-জগতে তা শুনেছি ভালোই। খারাপ তাকে বলা ঠিক হবে না। চমৎকার সুন্দর ইমারত। তার ভেতরে ছিল সেপাই ও দারোগা আর প্রচুর মশা ও ছারপোকা। ওরা কেউ আমাকে পেয়ে খুশী হয় নি। তাতেই বোধ হয় কীটজগতের ও কোতোয়ালজগতের আমার উপর অশ্রদ্ধা বেড়ে গেছল। আমাকে ওরা দেখলে নীরস। ওর দারোগা-সেপাই আমাকে জান্‌লে আমি ওদের দায় মাত্র,—'এস্. বি'র আসামী। ছারপোকারা বুঝলে—আমি ওদের ঠকিয়েছি, তবু আমাকে নিয়ে ওদের বাঁচতে হবে। পাহারাদারেরা হুঁসিয়ার হল—আমাকে আগলে তাদের রাখতেই হবে, দিনে 'এস. বি'র জন্য আর রাতে ছারপোকার জন্য।

আমি ছিলাম ঐ দুই দলের উপজীব্য। আর তখন বৈশাখ মাস। বন্ধ হাজতের দেয়াল উত্তপ্ত হয়ে উঠ্ছে। বদ্ধ ঘর হয়ে উঠ্ছে উনুনের মত। গরমে আর মশায় ছারপোকায় রাত কাটত। বাইরে বাসের ডাক শুন্তে পেতাম ভোর চারটা থেকে। শুন্তে শুন্তে মন পাল্লা দিত—'শ্যামবাজার, বাগবাজার, হাওড়া'। ট্রামের ঘর্ঘর শোনা যেত। তারপর বেলা বাড়ত। গ্রীষ্মের সকাল বেলাকার রোদ বেড়ে উঠ্ত, রসারোডের ট্রাফিকের যৌবন উদ্দাম হয়ে উঠ্ত। আফিস-মুখো ট্রাফিক গর্জে উঠ্ছে, ফুলে উঠ্ছে, লাফিয়ে উঠ্ছে—আপনার উচ্ছ্বাসে আপনি যেন ফেটে পড়ছে,—হাজতের ছোট্ট ঘর থেকে আমি তা বুঝতে পারতাম। শুন্তে পেতাম জীবনের স্রোতধ্বনি। সেই স্রোত থেকে আমি তখন একটু দূরে এসে ঠেকেছি ; তাই যেন বুঝছি কত বড় প্রকাণ্ড তা। কত প্রচণ্ড আর কত খরধার। দূরে না হলে এই স্রোতে রোজকার মত আমিও ভেসে যেতাম, একে এমন করে বুঝতে পারতাম না। আবার, শুধু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেও হয়ত আমি ঐ স্রোতের ঠিক রূপ অনুভব করতে পারতাম না। তার জন্য ট্রাফিকের কলরোলও শুন্তে পাওয়া দরকার। আমি তা পেতাম—এইটাই ভবানীপুর থানার ছিল সব চেয়ে বড় দান।

সে দান যে কত মূল্যবান্ তা বোঝানো সহজ নয়। বাস হাঁকৃছে—'শ্যামবাজার, বাগবাজার, হাওড়া, ডালহৌসি-ডালহৌসি'—এক-একটা দৃশ্য যেন সঙ্গে সঙ্গে চোখের সাম্‌নে খুলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কলকাতার গাইড্ বুক নিয়ে বসেছি—যা কলকাতার থেকে কম সুন্দর নয়। কারণ কলকাতায় আমি ডুবে থাকি রাতদিন। আমার চেতনার উপরে সে ভেঙে পড়ছে। আমার চেতনা তারই প্রায় একটা খণ্ড। 'প্রায়'—সম্পূর্ণরূপে তা নয়, তাও সত্য। কিন্তু অদূরে হাঁক শুন্‌ছি

যখন 'শ্যামবাজার, বাগবাজার' আর 'ডালহৌসি, ডালহৌসি' তখন আমার চেতনা কলকাতাকে তৈরী করবার অবসর পেয়ে গেল। কলকাতা তখন তাকে গড়ে তুল্‌ল না, আমার মনই কলকাতাকে গড়ে তুল্‌তে লাগল। গড়তে থাক্‌ল নতুন করে, নিজের খুশী মত, মনের মতন করে। যে মন অনেকাংশে কলকাতারই গড়া, তা'ই আবার গড়ে চল্‌ল অনেকাংশে কলকাতাকে। থানায় ছাড়া এ সম্ভবহত না—আর ভবানীপুর থানায় ছাড়া এ কাজের উপাদান সর্বত্র মিল্‌ত না। হাজত বাসে না হলে এমন সুযোগ পাওয়া যেত না।—অমন ভবানীপুর থানার সেই ছোট্ট আঙিনায় বেরোতে পারলেও তবু মনে হ'ত—ভগবান্, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে। আমি আত্মীয়ের মুখ দেখলাম! একটুখানি আঙিনা আর একটুখানি আকাশ, দিনে ওইটুকু দেখ্‌তে পারলেই মনে হ'ত আমি আছি, পৃথিবী এখনো রয়েছে। অথচ এতটুকু আঙিনা আর এতটুকু আকাশ :— আমার মনের তো সাম্‌নে ছিল সমস্ত কলকাতা আর সমস্ত পৃথিবী। এতটুকু আঙিনা আর এতটুকু আকাশ—তাও আবার থানার আব্‌হাওয়া-ঘেরা আঙিনা আর আকাশ,—তার দিকে আমিই কি ফিরে তাকাতাম কোনোদিন? সত্যিকারের আঙিনাও নয়, সত্যিকারের আকাশও এই আব্‌হাওয়ায় নেই—তা কে না জানে? এখানে আকাশ আর আঙিনা দুইই কেউ প্রত্যাশা করে না, কেউ স্বপ্নেও ভাবে না। এখানে প্রাচীর ও অন্ধকারই জয়ী, আমিও তাই জানি। আর তা মেনে নিতেও আমার বিশেষ প্রয়াস পেতে হয় নি। আমার মনের সাম্‌নে ছিল কলকাতা, পৃথিবী আর নিখিল বিশ্বের পারাবার। তবু হঠাৎ যখন কলের জলপানের জন্য বাইরে এসে দাঁড়াতাম মনে হতো—এ কি বিস্ময়! সেখানটায় দেয়াল গায়ের উপরে এসে হুড়মুড়

করে পড়ে নি—একটুমাত্র সরে দাঁড়িয়েছে হাত কয় দূরে; আর মাথার উপরে দেখা দিয়েছে খানিকটা আকাশ—চারদিককার বাড়িঘরের শাসন এড়িয়ে যতটুকু দেখা যাওয়া সম্ভব ;—আর অমনি মনে হয়েছে—আশ্চর্য, আশ্চর্য এই পৃথিবী !

শুধু 'মনে হয়েছে' বললে সবটুকু বলা হয় না। ও জিনিসটা মন দিয়ে বুঝবার দরকার হয় না। ও দেহ দিয়ে, সর্ব অঙ্গ দিয়ে অনুভব করা যায়। প্রত্যেক রোমকূপের মধ্য দিয়ে যেন ওর অস্তিত্ব দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। এ দেখা—চোখ দিয়ে দেখতে হয় না ; বাতাস নেবার জন্য নাকে নিঃশ্বাস টানবার দরকার নেই। বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ আপনার থেকেই বিস্ফারিত হয়ে পড়ে, আর নাক বাতাসের খোঁজ পেয়ে আপনা থেকে নিঃশ্বাস নেয়,—শ্বাসযন্ত্রকে একেবারে বায়ুস্রোতে ভরে নিতে চায়, কার্বোন-ডাইওক্সাইড ছেড়ে সঞ্চয় করে নেয় অক্সিজেন। কিন্তু চোখ ও নাক এ সব স্বতঃপ্রণোদিত কাজ না করলেও দেহ তার আবেষ্টন সংবন্ধে এক মুহূর্তেই সচেতন হয়। প্রত্যেক রোমকূপ দিয়ে আমরা অনুভব করি বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত আঙিনা ও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত আকাশ। বহু বহু জন্ম পূর্বে আমার যে বেদনা-বোধ ছিল এখনো আমি একেবারে তা হারাই নি। তখন আমার চক্ষুর কোষগুলি এতটা নিপুণ, এতটা বিশিষ্ট, specialised, হয়ে উঠে নি। তখন সমস্ত দেহকোষের মধ্য দিয়ে আমি গ্রহণ করতাম আলো আর উত্তাপ। বল্‌তে গেলে, সেদিন সূর্য দেখতাম আমি সারা অঙ্গ দিয়ে। সেদিনকার দেখা এমন তীব্র নয়, এক কেন্দ্রে সংহত এই বেদনা নয়। তা একটা মাত্র ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ারূপে স্বতন্ত্র, differentiated, হয়ে

উঠে নি। তা ছিল undifferentiated—সারা দেহে পরিব্যাপ্ত একটি অনুভূতি। আজও পৃথিবীতে তেমন প্রাণী বেঁচে আছে, কিন্তু আমি আর সমস্ত দেহ দিয়ে দেখ্‌তে পাই না, আমার সে শক্তি এক কোষকেন্দ্রে একত্রিত হয়েছে। আশ্চর্য সে ব্যাপার, এই একটু একটু করে আমার এই চক্ষুদান আমাকে, miracle of miracles! কিন্তু তবু দেখ্‌ছি আমার দেহ এখনো হঠাৎ ফিরে পেতে পারে সেই স্মরণাতীত কালের শক্তি। হঠাৎ যখন আমি একবার একটু মুক্ত আঙিনা ও আকাশ পেয়েছি—খানিকক্ষণ দেয়ালের আর আঁধারের কবলে জীর্ণ হওয়ার পর যেই আমি একটু পেলাম মুক্ত বাতাস ও মুক্ত আকাশ,—অমনি আমার সমস্ত দেহ যেন সেই অতি-আদিম অতি-পুরাতন বেদনা-বোধ ফিরে গেল—আমার সারা শরীর বেয়ে এই আঙিনা ও আকাশ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেল,—স্নায়ুতে স্নায়ুতে, মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, হৃদ্‌পিণ্ডের প্রসার-সঙ্কোচে জাগতে লাগলো তাদের অস্তিত্ব-বোধ। আর এই সমস্ত শারীরিক-মানসিক জটিল প্রক্রিয়ার যদি কোনো নাম দিই, যে একটিমাত্র সহজ কথায় তা প্রকাশ সম্ভব—সে বাণী উচ্চারিত না হতে পারে, হয়ত মনও তা স্পষ্টরূপে গ্রহণ করে না; কিন্তু এই দেহগত অনুভূতির সঙ্গে জাগে তেমনি অতি প্রাচীন, অতি আদিম একটি বোধ—ভাষায় যার নিকটতম প্রতিধ্বনি বহন করে এই অনুচ্চারিত প্রার্থনা—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে! আমি কতদিনকার আত্মীয়ের দেখা পেলাম!

আকাশ আর প্রশস্ততাতে আমরা মুক্তির স্বাদ পাই—যে মুক্তি মানুষের অনাদিকালের কামনা। কেন সে মুক্তি মানুষের মনে কোন্

আত্মীয়ের কথা জাগিয়ে তোলে? ফ্রয়েড্ বল্‌বেন জীবন মানেই বন্ধন— Life is hard to endure! প্রকৃতির বন্ধন আর মানুষের গড়া বন্ধন। এইসব বন্ধন দিবানিশি কেটে কেটে আমাদের অস্থিমজ্জায় বস্‌ছে। আমাদের অস্থি-মজ্জা তাই চায় মুক্তি, চায় সহজ আনন্দ,—যার সামাজিক রূপ ও নাম হবে 'বীভৎস ভোগ'। কিন্তু সে সামাজিক মানুষ, সেই বীভৎসতা থেকেও সে নিজেকে বাঁচাতে চায়। তাই সেজন্য তার আশ্রয় কল্পনা, illusion. এই কঠোর বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সে সৃষ্টি করেছে কাব্য, সৃষ্টি করেছে স্বপ্ন, সৃষ্টি করেছে তার এক কালের সব চেয়ে বড় সৃষ্টি—পরমাত্মা। তাতে তার মুক্তির স্বপ্নও খোরাক পেয়েছে। অথচ জীবনের আধিভৌতিক-আধিদৈবিক নির্যাতন তার নিকট আর নির্যাতন রয় নি; হয়েছে পরীক্ষা, হয়েছে লীলা, হয়েছে রহস্য। জীবনের বন্ধন বড় কঠিন, তাই যেখানেই আমরা ব্যাপ্তি পাই, অবকাশ পাই, সেখানেই আমাদের মনে জাগে বিস্ময় ও বিশালতা—awe and adoration! মোতি মস্‌জিদ দেখে চোখ মুগ্ধ হয়, মনেও একটা রসানুভূতি জাগে, স্নায়ুতে জাগে স্নিগ্ধতা। কিন্তু শাজাহানের জামা মস্‌জিদে দাঁড়িয়ে চোখ আর দিশা পায় না। হঠাৎ জীবনের প্রাচীরগুলির ভিৎ ধসে যায়, একেবারে দিগদিগন্তের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এত বড় ব্যাপ্তি, অবাধ আকাশ,—কোথায় বন্ধন, কোথায় সঙ্কোচ, কোথায় আবেষ্টন? আমি না বিশ্বাস করি মস্‌জিদে, না রাখি তার মালিকের খোঁজ। এক নিমিষে তবু আমারও মনে হয়েছিল,— দুনিয়ার মালিক হমে নস্ত, হমে নস্ত, হমে নস্ত। তুমি এখানে, এখানে, এখানে।—দেওয়ানী খাসে নেই, দেওয়ানী আমে নেই—আছ মুক্ত আকাশে আর মুক্ত আঙিনায়। আর দিন কত অন্ধ ঘরে আবদ্ধ

থাকলে অতদূর যেতে হয় না,—দিল্লী দূরনশ্‌ত. দিল্লী দূরের পথ,—ভবানীপুর থানার ছোট আঙিনায় ও ছোট আকাশের তলে বেরুতে পারলেও তখন দেহ-মন সাড়া দেয়, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরতে যে রেখা পাত হয় তাকে বলি,—ভগবান, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে। আমি আত্মীয়ের মুখ দেখতে পেলাম!

মোটের উপর, আকাশ এবং ব্যাপ্তি,—এসবের সঙ্গে আমাদের মনের একটা আত্মীয়তা থেকে গেছে। সে আত্মীয়তা খুব সহজ, নাড়ীর টান। তাই যতক্ষণ তা অটুট থাকে ততক্ষণ তা আছে বলেই মনে হয় না। তাতে বাধা পড়লেই তখন সমস্ত চৈতন্য টন্ টন্ করে ওঠে। সুস্থতার লক্ষণ এই যে, তা স্বচ্ছন্দ—অচেতন। আমার হৃদ্‌পিণ্ড যত দিন স্বচ্ছন্দ ছিল ততদিন তার খোঁজই পেতাম না, জান্‌তাম না যে ও বালাই আছে। হঠাৎ যখন সে মুস্‌ড়ে গেল, উত্যক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল, তখন সমস্ত দেহমন তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পথ পায় না, নাস্তিত্বের বিভীষিকায় কাতর হল, তার সঙ্কোচ-প্রসার আমার সমস্ত চেতনার উপর তখন দাগ রেখে যেতে লাগ্‌ল। শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের সঙ্গে প্রত্যেকটি অঙ্গের যোগ নিবিড় অথচ অচেতন; সে যোগে বাধা পড়লেই তার দাম আমরা বুঝি। যতক্ষণ আকাশ আমার কাছে সুলভ ছিল ততক্ষণ তার দিকে চোখ তুলে দেখবারও আমার ফুরসুৎ ছিল না। অবশ্য, ব্যক্তিগত ভাবে আমার সম্পর্কে এই কথাটা খাটে না। আকাশ না দেখতে পেলে আমার মনের আকাশও আচ্ছন্ন হয়ে যেত। তবু, যতক্ষণ ইচ্ছা করলেই লাভ করা যেত ফাঁকা, একটু ব্যাপ্তি, সে গড়ের মাঠেই হোক আর হেষ্টিংসের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরেই হোক্, ততক্ষণ আমার কাছে তার দাম স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে পায় নি। তারপর, তিন দিন

যেই আমি হারালাম সেই স্বাস্থ্য—মানে স্বাধীনতা, (স্বাধীনতা আর স্বাস্থ্য একই কথা; যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ওর দিকে নজরই পড়ে না। কিন্তু একবার যেই খোয়া যায় তখন সাধ্য কি মানুষ আর অন্যদিকে দেখে, অন্য কথা ভাবে? পরম অস্বস্তিকর সে অবস্থা। অথচ তখনকার সমস্ত কাজকর্ম হয় অত্যন্ত বেতালা, অস্থির ও অসুস্থ,—আয়র্লণ্ডের যেমন হয়েছিল, আমাদের যেমন হয়েছে)—আমি যেই হারালাম স্বাস্থ্য, আমার জীবন-গতির স্বচ্ছন্দতা, অমনি ভবানীপুর থানার সেই সিপাই-রক্ষিত বদ্ধ আঙিনা আর বাড়ির-বেড়ায় ধরা বদ্ধ আকাশ এই আমার কাছে মনে হল বিধাতার আশীর্বাদ, স্বাস্থ্যের মতো স্বাধীনতার মতো তাঁর অকুণ্ঠ দান। একাদিক্রমে 'প্রবাসী' আফিসে দেড় বছর সেবার কাজ না করলে আমাকে পেয়ে বস্‌ত না নোয়াখালির জন্য সেই nostalgia—সেই নদীর জন্য, ঝাউসারের জন্য, নারিকেল বাগানের জন্য আকুলতা। ভবানীপুর থানায় সে কটা দিন আবদ্ধ হয়ে না কাটালে আমার কাছেও হয়ত অমন পরিষ্কার হত না এই আত্মীয়তা—আকাশের সংগে, আলোর সংগে, সেই নদীর সংগে, মাঠের সংগে, ঝাউসারের সংগে আর নারিকেলের বনের সংগে। ভাবতাম ওটা বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিশ্চিন্দিপুরী' একটা স্মৃতি—যা তাঁর পক্ষেও আট-আনা খাঁটি, বাকী আট-আনা মেকি - আট-আনা অভিজ্ঞতা থেকে উজ্জীবিত, আর আট-আনা নোট্-বই থেকে উদ্ধৃত;—আর আমার পক্ষে ষোল আনাই নকল। কিন্তু ক'দিন দেখলাম না নদী আর মাঠ, তারা আর জলধারা, আর রেলওয়ের কামরায় বসেও আমার মনে হল আমি যেন নতুন করে ডব্লু. এচ্. হাড্‌সনকে পাচ্ছি, তাঁর ভাষায়ই আমার মন কথা কইতে পারে—

The blue sky, the brown soil beneath, the grass, the trees, the animals, the wind, the rain, and stars are never strange to me ; for I am in, and of, and am one, with them ; and my flesh and soil are one, and the heat in my blood and in the sunshine are one, and the winds and the tempests and my passions are one.

'The winds and the tempests and my passions are one.' কত সত্য তা। আর কত সত্য আরও সেই গম্ভীর প্রশান্ত আকাশের নির্বাক ঔদাসীন্য, কঠিন গাম্ভীর্য—এই আত্মীয় আকাশের ক্রুর রহস্য,—হিমালয়ের গাম্ভীর্য আর অটল স্থৈর্য ! কত সত্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ,—জানতাম কি তা যদি বক্‌সায় কাঁটাতারের ঘরে বন্ধ না থাক্‌তে হত—ঝুঁকে-পড়া পাহাড়ের চোখের তলে কোন্ বন্দী শিকারের মত ? পাহাড়ে ঝর্ণার গর্জন না পৌঁছাত কানে ? আর মৃত্যু আর নিস্পন্দ পর্বত আর মৌন অন্ধকারের সংগে সেই পাহাড়ের কোলে মুখামুখি আমার করতে না হত রাতের পর রাত ? বুঝতাম আমি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে—যাঁর মধ্যে ছিল অত সত্য—আর অত মিথ্যাও ?

> Low breathings coming after me,
> Of undistinguishable motion……

আর—

> The sounding cataract
> Haunted me like a passion : the tall rock,
> The mountain, and the deep and gloomy wood,
> Their colours and their forms, were then to me
> An appetite ;

এমন নিকটে আমি প্রকৃতির পৌঁছুতে পারতাম না,—দেখতাম শুধু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বলা প্রকৃতির নীতিবাগীশতা কত মন-গড়া কথা কবির, বুঝতাম না প্রকৃতির সংগে কবির সেই নিগূঢ় আত্মীয়তাও কত সত্য ; আমারও এই আত্মীয়তা কত বাস্তব—যদি অনেক-অনেক দিন আমার কয়েদখানার আড়ালে আবদ্ধ না থাকত—প্রকৃতির সংগে স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক আমার বন্ধ হয়ে না যেত। বোঝে না তা মানুষ—যতক্ষণ এই সম্পর্ক থাকে একান্ত। একান্ত সে, তাই সে তখন প্রকৃতির সংগে একাত্মও। তা বদ্ধ হলে অস্বচ্ছন্দ নিজের সম্পর্কে, প্রকৃ.তর সম্পর্কেও। অপ্রাকৃতিক তার কাছে তখন প্রকৃতিও।

অথচ আকাশ ও ব্যাপ্তি আমরা পাই না, এই বিশালতা থেকে আত্মবঞ্চনা করার চেষ্টাও আমাদের জীবনে অভ্যাসগত হয়ে উঠেছে। অনেকাংশে প্রাণগতও। অনাবৃত আকাশ আর প্রসারিত দিগঙ্গন—এর বিপুলতা থেকে নিজেকে আমাদের বাঁচাতে হয় বাঁচার দায়ে। আমরা বাধ্য হয়ে বন্ধন সৃষ্টি করি ; আড়াল আমাদের মেনে নিতে হয় প্রকৃতিরই আদেশে। আকাশকে আমার মাথার ওপর থেকে বাদ দিতে নিজেকে আমরা নিই ঘিরে। আমরা ঘর বাঁধি, তার ওপরে আচ্ছাদন চাই-ই, আর তার চারদিকে আবেষ্টন না হলেও চলে না। আমাদের দেশের মতো দেশে যেখানে প্রকৃতি মোটেই করালী কালী নন, সেখানেও ঘর চাই-ই, নইলে প্রাণধারণ অসম্ভব। আমাদের দেশের আকাশের মতো আকাশ আর এদেশের শ্যামল প্রশস্ততা, তাও অস্বীকার করতে হয়। আর যেখানে প্রকৃতি সন্ন্যাসিনী কিম্বা ভীমা রুদ্রশক্তি—সেখানে তো প্রকৃতির পরাক্রম থেকে প্রাণ আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টাতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। যাই হোক, আশ্রয় আমাদের চাই—পাতার, খড়ের,

কাঠের, ইঁটের, পাথরের, টিনের, কংক্রিটের, ইস্পাতের, কাচের—যা কিছুর হোক। একটা আবরণ মাথার ওপর না পেলে, একটা বেড়া নিজের চারদিকে না সৃষ্টি করতে পারলে, প্রাণ বাঁচে না। মাথা গুঁজ্‌বার একটা ঠাঁই চাই। একদিন পর্বতের গহ্বরে আমরা নিজেদের স্থান করে নিয়েছি, তবু আকাশের তলায় বাঁচতে পারি নি। তারপর যাযাবরের তাঁবু ছেড়ে আমরা হয়েছি গৃহস্থ। আমাদের সমস্ত সভ্যতা এই আশ্রয়-রচনার ইতিহাস—আকাশকে আড়াল করার ও দিগন্তকে আবৃত করার চেষ্টা। নইলে, আমরা বাঁচতে পারতাম না। এই আমাদের ঘরের ভিত্তি যেদিন গাড়লাম সেদিন থেকেই আমরা পেলাম প্রকৃতির দাক্ষিণ্য—অর্থাৎ সেদিন থেকে প্রকৃতিকে আর একটু হার মানতে হল। আর সেদিন থেকে হারাতে লাগ্‌লাম আকাশের উদারতা আর ভূমার প্রস্থিতি। হারালাম মাথার উপর থেকে, চোখের সম্মুখ থেকে। এবং ঠিক তাই আমাদের মনের ওপরে সেই বিরহ সেদিন থেকে একটু একটু করে জমে উঠ্‌তে লাগল। আমরা যতই গৃহ বাঁধছি ততই মুক্তির বেদনা জমে উঠ্‌ছে। যতই আমাদের আকাশ মুছে ফেলছি কলের ধোঁয়ায় আর পৃথিবীর ধূলাতে, ততই আমরা দেখতে চাই আকাশের মুখ। পৃথিবীর বুক যতই আমরা খণ্ড খণ্ড করে ফেলছি বাড়ি তুলে, প্রাচীর তুলে, ইমারতের আশ্চর্য বোলতার চাক রচনা করে, ততই আমরা খুঁজছি পৃথিবীর নিরাবরণ উদাস-করা ব্যাপ্তি। তাই, উঠ্‌ছে আমাদের স্কাই-স্ক্রেপার—আমাদের আকাশ-চাওয়া গোপন-কামনার সাক্ষী। উড়্‌ছে আমাদের উড়োকল—আমাদের ব্যাপ্তিকামী উদার স্বপ্নের প্রতিমূর্তি। তাই, আমরা পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরোই, গ্লোব-ট্রটার হই, আউটিং ও হাইকিং আমাদের নেশা হয়ে ওঠে। অনেক

আড়াল সৃষ্টি করেছি, আপনাকে অনেক বঞ্চিত করেছি, তবে আমাদের জীবনযাত্রায় জুটেছে এই অপেক্ষাকৃত নির্ভাবনা। অথবা অপেক্ষাকৃত কম দুর্ভাবনা। কারণ, সত্যই কতটুকু আমরা পেয়েছি? পৃথিবী পায়ের তলায় দু'ইঞ্চি ধসে গেলে আমরা বুঝি কত অসহায় আমরা—দু'সেকেণ্ডে আমাদের সমস্ত গর্ব ও সভ্যতা হয়ে যায় ভূমিসাৎ। তবু আমরা খানিকটা অধিকার পেয়েছি। খানিকটা সহনীয় হয়েছে আমাদের ভাগ্য। কিন্তু অনেক হারিয়ে, অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে। অথচ ভিতরে-ভিতরে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্ছি। তাই ওপরে চাপাচ্ছি আরও বাড়ি আরো ইমারৎ, যেন কোথাও আর ফাঁক না থাকে। ঘরের আড়ালে, দেয়ালের আড়ালে আমরা নিজেদের সুরক্ষিত করে নিচ্ছি।

অবশ্য আকাশ ও ব্যাপ্তি, কোনটাই আমরা এখনো অতটা হারাই নি—আমরা, মানে আমাদের দেশে 'আমরা'। এখনো আমরা প্রকৃতিকে অতটা দূরে সরিয়ে দিতে পারি নি—এখনো আমরা প্রকৃতির থেকে অত দূরে সরে যাই নি। এখনো আমাদের কাছে আকাশ নিকটের—অচেনা নয়, ধোঁয়াটে তামাটে আচ্ছাদন নয়, আমরা ইমারতের আড়ালে তাকে আড়াল করে ফেলি নি। আমাদের শহর দু'চারটি, গ্রাম অসংখ্য। আমাদের মাঠ অবারিত; দেশ গাছ লতা পাতায় শ্যামল, আকাশে গিয়ে ঠেকে তার সীমানা। এখনো আমাদের কাছে গঙ্গা-যমুনা প্রাণময়ী, হিমালয় যেন ভারতবর্ষের শিয়রে জাগ্রত কোন্ অতন্দ্র গৃহকর্তা, সমুদ্র যেন আমাদের কাছে এক আশ্বাস ও এক আড়াল।

না, আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে সরে যাই নি। আর তার মানে আবার, আমরা প্রকৃতিকেই পাইনি। এখনো আমরা প্রকৃতিকে

আয়ত্ত করি নি—আর তাই জানিও না প্রকৃতিকে। প্রকৃতিকে আমরা যতই আয়ত্ত করি, ততই আমরা জানি প্রকৃতির মূল্য, আর জানি নিজেদেরও প্রকৃতি। আমরা প্রকৃতির যত কাছে, প্রকৃতির সংবন্ধে আবার ততই আমরা অচেতন ; কারণ, তখন মানুষ আর প্রকৃতি একাত্ম, আমরা আজ প্রকৃতির তত কাছেতো আর নেই-ই—একেবারে অসহায় ভয়ে-বিস্ময়েও আর তাকে দেখি না। সে যুগ পার হয়ে এসেছি আমরাও। সে ছিল মানুষের আদিম একটা যুগ। তখন nature mythই ছিল মানুষের সহজ কল্পনা, হয়ত বেদে পুরাণে তার চিহ্ন রয়েছে। সাঁচির তোরণে জীবচিত্রের সহজ স্ফূরণে রেণে গ্রুসে তারই সন্ধান পেয়েছেন। আমাদের কাছে পশুপাখী বরাবর কথা কয়—মানুষের মত, মানুষের ভাষায়, মানুষের ছাঁচে তারা ঢালা। ইউরোপ সেই 'হিতোপদেশের' বিস্ময়কর কাণ্ড ভুলতে পারে না ; Jungle Book কিন্তু আমাদের কাছে একেবারে সহজ গল্প। তার কারণ আমরা প্রকৃতির থেকে বেশি দূরে সরে যাই নি। তবে প্রকৃতির তত কাছেও আমরা নেই—সেই সহজ ভয়, সহজ বিস্ময় আর আমাদেরও নেই। জীবনে আমরা বনানীর ছায়াও কাটিয়ে উঠেছি। গুহা-গহ্বরের যুগও পার হয়ে এসেছি—প্রকৃতির সেই প্রথম পরিচয় আমাদের কাছে আজ বিস্মৃত না হলেও জীবন্ত নয়। আমরাও প্রকৃতিকে খানিকটা আয়ত্ত করেছি—এসে গেছি কৃষির যুগে। তাই গঙ্গা-যমুনা হয়েছে আমাদের কাছে দেবী—তাদের নিয়ে আর আমরা নতুন গাথা রচনা করি না। মেঘ আর বজ্র এখন আর 'ইন্দ্র' বা 'বৃত্র' হয়ে ওঠে না—দেবতার দান অবশ্য তা থাকেই। তবু আমরাও অনেকটা প্রকৃতির থেকে স্বতন্ত্র হতে পেরেছি—প্রকৃতির রূপ আমাদের চোখে তাই রূপক হয়ে উঠেছে। নেই সেই শিশু মনের

ভয় আর বিস্ময়—awe and adoration. আর ভাবি না সে দেবী, ভাবি না সে দানবী; দেখি না 'সাবিত্রীকে', দেখি না 'সোম'কে। কোথায় সে প্রচণ্ড রুদ্র, কোথায় সে প্রবল পবন? কোথায় বা সে কালী করালী, কোথায় বা সে দয়াময়ী, জননী? না, আমাদের ইতিহাসের সে যুগও চলে গেছে—গঙ্গা-যমুনাও শুধু আমাদের দেবতা হয়ে রয়নি। তার পরেও আমরা আরও এগিয়ে গেছি—তাই প্রকৃতি আমাদের আর ততটা নিকটে নেই। সেই আদিম প্রকৃতি-কাহিনী রচনার যুগ শেষ হলে আর তো মানুষ প্রকৃতিকে তেমন প্রাণময়ী রূপে কল্পনা করে না। Lilies of the field দেখে মুগ্ধ হয়; কারণ, বিধাতার আশ্চর্য রূপ-সৃষ্টির শক্তি তাতে দেখে,—তা প্রকৃতি-প্রেম নয়। মেঘকে দূত করে, সখা করে; কিন্তু জানে সে ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতের সমন্বয়, তার প্রাণ নেই। তাই রূপ হয়—রূপক। আজও আমরা প্রকৃতির কতকটা কাছে আছি—নন্দলাল হিমালয়ের রূপে দেখেন শিবশম্ভু রূপ; আমরাও তা মেনে নেই। হিমালয় নিজরূপে আর দেবতাত্মা নেই, আজ সে পরমাত্মার এক রূপক। আধ্যাত্মিক যুগ এলে প্রকৃতির নিজ যুগ ফুরোয়—তখনকার গাছলতাপাতা শুধু পরমাত্মার advertisement.

Characters of the great Apocalypse
The types and symbols of eternity,
Of first, and last, and midst, and without end.

অবশ্য, তা থেকেই আবার তার একটা মর্যাদাও আসে। কারণ বিশ্বাত্মা তখন অনলে-অনিলে সর্বত্র ঠাঁই নেন; আর তাই অনল অনিলেরও আবার একটা মর্যাদা লাভ ঘটে। কিন্তু সে নিতান্ত সেই বিশ্বাত্মার ছায়া বলে, রূপক বলে, নিজের গৌরবে নয়, তাঁর বিজ্ঞাপন হিসাবে।

হিমালয় হিমালয় হিসাবে আমাদের কাছে আসে নি—আসছে দেবাদিদেবের এক প্রতীক হিসাবে।

আসলে, সভ্যতা আরও না এগোলে প্রকৃতির আসল রূপও আমরা আবিষ্কার করতে পারব না। যতই প্রকৃতিকে আমরা আয়ত্ত করব, ততই এবার দেখতে পাব তার প্রকৃত রূপকে। Man was born in chains ; he is trying to be free. মানুষ জন্মেছিল শিকলে-বাঁধা, এই হল সত্য,—রুশো যা'ই বলুন। তাই সমাজের দীর্ঘদিনের কবিতায় চিত্রে সেই প্রকৃতিপ্রেমের সামঞ্জস্য ছিল না। আমরা 'মেঘদূত' লিখেছি—কিন্তু সহজ 'প্রকৃতি দৃশ্য', 'ল্যাণ্ডস্কেপ্' এঁকেছি কোথায়? ইউরোপেই বা তা কোথায় বেশি? চীনা চিত্রে আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তা কই? রাজপুত চিত্রকলায় এসে দেখলাম সে দৃশ্য। সঙ্গীতেও দেখলাম তখন প্রকৃতির ধ্যানরূপ, মল্লার, কি দীপক, ভৈরবী কি পুরবী। তাও যেন রূপক। 'রাগমালার' চিত্রে প্রকৃতির থেকে বড় প্রতিকৃতি। আর কাব্যে গানে—সবখানেই সেই 'শাঙন ঘন গহন মোহ' আমাদের মানুষের জীবনের শুধুমাত্র প্রেক্ষাপট। খুব সহজ আর স্বাভাবিক তা, আমরাও প্রকৃতিকে তাই এভাবেই দেখছি—প্রতীক নয় প্রেক্ষাপট। এমনিই তো চলেছিল যতদিন আমরা আবার ইংরাজি কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির নতুন সত্তার সংবাদ না পেলাম। কিন্তু ইংরাজি কবিতাই বা সেই সত্তার সংবাদ পেল কবে? ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ থেকে—যখন থেকে মানুষ প্রকৃতিকে আয়ত্ত করতে শুরু করেছে—সত্যই দূরে যেতে শুরু করেছে। অমন এলিজাবেথীয় কবিতায় কোথায় সেই প্রকৃতি-প্রেম? মামুলি জিনিস সেখানে প্রকৃতি—কাব্যের একটা মামুলি উপকরণ। অষ্টাদশ শতাব্দী এল, ওদের শহরে সভ্যতা বেড়ে উঠ্‌ল—একটু একটু করে প্রকৃতির

সংবন্ধে সচেতনতাও দেখা দিল। এল সেদিনের সমাজ-বাঁধনে বিদ্ধ রুশো আর তাঁর দল। সমাজ তখন বেচাল; তাঁরা ঠাওরালেন—প্রকৃতিতেই বুঝি ছিল মুক্তি, আছে পরিত্রাণ। অতএব, ‘ফিরে চলো বনে’—‘Back to Nature’. প্রকৃতি আর মন-গড়া প্রাকৃতজনের স্বপ্ন হল তাঁদের সম্বল। রুশোর পর থেকে শুরু এই অপ্রাকৃতিক স্বপ্ন—সবাই ভাবলে সভ্যতাই বুঝি ব্যাধি। কে জানে ফরাসী বিপ্লবের মর্মকথা বুঝলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর অমন ‘প্রকৃতি-প্রেমিক’ থাকতেন কিনা? না, শিল্প-বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হতেন? বিপ্লবের স্রোত থেকে যত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সরলেন দূরে ততই প্রকৃতির কোলে আশ্রয় খুঁজলেন; জীবন থেকে যতই বিদায় নিলেন ততই প্রকৃতির ঘরে প্রতিষ্ঠা করলেন এক মন-গড়া জীবন। সে প্রকৃতি অতিপ্রাকৃতিক, আরাধ্যা হলেন, হলেন নিশ্চলা নীতি। ততক্ষণ শিল্প-বিপ্লবে ব্রিটেনের সৌভাগ্য রচিত হচ্ছে—হয়ত সেই গ্রামের বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রক্তময় কল-কারখানা দেখেই কবিরা আরও প্রকৃতিমুখী হয়ে উঠ্‌লেন। আর ততক্ষণে রুশো-গডুইনের আকাশচারী ছাত্র শেলি বিপ্লবের ব্যর্থতায় শূন্যে পাখা ঝাপ্‌টাতে লাগলেন। তাঁর চোখে প্রকৃতি হলেন মুক্তা, স্বাধীনা—প্রোমিথিয়ুসের প্রেমিকা। জীবনে তাল রেখে এগুতে না পেরে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতিকে দেখলেন অবিচলা নীতি হিসাবে। জীবনের তাল আর কল্পনার তালে খাপ খেলো না বলে শেলি প্রকৃতিকে দেখলেন প্রগতি হিসাবে। আর এই দুই দেখা শেষ হতে না হতেই ডারুইনের দিন এল—প্রকৃতির রক্ত-নখর-দন্ত-নয়নও আর কারো চোখ এড়িয়ে গেল না।

না, প্রকৃতিকে তেমন প্রথম যুগের মত আর আমাদের নেওয়া চলে না। চলে না বলেই আমরা এদিনের নাগাল পেয়েছি—আমরা

মানুষ হয়েছি, মানুষ হতে চলেছি। শুধু 'প্রকৃতির সন্তান' আমরা নই, সেই natural piety আমাদের নেই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যা'ই বলুন প্রকৃতির মধ্যে সেই মমতা নেই—তিনি আমাদের মাতৃস্বরূপা, হয়ত বা ধাতৃস্বরূপা। আমাদের মানবপ্রকৃতিও আসলে বিশ্বপ্রকৃতিরই তো একটা প্রকাশ আর পরিণতি। কিন্তু আমরাও তাঁর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে এসেছি—আমাদেরও একটা স্বতন্ত্র সত্তা আমরা আবিষ্কার করেছি। ওখানেই আমাদের আসলে নিজস্বতা—মানব-প্রকৃতি হিসাবেও বটে, জীব হিসাবেও বটে। প্রকৃতির কোলে শিশু কে? তারই দেহে দেহ মিশিয়ে আছে—জন্মেনি, বাড়েনি, দেখেনি আপনাকে, দেখেনি প্রকৃতিকেও? প্রকৃতির কোলে শিশু রয় গাছ আর লতা পাতা—অচেতন প্রাণী। তারা তো জীবনের প্রাথমিক প্রয়াস মাত্র—কয়েকটা পরীক্ষা। জীবন তাদের মধ্যে ফুটে উঠ্‌তে পায়নি—শুধু পথ খুঁজছে; ভ্রূণের মধ্যে মানুষ যতটা আছে ততটাও নেই ওদের মধ্যে জীবনের প্রকাশ। শুধু শিশুতে মানুষের কোন পরিচয় আছে? কিছু নেই। শিশু আর শিশু থাকে না বলেই তো তার মূল্য। সে মায়ের কোল ছেড়ে একটা নতুন মানুষ হয়ে উঠ্‌বে বলেই তো মায়েরও তাতে মর্যাদা। তা হলে "প্রকৃতির পুত্র" আমরা থাকি না বলে দুঃখই বা কি? আমরা বড় হই, বড় হচ্ছি—প্রকৃতিকেই ছাড়িয়ে যাচ্ছি। শিশু তো এখনো আছে অসংখ্য জীব আর অগণিত প্রাণী। তারা এখনো প্রতিবেশকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে নি—সামান্য পরিবেষ্টনীর একটু অদল বদল হয়েছে কি, তারা জাতকে জাত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিরও কোনো মায়া নেই তাদের জন্য, কোনো মমতা নেই সেই জীবপ্রকৃতির জন্য। আকাশ উদাস চোখে তাদের জন্ম-মৃত্যু দেখে, একটি নিঃশ্বাস ফেলে না তাদের জন্য বাতাস।

আমাদের জন্যই কি ফেলে চোখের জল? কতবার আমাদের জীবন তার ছাড়া-পাওয়া ফুৎকারে উড়ে যায়—একবার সে মাথা নাড়লে আমাদের হাজার প্রাণ ধূলায় লুটায়।—বিহার ধসে গেল একটি সামান্য কাঁপুনিতে, এক সামান্য ফুঁতে প্রশান্ত মহাসাগরের দু' তীরে শহর গ্রাম উড়ে গেল, তার অগ্নি-শ্বাসে ছাই-চাপা পড়ে গেল পম্পেই; তার মরু-গ্রাসে তলিয়ে গেল খোটান আর মধ্য এসিয়ার বৌদ্ধজগৎ। হয়ত আমরাও আবার তলিয়ে যাব কোন্ দিন—যুগ যুগ পরে কোন্ বরফ স্রোতে, কিংবা যাব পুড়ে শুকিয়ে কোন্ উষ্ণযুগের তরল অগ্নিধারায়! কোন্ নিয়তি আমাদের জন্য রচনা করছে প্রকৃতি কে জানে—কে বল্‌বে?

হয়ত আমরা প্রকৃতিকে জয় করছি শেষ পর্যন্ত এমনি পরাজিত হব বলেই। তবু প্রকৃতিকে আমরা জয় করছি বলেই আমরা প্রকৃতিকে পাচ্ছি—তার অস্তিত্ব সংবন্ধে সচেতন হচ্ছি। আবার, প্রকৃতিকে জয় করেও আমরা সে জয়ের ফল ঠিক মত ভোগ করতে পারছি না। আজ তাই সেই 'প্রকৃতি-প্রেম', সেই 'প্রকৃতি-বোধ' আমাদের নতুন ভাবে আলোড়িত করছে। জীবনকে ঠিক মত সাজিয়ে নিতে পারছি না সংহত করে নিতে পারছি না, তাতে বিকৃতি থেকে যাচ্ছে। আর তাই রুশোর ধারাতেই ভাবি ফ্রয়েডীয় ভাষায়। ভাবি, আমাদের এই প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ বুঝি একটা অভিশাপ। ভাবি, সেদিন যদি ফিরে পেতাম যেদিন আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ ছিল নিবিড় এবং সহজ! আসলে, সে "সহজ যুগ" শেষ হয়েছে যেদিন থেকে আমরা প্রকৃতির বন্ধন কাটিয়ে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছি, গুহা ছেড়েছি, গহ্বর ছেড়েছি, হয়ত যেদিন থেকে

মানুষ হতে আরম্ভ করেছি—সেদিন থেকেই। মানে, সহজ আমরা আর নেই যেদিন থেকে প্রকৃতিকে চিন্তে আরম্ভ করেছি সেদিন থেকেই। কিন্তু সহজ আমরা হচ্ছিও আবার—বাধা কাটিয়ে ;—যতই চিন্ছি নিজেদের, ততই চিন্ছি প্রকৃতিকে বেশি করে ;—সহজে ততই প্রকৃতিকে আপনার করে নিচ্ছি। এই সত্যটাই সভ্যতার এই বিকৃতির মধ্যে আমরা ভুলে যাই—প্রকৃতির মধ্যে আর আমরা মিলিয়ে যেতে পারব না, তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। ডি. এচ্. লরেন্স যত চেষ্টা করুন—তেমনি life of nature বা life of instinctএ আর ফেরা সম্ভব নয়। আসলে, তাঁদেরও এটা প্রকৃতি-প্রেম নয়, যুগের বিকৃতির প্রতিক্রিয়া—জীবনের বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সত্য ওতে আছে—জীবনে প্রাণাবেগের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ চাই,—যেমন স্বাচ্ছন্দ্য আছে জীব-জগতের। কিন্তু মিথ্যাও ওর তাই এত মারাত্মক। মানুষ আর জীব এক নয়—আমার মধ্যে প্রাণাবেগ ব্যাপকতর প্রকাশের পথ চায়—মানব-প্রকৃতি শুধু সেই মূল প্রকৃতিরই প্রতিধ্বনি নয়, পুনরুক্তি নয় ;—একটা নতুন প্রকাশ, তার প্রতিদ্বন্দ্বী, একটা আবির্ভাব।

সহজ আমরা হ'ব যখন আমাকে আর প্রকৃতিকে সহজ করে নিতে পারব। বুঝব এই কথাটা—আমি প্রকৃতিকে জয় করেই তাকে চিন্ছি, আর প্রকৃতিও আমাকে সেই জয়-পরাজয়ের সংবন্ধের মধ্য দিয়ে মানবপ্রকৃতিকে চিনবার পথে এগিয়ে দিচ্ছে—যত আমরা প্রকৃতির বন্ধন মুক্ত হব, তত প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মিলনের পথ নিকট হবে, সহজ হবে ; অপ্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতের মোহ থেকে মুক্ত হব—আর প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হবে সহজ ও স্বচ্ছন্দ। যত আমরা বন্ধন মুক্ত হব, জানব,—এই আকাশ কত অসীম, এই ব্যাপ্তি কত

দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপী ,—জানব, সূর্য আর দেবতা নয়, চন্দ্র শুধু মড়া পৃথিবী ;—জানব গাছ-লতা-পাতার নিয়ম,—চিনব প্রকৃতির গতি। আর ততই বুঝ্‌ব—এই সূর্য আমার প্রাণকে জীইয়ে তুল্‌ছে, এই পৃথিবীর সামান্যতম পরিবর্তনে আমার প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যায় ;—বুঝ্‌ব প্রকৃতি আমার জীবনের কত বড় পরিবেশ, কত সক্রিয় দান তার আমার মনের উপর। আর কত সত্য নারিকেলের ছায়াবোনা সেই ছোট শহরের দান, নদী-ধোয়া মাঠ-ঘাটের রূপ, শিশির-ভেজা ঘাসের ফুলের চাহনি, ঝাউ-এ ছাওয়া লাল সড়কের ডাক, বাদামতলার ঘনছায়ার স্মৃতি, বান-ডাকা নদীর বিপুল উচ্ছ্বাস,—বুঝ্‌ব হাড্‌সনের Far Away And long Agoর চেয়ে কম নয় সেই ছোট্ট, শহরের স্মৃতি আমার মনে—sensations sweet, felt in the blood, and felt along the heart.—আর বুঝ্‌ব সেই বিমূঢ় বিস্ময়, কত সত্য বক্‌সার নিদ্রাহীন রাত্রে যখন মনে হত হিমালয় আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে আছে, বর্ষণস্নাত অপর্যাপ্ত বনানীর জলধারা ঝরছে, আর দু'দিকে ঝরণার জলের প্রচণ্ড কলরোলে আমার চেতনা মথিত। বুঝ্‌ব সেদিন প্রকৃতি কত সক্রিয় আমারই জীবনের পক্ষে, কত তার দান ; বুঝব সেদিন আকাশ আমাদের কত আত্মীয়।

আমরা প্রকৃতির থেকে দূর গেছি বলেই প্রকৃতিকে চিন্‌ছি। সমুদ্র থেকে মুক্তি পেয়েছি বলেই বুঝি—সমুদ্র আমার কত বড় সান্ত্বনা। সেক্‌স্‌পীয়রকে পেয়েছি বলেই আবার জানি—সমুদ্র আর সেক্‌স্‌পীয়র জোগায় কত বড় মুক্তির প্রেরণা। Magnitogorsk গড়তে পেরেছি বলেই আবার নতুন করে গড়ছি Garden City. বুঝছি, কত স্বাস্থ্যকর অরণ্যের রূপ। ছুটি তাই সমুদ্রোপকূলে, ছুটি পর্বত শৃঙ্গে, ছুটি যেখানে মাঠ অবারিত, আর আকাশ অখণ্ডিত। প্রকৃতিকে আর প্রতীক

করে তুলছি না—তুল্ছি আমার সক্রিয় সঙ্গী করে। যেই বাধা পড়ি ছোট ঘরে অমনি বুঝি—আঙিনাও কত সত্য আমার কাছে, আকাশ আমার কত আত্মীয়।

আকাশ আর আঙিনা, এ দুয়ের মর্যাদা তাই আমরা এখানেই ঠিক বুঝতে পারি। দিনে মাত্র দুঘণ্টা তো। কাল আবার একটু গোলমাল বাধে। ফলে আমরা ওই দু'ঘণ্টার এই বেড়ানোর স্বাধীনতা হারিয়েছি—অন্তত কিছুদিনের মতো। এতটা আকাশ, এতটা আঙিনা, সব খানে মেলে না; তাই ও নিয়ে আমাদের দুঃখ নেই। আর কিইবা এই আকাশ আর আঙিনা? দেয়ালের আড়ালের সামান্য কয়েক হাত জমি আর তার ওপরকার কতকটা আকাশ,—দিন শেষে দুঘণ্টার জন্য—এই তো। ভিতরের সঙ্কীর্ণ আঙিনায় ও ঘরে অতএব দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের খেলা জমেছিল, গল্প জমেছিল, আর চলেছিল দ্বিগুণ তেজে ঘরের ভিতরেই ভ্রমণ। সন্ধ্যাটা বেশ কেটে গেল।

যখন অনেক রাতে শুয়েছি, মনে হল—কাকে যেন আজ দেখিনি।

প্রেসিডেন্সি জেল,

১৯৩৪।

কবিতার রাত

কথা বল্‌তে বল্‌তে মাঝখানে আমি থেমে পড়্‌লাম—চাঁদ! লাল থালার মত চাঁদ! জানালার দিকে চোখ গিয়েছিল। গরাদ-বসানো যে জানালা ভাগ্যক্রমে ছিল আমার সামনে। তার মধ্য দিয়ে চোখ সহজভাবে গিয়েছিল,—কথাটা আর শেষ হল না।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন—কি ?

—চাঁদ।

এগিয়ে এসে বন্ধু পাশে বস্‌লেন, বল্‌লেন—

—পূর্ণিমা বুঝি, অঘ্রাণের পূর্ণিমা।

চাঁদ। লাল থালার মতো চাঁদ পূর্ণিমার, গোল আর প্রকাণ্ড বড় চাঁদ। ঠিক আমার চোখের সামনে, একেবারে চোখের বরাবর—সাম্‌নেকার ঘাসে ছাওযা আঙিনাটুকু পেরিয়ে, পুকুরের ওপারে, অশ্বত্থগাছটি যেখানে তার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়েছে সেখানে,—আমার চোখের বরাবর। উঁচুতে নয়, অশ্বত্থের গোড়াটা যেখান থেকে ত্রিধা হয়েছে—সেখানটায়; দুটো প্রকাণ্ড ডাল মাঝখানে রচনা করছে একটি ফাঁক। সুন্দর এই অবকাশটুকু, দুই শাখার মাঝখানে নিভৃত একখণ্ড নীল আকাশ, গাছের ডাল যেন তাকে ঘিরে আপনার করে নিয়েছে। আর ঠিক তারই মধ্যখানে কখন উঠে এসে দাঁড়িয়েছে চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ। এখনো তার রঙ লাল, আকার বিস্তৃত, সোনার থালার মত।

বেশিক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থাকা চলবে না। বেশিক্ষণ পাওয়াও যাবে না চাঁদকে দেখতে। প্রকাণ্ড আমার জানালা। আসলে এককালে

তা দরোয়াজাই ছিল, যদিও গরাদ বসানো। কিন্তু একটু পরেই অশ্বত্থশাখার বাহু-বন্ধন-মুক্ত হয়ে চাঁদ উপরে উঠে পড়বে; আর একটু উপরে উঠ্‌তেই তাকে তখন ঢেকে দেবে অশ্বত্থের ঘনপাতা। সে পাতার ফাঁক দিয়ে অবশ্য অজস্রধারে জ্যোৎস্না ঝরে পড়বে গাছের তলায়। ওখানকার সেই লাল সুরকির উপর আলো-ছায়ার বিচিত্র মোজেইক্ কাটা হবে। কিন্তু আমার এখান থেকে তা বড় দূর। মাঝে এই ঘাসে ভরা আঙিনা, তারপর ওই পুকুর, তারও ওপারে সেই অশ্বত্থগাছ। আমি অশ্বত্থতলার কিছুই দেখতে পাব না। দেখব ঝাপ্‌সা কালির পোঁছের মতো তার তলাকার ছায়া, আর আকাশের পটে আঁকা তার সিল্‌হোট-করা পত্ররাজি। আমি কিছুই দেখতে পাব না। তখন চাঁদও আমার সামনে থেকে সারা রাতের মত হবে পত্রান্তরালে আচ্ছাদিত। বেশিক্ষণ এই সোনার থালার মতো গোল চাঁদ দেখা যাবে না। বেশিক্ষণ আমারও এই পঁচিশজনের সরকারী ঘরে এভাবে সেদিকে তাকিয়ে থাকা চল্‌বে না।

তবু উঠ্‌তে ইচ্ছা করে না। একটু পরেই তো চাঁদ আড়াল পড়ে যাবে। তবে ঘণ্টা দেড় বাদে আবার আমার চোখের সাম্‌নে চাঁদ আর একবার এসে দাঁড়াবে। এই জানালার সাম্‌নে আবার তার প্রকাশ হবে—অশ্বত্থ চূড়ার উপর দিয়ে দক্ষিণের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে। তখন অনেকক্ষণের মতো তার তেরছা আলো এসে পড়বে আমার শয্যাপার্শ্বে, আমার আসনের ওপর। ক্রমে তা সরল-রেখায় সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌বে। তারপর তা আমার শিয়র থেকে নেমে জানালার তলায় আস্‌বে। সেখান থেকেও পিছিয়ে দাঁড়াবে, একেবারে ঘর ছেড়ে যাবে। বাইরে তাকিয়ে দেখব তখনো অজস্র জ্যোৎস্না, কিন্তু ব্যারাকের

কোনের দোতলার কার্নিসের চূড়ায়ও আর চাঁদের চিহ্ন নেই। আকাশভরা জ্যোৎস্না তা বুঝতে পারব, আঙিনাভরা তার উছল জোয়ার দেখতে পাব, কিন্তু চাঁদ আর চোখে পড়বে না। আমার জানালার কাছ থেকে তখন সে বিদায় নিয়ে গেছে—এ রাত্রির মতো। এই পূর্ণিমার রাত্রির মতো সে বিদায় চূড়ান্ত।

লাল আর গোল, সোনার থালার মতো এখনো এই পূর্ণিমার চাঁদ। সবে সূর্যাস্তের সমুদ্র থেকে উঠে আস্‌ছে। তাকে এমনিভাবে বেশিক্ষণ আর পাব না; কিন্তু তবু তার দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার সাহস হচ্ছে না। সরকারী ঘর, পঁচিশজনের মাঝে আমি একজন। আমি ধরা পড়ে যাব, আমার দিকেই সবাই তখন তাকিয়ে থাকবে। আমার নিজেরও মনে হবে, আমি যেন অপরাধী, অশোভন ভাবে কি একটা জিনিস ভোগ করছিলাম। অশোভন ভাবে—দশের মধ্যে থেকে কোনো একটি রমণীর মুখপানে তাকিয়ে থাকা যেমন অশোভন, তেমনি এই জিনিস। অথচ তেমনি দুরন্ত ওর আকর্ষণ। আমি এদিকে-ওদিকে দেখ্‌ছি—চোখে আমার সশঙ্ক দৃষ্টি, বুঝি কেউ ধরে ফেললে। আর তারই ফাঁকে এক একবার তাকাই ওই চাঁদের দিকে। বহু প্রতিবেশীকে ফাঁকি দিয়ে আর বহুপ্রতিবেশিনীর তীব্র দৃষ্টি সহ্য করে যেমন দেখতে হয় কোনো সুন্দর মুখ, তেমনি, তেমনিভাবে আমি এক এক ঝলক দেখে নিচ্ছি এই পূর্ণিমার সদ্য-উদিত চাঁদ। জানি একটু পরেই এ আড়ালে চলে যাবে—এখনইতো কতটা উঠেছে উপরে, পাণ্ডুর হয়েছে তার রঙ্‌; সংকুচিত হয়েছে আকার। তবু, অকুণ্ঠিতভাবে তা আমি দেখতে সাহস করছি না।

এ মোহ বড় রূপজ; খুব বেশি তা ইন্দ্রিয়গত। এই জ্যোৎস্না রাত্রির চারদিকেই একটা লীলা আর লাস্যের আভাস; কেমন একটা কোমল

ইঙ্গিত। ভালো সিল্কের কাপড়ের উপর হাত বুলিয়ে নিলে হাতের আঙুলের ডগায় ডগায় যেমন একটি ইন্দ্রিয়গত বোধ জাগে, এও তেমনি। সারা দেহ শিউরে উঠে। নরম স্পর্শ—ভালো সিল্কের মত নরম, তরুণীর চুলের মত নরম। তেমনি এই জ্যোৎস্নার আভাও,—নবীন যৌবনরাগের মত, নতুন পাতার মত, ফুলের পাপড়ির মত। অনেক রহস্য তার পিছনে, অনেক অনাবিষ্কৃত অনুভূতি, অনেক উদ্বেল আনন্দ।

ধন্যবাদ এই জেলের জানালাকে—এমন রাতেও যখন জেলে থাকতেই হবে, থাকতে হবে এই ব্যারাকের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ। তবুও শুনতে পাচ্ছি জ্যোৎস্নার গান! মানুষের চক্রান্ত মিথ্যা করে শুনতে পাই দেবতার ডাক। যেন কোন্ দূর দূরান্তরের এক পৃথিবী-ছাড়া আকাশ-ঝরা ডাক আজ শোনা যাচ্ছে—

Come away, O human child !
To the waters and wild
With a faery hand in hand
For the world's more full of weeping than you can understand.

'To the waters and wild', 'To the waters and wild'—কোন্ সমুদ্র সৈকতে, কোন্ অরণ্যের সভাতলে এই ডাক? কোন্ আকাশে, কোন্ দিগন্তে? আমি খুঁজছি কোন্ মোহিনীকে, La Belle Dame Sans Merci? আমি উন্মাদ নাইট্ এরাণ্টে নই, আমি পাগ্লা মেহের আলী নই—এ যুগের নির্বিকার পাষাণের বন্দী, জেলখানার জীব—এমন ডাক আমার কানে পৌঁছুলে চলবে কেন?

আজেকের রাতে আমার যে হঠাৎ কবিতা পড়তে সাধ হচ্ছে! মনে পড়ছে গান আর কবিতা। আজকের মত রাতে আমার তাই মনে

পড়ছে কীট্‌স ও রবীন্দ্রনাথ। গুঞ্জন করতে ইচ্ছা করছে য়ীয়েটস্‌ বা শেলি। আজ কবিতার রাত। দেখছি আর মনে হচ্ছে—আমারও যেন কবিতার দিন যায় নি। কবিতার দিন—কার মনে হবে আজ রাতে যে তা শেষ হয়েছে তার জীবনে? মনে হয়—আমারও তা যায় নি। যায় নি? ক্লাশে আমার কবিতা ব্যাখ্যা করতে হয়,—শব্দের অর্থ বলে বোঝাতে হয় নাই নাইটিঙ্গেল, আর ইণ্ডিয়ান্‌ সিরিনেড্‌। তার পরে আর আজ মনে করতে পারি কি—In such a night······? মনে করতে পারি কি—One word is too often profaned? তাই আর আজ কীট্‌স—পঁচিশের পাঁচিল পেরোতে যে পারে নি জীবনে, আর পঁচিশের এ পারের কোনো ছেলে যাঁকে চেনে না—সে কীট্‌স্‌ আমার হাতে মানাবে না? এমন রাতে কার হাতে না মানায় কীট্‌স্‌? এ রাতের রূপ চোখে দেখ্‌লে কে বল্‌বে—না, 'কবিতার রাত' শেষ হয়েছে, রোমান্টিসিজমের যুগ আর নেই।

সত্যি, আজ কবিতার রাত। এমন রাতে কবিতা আর গানই ভালো মানায়। এমন রাতে কেউ গল্প লেখে না, গদ্য লেখে না। গদ্য পড়েও না। পড়তে পারে গদ্য—সে কবিতার মত গদ্য; হয়ত তা 'ক্ষুধিত পাষাণ', হয়ত তেমনি আর কোনো গল্প, 'ডাক্তার', বা Green Mansions, অমনি কিছু উপন্যাস—'কপালকুণ্ডলার' মত যার প্রাণ মূলত কাব্য। মোট কথা—এ রাত কাব্যের রাত, গদ্যের নয়। উপন্যাস দিয়েও আজকের রাতকে বোঝা যায় না। এ রাতে ঘটনা নেই। আমরা জটিল চরিত্রের প্রকাশ আর বিকাশ দেখ্‌তে চাই না—পেতে চাই একটি বিশেষ নিগূঢ় অনুভূতিকে। সে অনুভূতি দিতে পারে কবিতা, দিতে পারে সংগীত, দিতে

পারে চিত্রও। এ সবেই আমাদের মন আজ কথা ক'য়ে উঠ্‌তে পারে—কবিতায় বা কাব্যধর্মী কোনো প্রকাশে, যাতে অন্তরাবেগ ভাষা পায়, ভাষা পায় অতি নিগূঢ় এই অনুভূতি—যার সঙ্গে চাঁদের পরিচয় কত অরণ্যে আর কত সমুদ্রে, কত গুহায় আর কত বনান্তে, কত আসঙ্গ-উৎসবের উদ্বেল আনন্দে আর কত মিলন-বাসনার বিস্মৃত উল্লাসে, কত নিয়মহীন উদ্দামতায় আর কত নিয়মবাঁধা উৎসবে, কত পূর্ণিমা রাতের রাত-জাগায়, আর কত জ্যোৎস্না-ভরা পান-সভায়,—কতবার এমন চাঁদের স্পর্শে স্পর্শে সেই আমাদের আদিম অনুভূতি বারে বারে জেগেছে, বারে বারে ছাড়া পেয়েছে, বারে বারে হয়েছে নবীনতর, বারে বারে হয়েছে বিচিত্রতর। এই জেলখানার জানালার মধ্য দিয়ে চাঁদ তাকে যখন আবার ছুঁয়ে জাগিয়ে তুলল, সে আবার কথা খুঁজছে—সেই আদিম অনুভূতি—জৈবী-প্রেরণাই, এ রাতেও আবার কথা খুঁজছে। কিন্তু কথা খুঁজছে সে ১৯৩৫এর ভাষায়—নতুনতম, বিচিত্রতম তার দাবি। ফুরাবে কি করে তবে কবিতার দিন, রোমান্টিসিজমের যুগ? তা ফুরায় নি। চিরন্তন সেই প্রাণাবেগ, সেই আদিম অনুভূতি—সেই রূপের মোহ, সেই ভালোবাসা, সেই রহস্য-বিবশতা।

আজও মানুষ ভালোবাসছে। আর ভালোবাসলে সে চায়—তার গহন অনুভূতিকে বাণীরূপ দিতে। সত্য বটে, জানি আমরা সে ভালোবাসারও গোড়ার কথা। তা একটা জৈবী সংস্কার—একটা প্রাণ-পিপাসা। এ কথা আরও বেশি করে জানত আদিম মানুষ। আমার মধ্যে যে আরও বিচিত্র সেই জৈবী সংস্কারই যা হয়েছে আবার মানব-সংস্কার; আমার যৌনবাসনা,—সেও যা আজ একই কালে জীববৃত্তি আর সংস্কৃতির যোগফল: 'sex relations = biology plus culture.'

সে প্রাণবৃত্তিই আজ তাই বলে দেয়—"আজ তোমার ফুল চাই,গান চাই, চাই রূপ রস গন্ধের শব্দের আয়োজন"। 'Without Cherry Blossoms' এ দিনের বাণী ফুটবে না—বৃথা হবে এমন রাত। মিলনের রাতে মস্কৌতেও চেরি ফুল চাই—জ্যোৎস্না রাতে চাই জেলেও কবিতা। কবিতা ছাড়া বৃথা হবে জেলের এ রাতও।

রোমান্টিসিজমের দিন যায় নি—কবিতার রাত শেষ হয় নি। জীবনটা রোমান্টিক কিছু নয়—কিন্তু জীবনে রোমান্টিক রাত আছে। তা'ই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। বিষয়বস্তু দিয়েই তো কাব্য শেষ হয় না—পরী আর চাঁদ, ফুল আর সূর্যাস্ত—এসবই কবিতার একমাত্র বিষয় নয়। কবিতার বিষয়বস্তু এসবও হয়, চেষ্টারটনের হাতে হয় গাধা, হয় রসের সাম্‌নে ম্যালেরিয়ার বীজাণু। কিন্তু আসল হল ওর ভাববস্তু আর কল্পনা ; তা অনুভূতি-মাখা, অনুভূতি-রাঙা। বস্তুর থেকে বড় এ বাস্তব—মানে, বাস্তবের অভিজ্ঞতা, মানুষের সংগে বাস্তবের যেখানে সংবন্ধ সক্রিয়—বস্তুকে আমি নতুন করে তুল্‌ছি, বস্তুও আমাকে নতুন করে তুল্‌ছে—একটা সক্রিয় সংবন্ধ চলেছে। তাতে আদিম প্রেরণা নতুন প্যাটার্নে ফুটছে। জ্যোৎস্নাকে জেলের জানালায় বসে ১৯৩৫এ আমি গ্রহণ কর্‌ছি, জ্যোৎস্নাও ১৯৩৫এর আমাকে প্রেসিডেন্সি জেলের জানালার পথে নতুন করে তৈরী করছে। তার ভাষা চাই—কিন্তু সেই ভাষা আবার ১৯৩৫এর মত হওয়া চাই—১৯৩৫এর এমনি রাতের মত। তাই কবিতা পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে, মনে পড়ে কীট্‌স্ আর কোলরেজ্, ব্লেক্ আর য়ীয়েট্‌স্।

একেই আমরা বলি রোম্যান্টিক ভাব—এই কাব্যধর্মী মনোভাব। এ জন্যই খাঁটি রোম্যান্টিক রচনা গদ্যে সম্ভব নয়। এমন রাতে গদ্য পড়ার কথা আমারও মনে হয়নি—যে আমি গদ্য-পড়া মানুষ। গদ্য হয়ত পড়তে

পারি, কিন্তু আসলে তাও কাব্যধর্মী গদ্য—মানে, ছন্দে লেখা না হলেও কবিতাই। সব গদ্য আসলে 'গদ্য' নয়—সব কবিতাও তো কাব্যধর্মী নয়। কবিকঙ্কণের পদ্যে আছে উপন্যাসের উপযুক্ত চরিত্র-চিত্র,—বাংলায় লেখা প্রথম উপন্যাস বোধ হয় তা। পোপ্-ডারুইন্-হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ-কবিতায় আছে ছন্দে-ধরা বিদ্রূপ। কাব্য তাদের ধর্ম নয়। ওসব হগার্থের ছবির মত, চরিত্র-চিত্র;—অনুভূতিব ব্যঞ্জনা নয়—চরিত্রের চিত্রালয়। অবশ্য হয়ত কাব্যরূপ থেকেও রসের চিত্ররূপ বেশি স্থায়ী হবে—সেক্‌সপীয়র যেমন স্পেন্‌সর কীট্‌সের ওপরে থাক্‌বেনই। এজন্যই বঙ্কিমের উপন্যাসও থাক্‌বে, টিক্‌বে। তাতে রোমান্স আছে বলে নয়, রোমান্স তো তাঁর কথার বাইরের আবরণ মাত্র। তাঁর দরকার ছিল একটা পরিবেষ্টনীর, অতীতের অস্পষ্ট কাল তা'ই জুগিয়েছে মাত্র—আসলে আছে তাতে চরিত্র, আছে তাতে চিত্র, আছে মানুষ; সেই চরম বিস্ময়, আর কল্পনাতীত সত্য—মানুষ, মানুষ, মানুষ!

এ রাত্রে কিন্তু আমরা সেই মানুষকেও চাই না। চাই আমাদের গহন অতলের মানুষকে—দেখতে, বুঝতে। সে তো 'বিচিত্র' মানুষ নয়, সে হল 'মূল' মানুষ—সামাজিক মানুষ নয়, সহজ মানুষ—যে মানুষ সবার উপরে সত্য, আর যার উপরে নাই। এ রাতে সে মানুষের অস্পষ্ট আভাস পাই নিজেদের মধ্যে, আর সে মানুষের পরিচয় আমাদের কাছে উপস্থিত করে কবিতা। তাই এ রাত কবিতার রাত।

আর তাই এমনি রাত আমাদের পালানোরও রাত, ছলনারও রাত। জেলখানার ফাঁকে আমি চাঁদ দেখ্‌ছি—আর জান্‌ছি জেলখানা কত মিথ্যা। এ জানার মধ্যে সত্য আছে; কিন্তু আছে তেমনি একটা বড় মিথ্যা। জেলেও চাঁদ দেখ্‌ছি আর ভাব্‌ছি জেল নেই—আছে চাঁদ, আছে

জ্যোৎস্না,—আছে কবিতার রাত। সত্যই আছে চাঁদ, আছে জ্যোৎস্না, আছে কবিতা,—কিন্তু আছে জেলখানাও। ব্যারাকে জ্বল্‌ছে ইলেক্‌ট্রিকের আলো। তাতে আলো যেমনি কম, রূঢ়তা তেমনি প্রচুর। কয়েদখানার ব্যারাকে ব্যারাকে জ্বল্‌ছে সারা রাত অমনি আলোহীন ইলেক্‌ট্রিকের আলো। বাইরে টহল ফির্‌ছে ভারী বুট-পরা সান্ত্রী সিপাই। প্রহর হাঁক্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে—জেলখানা ঠিক আছে। আর আঙিনায় জ্যোৎস্নাকে তাড়িয়ে দিয়ে জাগ্‌ছে উঁচু প্রাচীর। জ্বল্‌ছে প্রাচীরে প্রাঙ্গণে বিজলীর কড়া মশাল।—কী রূঢ় এই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার, কী প্রতিশোধ পৃথিবীর ওপর!—সত্য এও, সত্য এই জেলখানা সমাজের চক্ষে, সত্য আমার জীবনে। আর তা থেকে আমি পালাতে চাই—আমি মুক্তি পেতে চাই। তাই আমি নিজেকে জানালার ফাঁকে ছড়িয়ে দিই আকাশে-আকাশে—যে আকাশও আমার কাছে টুকরো-করা; ছড়িয়ে দিই প্রান্তরে দিগদিগন্তে, ছড়িয়ে দিই নাম-জানা আর নাম-না-জানা সমুদ্রের তীরে, পাহাড়ের গায়ে, নদীর বাঁকে—যা কিছু থেকে জেল আমাকে বঞ্চিত করছে তা'ই আমি চুরি করে করি এ ভাবে ভোগ। আমি জেলকে ফাঁকি দিই, পাহারা-সান্ত্রীকে ফাঁকি দিই, ফাঁকি দিই মানুষের শক্তিকে। আমি পড়ি কবিতা, আমি ফিরে যাই রোমান্সের 'সব পেয়েছির দেশে'—যাই 'Far Away and Long Ago'র মহলে। সে দেশ আসলে আমারই মন-গড়া। স্থাপন করি তাকে কখনো আমারই মন-গড়া ইতিহাসের কোনো এক স্তরে, স্থাপন করি তাকে আবার কোন্ দূর-দূরান্তরের হেব্রাইডিজের তীরে, কোন্ সমুদ্রের ফেনার পারে নির্জন দ্বীপের বেলায়, তুষার পারে হিমালয়ের বুকে, তিব্বতের মঠে, মরুর অভ্যন্তরের খেজুর ছায়ায়, বেদুইনের তাঁবুতে; দেখি গ্রীক দেবদেবীদের, হিন্দু অপ্সরা

আর দেবকন্যাদের ; দেখি পরী আর দেবদূতদের, দেখি আরব্য উপন্যাসের অসম্ভবের রাজ্য কিংবা কালিদাসের কাল। অসম্ভবের রাজ্যে আমি পালাই—এই অসহ্য বাস্তবের কয়েদখানা থেকে। অসম্ভবের রাজ্যই রোমান্স। সেটা 'সব পেয়েছির দেশ' ; কিন্তু তা-ই 'সব না পাওয়ার দেশ'ও। শুধুই বঞ্চনা, শুধুই ছলনা,—শুধুই আমার বৃথা পালানো। জেলখানা আমাকে বঞ্চিত করছে—সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন থেকে। আর তার শোধ তুলি আমি, জেলকে ভুলি স্বপ্নলোকে ডুবে গিয়ে, বঞ্চনা ক'রে। মানে জেলেরই বঞ্চনা মেনে নিই, মেনে নিই তার অস্বাভাবিকতা। জেল আমি সহ্য করে নিতে চাই ভুলে থেকে—আপনাকে ভুলিয়ে। কিন্তু সে ভুল ভেঙে যায় বারে বারে এই ইলেক্‌ট্রিকের আঘাতে, সান্ত্রীর পদপীড়নে, সিপাইর প্রহর-হাঁকায়। এ রাতেও ভেঙে যায় ভুল, ভুলে থাকবার উপায় নেই। আর দিনের উদয় হতে বেজে উঠবে জেলের রূঢ়তা, তার হৃদয়হীনতা, তার মহলে মহলে রুটিনের রক্তাক্ত নিষ্ঠুরতা। আমার পালাবার পথ নেই।

না, রোমান্সের এই ছলনার পথে আমার মুক্তি নেই—কারও মুক্তি নেই। আমিও পালিয়ে কোথাও যেতে পারি না—এই কঠিন শাসন-ব্যবস্থা আমায় তাড়া করবে, ধরে আনবে, কয়েদখানায় পুরবে। নইলেও আমি ঘুরব গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে, শিকারের পশুর মত,—লাঞ্ছিত, ত্রস্ত, তাড়িত,—চোখে জাগবে ভয় আর অবিশ্বাস, প্রাণে ক্ষোভ আর ক্ষুধা, আর দিন ও রাত হবে আমার পক্ষে এক অসম্ভব পিঞ্জর। পালানো সম্ভব নয়—বাস্তব থেকে পালানো সম্ভব নয়। রোমান্সের সাধ্য নেই সে রক্ষা করতে পারে—সে শুধু ছলনা, শুধু প্রবঞ্চনা,—অর্থাৎ শুধুই মানুষের প্রবঞ্চনাকে মেনে নেওয়া।

জেল থেকে মুক্তির একমাত্র পথ—জেলকে ভুলে থাকা নয়—জেলকে ভাঙা—বাষ্টিল চূর্ণ করা। ওই একমাত্র পথ। তা অসম্ভব সাহসের পথ, অসম্ভব উদ্যোগের পথ। সেও একটা অসম্ভবের সাধনা বটে—সেও একটা রোমান্সের স্বপ্ন বটে। কিন্তু সে বাঁচবার পথ, সে স্বপ্ন নয় শুধু ;—শুধু স্বপ্ন হলে সেও হবে মিথ্যার মোহ। এ স্বপ্ন পৃথিবীর সত্যকে সত্য করবার স্বপ্ন। এ স্বপ্নে আমরা জীবনকেই গ্রহণ করি, জীবনকে নতুন করবার জন্যই গ্রহণ করি। ঘাত-প্রতিঘাতকে এড়িয়ে যেতে চাই না—তাকে জয় করবার শক্তি সঞ্চয় করি। জেলখানাকে ভুলে থাকতে চাই না—জেলখানাকে চূর্ণ করি। তাও অসম্ভবের স্বপ্ন—শেলির স্বপ্নের মত, প্রোমিথিয়ুসের মুক্তি-স্বপ্নের মত, ওয়েষ্ট উইণ্ডের স্তবের মত। এমনি রোমান্স পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, আর তাই বার বার মানুষের সৃষ্টি রোমান্টিক সাহিত্যে এমন সার্থক হয়েছে—সে এলিজাবেথের যুগেই হোক্, কি ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী যুগেই হোক্। এ রোমান্সও আছে ;—জীবনবিমুখী তা নয়। জীবনাগ্রহী, সত্যাগ্রহী এরূপ রোমান্স—যাতে পৃথিবী নতুন হয়—যা সৃষ্টির স্বপ্ন, আর তাই সৃষ্টির বাস্তব প্রেরণাও আবার।

কিন্তু তবু মিথ্যা নয় কবিতার রাতও—তাও সত্য। শুধু ফাঁকি নয়—এই জেলের ফাঁক। এই সংকীর্ণ জেলখানার জীবন আমাদের সংকীর্ণ করছে, আমরা সংকীর্ণ হয়েই আছি। তবু তারও ফাঁকে ফাঁকে পাই আভাস জীবনের মুক্ত আনন্দ-রূপের—জেলের জানালার ফাঁকেও দেখি চাঁদ আর আকাশ। এ যুগের মানুষ হয়েও খুশী হই—অ্যালিসের সংগে আশ্চর্যের দেশে ঘুরে, খুশী হই এখনো ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের ছেলে-ভুলানো কবিতায়। ভালোবাসি—আর সেদিন চাই চেরি ফুল। চাঁদ ওঠে,—আর সেদিন চাই কবিতা। বিজ্ঞান চোখ খুলে দেয় বাস্তবের

অন্তঃপুরে,—আর দেখি কি পরমাশ্চর্য জগৎ! অব্যবস্থায় মানুষকে করছে পীড়ন,—তবু সেই বিস্ময়-বোধ আমরা একেবারে খোয়াইনি। মানুষের ব্যবস্থা পারে না মানুষের প্রাণকে পরাস্ত করতে। আমরা স্বপ্ন দেখি—সে স্বপ্ন সত্যও হয়। আবার রোমান্স নিয়ে ভুলতে চাই জীবন, আমরা নিজেদের ভুলিয়ে রাখি—সে ভুল ভেঙেও যায়, সে রোমান্সের মোহ যায় খসে। আমরা সহজ আবেগে এক এক নিমেষে অভিভূত হই—পড়ি কবিতা, কিংবা গাই গান। কবিতার রাত আজও তাই আসে আমাদের এই জীবনে।

কবিতার রাত আজও আসে। শেষ হয় নি কবিতার রাত, শেষ হতে পারে না—যতদিন আকাশে এমন চাঁদ উঠবে, পৃথিবীতে এমন জ্যোৎস্নার ঢল নামবে। তখন মনে পড়বে পরীদের কথা, মনে পড়বে গ্রীক্ মিথ্। তখন চেতনার সমুদ্রে মথিত হয়ে উঠবে কত কত চাঁদনি রাতের অমৃত, যা আমাদের স্মৃতির মধ্যে জমে আছে, যা আমাদের বিস্মৃতির কালো জলে মিলিয়ে আছে। মথিত হয়ে উঠবে সেই সব। উজ্জীবিত হয়ে উঠবে অবচেতন থেকে কবিতার পিপাসা। তাকে স্বীকার করতে ভয় কি? এ যুগের নাগরিকরা অবশ্য হাসবে। তার থেকে বেশি হাসতে পারত বৈজ্ঞানিকরা—যারা জানে, চাঁদ শুধু পৃথিবীর থেকে খসে-পড়া একটা ছাই-এর কণা, একটা হিম-পিণ্ড, তার আলো প্রতিফলিত সূর্যালোক। তারা হাসতে পারত বেশি—যারা এসব জানে। কিন্তু তবু তারা মানে, এমন রাতে আকাশের তলায় দাঁড়ালেই মানে,—চাঁদ চাঁদ। কাজেই তো এমন রাত্রির মর্মবাণী—এ রাত্রির রূপ—অনুভব করতে হয় চোখ দিয়ে, দেহ দিয়ে, প্রতি রোমকূপ দিয়ে। আর এ রাত্রির রূপ ধরা পড়েছে কবিতার মধ্যে। আকাশ থেকে মনের

উপর যে জোছনা উজল ধারায় পড়ে, পিছলিয়ে পিছলিয়ে যায় সেখানে, তা নিজের বাঁধনে বাঁধা চিরদিনের মত। এমন রাতের রূপ মিলিয়ে দেখতে হয় স্পেন্‌সারের পাতা থেকে আর সেকস্‌পীয়রের থেকে, এলিজাবেথের যুগের গায়কদের থেকে আর রোমান্টিক অভ্যুত্থানের কবিদের থেকে,—আর,—আর হাইব্রোদের ভ্রূকুটি অমান্য করে আজকের মত রাতে চাই য়ীয়েটস্‌ আর রবীন্দ্রনাথ।

তবু এমন কত রাতে আমি মনের নেশাকে ডুবিয়ে দিয়েছি কেজো কথায় ও অকেজো তর্কে। এমন উন্মেষিত বিস্ময়-বোধকে চাপা দিয়েছি সংবাদপত্রের পলিটিকাল ককটেল দিয়ে। এমন কত রাত্রে যখন মনে পড়েছে কীট্‌স্‌, মনে পড়েছে 'মানসী' আর 'মহুয়া', মনে পড়েছে 'প্রোমিথিয়ুস আনবাউণ্ড,' আমি নিজেকে ঠকিয়েছি! কেন? পাছে আমি কলেজে-পড়া ছেলের মতো হয়ে যাই। পাছে আমি হই প্রেমপত্র-লিখিয়ে মেয়ের সমতুল্য! পাছে হাই-ব্রোরা হাসে—দিনের আলোতে যেমন আমিই কাল হাসব। পাছে অতি-অভিজ্ঞের দল হাসে—যেমন আমিও হাসব এই রাতের শেষে। পাছে কেউ বলে আমি রোমান্টিক, বলে আমাকে—যে আমি কলেজে ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে রোমান্টিক কবিতার হাড়মাঁস আলাদা করে ফেলেছি; আর যে আমি হাসিতে আর তর্কে, কৌতুকে আর পরিহাসে পৃথিবীকে একটা তামাসা বলে গণ্য করি; আর যে দিনের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে চিরে চিরে দেখি জীবনের মানে শুধু জীবিকা আর আসঙ্গ—পাছে কেউ বলে আমি কবিতা পড়ি—কারণ, আমি শব্দতাত্ত্বিক। তাই এমন কত রাত্রে চাঁদ বৃথা উঠেছে। এমন কত

রাত্রে আমি কাটিয়েছি আমার কাজের আর নেশার জেলখানায়—বৃথা গেছে কবিতার রাত।

বৃথা যাবে আজও। চাঁদ আমার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। না থাক জেলখানায় আমার এ রাতে কোন কাজ, এ রাতে আছে অঘ্রাণের হিম। খোলা জানালায় অঘ্রাণের হিম লাগ্‌ছে আমার গায়। কেমন শীত-শীত করছে, মাথা ভার হয়ে আস্‌ছে। সর্দিতে ধরল বলে, এখনি আমি হাঁচতে শুরু করব। হাঁচির পরে হাঁচি—সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে হাঁচি;—ব্যারাকের পঁচিশ জনের ঘুম তাতে ছুটে পালাবে। আর নয়,:আর নয়—বন্ধ করো এই খোলা জানালা—ফেলে দাও চটের পর্দা। তারপর চটের পর্দার সাম্‌নে বসে পড়া কীট্‌স্ কি রবীন্দ্রনাথ? আর, হাঁচা আর পড়া কবিতা? এখনি কবিতার রাত হয়ে উঠ্‌বে হাঁচির রাত।

কাজ নেই কবিতায় এ রাতে।

প্রেসিডেন্সি জেল,

১৯৩৪।

স্বপ্ন ও সত্য

সে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

ভেবেছিলাম—আমার সারা দিনের নৈরাশ্য ও উত্তেজনা এবার আমাকে নিষ্কৃতি দেবে, রাত্রি আমাকে কবলিত করে নেবে তার গহ্বরে। মুছে যাবে মন থেকে নৈরাশ্য,—কেন আমার লেখা বাজে লেখা হয়। শান্ত হবে উত্তেজনা—রূপের অন্বেষণে পুরূরবার এই পরাজয়, এই খেদ। আমি চাইলাম নিদ্রা—আরামের, বিশ্রামের, বিস্মৃতির। আমি চাইলাম বিস্মৃতি, আত্ম-বিস্মৃতি। নৈরাশ্যের থেকে, উত্তেজনার থেকে, আত্মপরীক্ষার থেকে আমি মুক্তি চাইলাম। চাইলাম নিদ্রা—আমার মন পেতে চায় স্বস্তি, দেহ পেতে চায় বিশ্রাম।—এবার থেকে আমি আর মায়ামৃগের শিকারে পা বাড়াব না, আমি কাজের পৃথিবীতে বাঁচব। যে পৃথিবী আমার, আমার বড় চেনা, আজন্ম চেনা, সেখানে আমি বাঁচব,—মানুষের সমাজে, মানুষের মত—মানুষের সহযাত্রী, আর মানুষের সহকর্মী। আমি এই মায়ামৃগের পিছনে আর ছুট্‌ব না।—হে উর্বশী, আমি পৃথিবীর মানুষ, আমাকে ক্ষমা করো, বিদায় দাও—আমার গৃহ আছে, সংসার আছে, আছে রাজ্য রাজপাট ; জীবন আর সসাগরা ধরণীর দাবি আমার উপর।

নিদ্রা এল না। বিস্মৃতি আমি পেলাম না। বরং স্মৃতি, সুদূর স্মৃতি, মুছে-যাওয়া স্মৃতি, আধ-মোছা স্মৃতি—রাত্রির গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল। আর হঠাৎ সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল—সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণা মূর্তি।

উর্বশী না শ্রী? লক্ষ্মী না মোহিনী? অপ্সরা না আফ্রোদিতে? ঘুম-ভাঙা রাজকন্যা না মায়াবিনী রাক্ষসী? যে-ই হোক্ এ মানবী নয়।

আমি ওকে আর বিশ্বাস করব না—আমার জীবনকে আর আমি ওর হাতে তুলে দোব না। আমি ওকে চাই না, চলে যাক্। চলে যাক্, চলে যাক্।

—তুমি যাও, তুমি যাও।

—কেন?—সে স্পষ্ট, স্থিরস্বরে জিজ্ঞাসা করলে। বিদ্রূপ নেই, সঙ্কোচও নেই সেই কণ্ঠে।

—কেন তুমি এসেছ?

—তুমি আমায় ডাক্‌ছ, তাই।

—না, না, আমি তোমায় ডাকি না। তোমায় চাই না, তোমায় চিনি না—কে তুমি? কে তুমি?

—জিজ্ঞাসা করো তোমার স্মৃতিকে, জিজ্ঞাসা করো বিস্মৃতিকে। জন্মক্ষণে তুমি আমার বাগ্‌দত্ত। সে ভাগ্য ফিরিয়ে নেবার অধিকার কারো আর নেই—তোমার নেই, আমারও নেই। তুমি আমার—জীবনের মত, মরণের মত; প্রেমের জন্য, প্রতিহিংসার জন্য।

—না, না; অসম্ভব। সে আমার পক্ষে প্রাণঘাতী। তুমি দেখেছ, সে আমার পক্ষে প্রাণঘাতী। আমার দেহ তোমার সে অরূপ-স্পর্শ সইতে পারে না, আমার মন সে মাযা-ভার বইতে পারে না। তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন—তুমি যাও। তুমি আমার দেহকে—আমার ভাঙা দুর্বল দেহকে—আর পীড়ন করো না। আমার মনকে—পৃথিবীর পাণিপ্রার্থী আমার এই মনকে—তুমি আর দিও না শাস্তি। তাকে বিশ্রাম দাও, তাকে আরাম দাও, তাকে শান্তি দাও। দাও শান্তি। তাকে কাজ করতে দাও, তাকে মানুষ হতে দাও, মানুষকে পেতে দাও। তুমি এসো না, এসো না, এসো না। আমার শরীর তোমার স্পর্শে মুস্‌ড়ে যায়। তার

শুক্‌নো ডাল মড়মড় করে। তোমার শ্বাসে পুড়ে ঝলসে যায় তার শেষ পাতা। আর, আমার মন তোমার পায়ের তলায় গুঁড়ো হয়ে যায়। তার হাসি মরে যায়, তার আরাম হয় অস্বস্তি। বারে বারে তোমাকে দেখি,—চিনি নি তবু, এখনো চিনি না। কে তুমি, বলো? কেন তুমি আমাকে শাস্তি দাও? কেন তুমি আস?

—তুমি ডাক বলে। তুমি লিখবে বলে। তুমি লিখবে, তাই তুমি আমায় ডাক্‌ছ, আমায় খুঁজছ। আর তুমি ভালোবাসো,—তাই তুমি লিখ্‌বে। তুমি মানুষকে ভালাবাসো, তাই তুমি লিখবে। আর পৃথিবী তোমার পাণিপ্রার্থী, তাই তুমি লিখে আর শেষ করতে পারবে না। তা'ই পৃথিবী চায় তোমার কাছে, মানুষ তা'ই চায়, তুমি নিজে তা'ই চাও নিজের কাছে। আর তাই আমি এসেছি—লেখো তুমি, তুমি লেখো।

—না, না, আমি লিখতে চাই না। আমি লিখ্‌তে পারি না, লিখ্‌তে পারব না। সে মায়া, সে মিথ্যায় আর তুমি আমায় ছলনা করো না, বিদ্রূপ করো না আমাকে। জানি আমি—আমি লিখ্‌তে পারি না; লিখ্‌তে আর চাই না। আমি ভালোবাসতে চাই—লিখতে চাই না। আমি মানুষ হতে চাই—লিখ্‌তে চাই না। আমি পৃথিবীকে চাই—লিখ্‌তে চাই না। আমি কাজ চাই, কাব্য চাই না। সত্য চাই, স্বপ্ন চাই না। বাঁচতে চাই, লিখ্‌তে চাই না। চাই না, চাই না—তোমার ছলনার শিকার হতে আর চাই না। চাই না তোমাকে—লেখার শত্রু তুমি, মায়াবিনী, চাই না, চাই নি তোমাকে।

—তুমি চাওনি? তুমি আমাকে চাও না, সত্য। কিন্তু তুমি মনে মনে স্বীকার করবে, তুমি আমাকেই আবার চেয়েছ। তুমি আমায় ডেকেছ।

ডাক্‌ছ, এখনো ডাক্‌ছ। আর, আমাকে গ্রহণ করছ না বলেই তোমার দেহ হয়ে উঠ্‌ছে আরো অস্থির, মন হয়ে উঠ্‌ছে নৈরাশ্যে বিক্ষুব্ধ। তুমি আমাকে চাও, লিখতেও চাও। জীবনে তুমি আর কাউকে নিতে পারবে না, আর কাউকে দিতে পারব না—তুমি আমার বাগ্‌দত্ত। বৃথা তোমার প্রার্থনা, বৃথা তোমার ক্রন্দন, বৃথা তোমার আহ্বান। তাই, তোমার মনকে তুমি দগ্ধ করছ নিজের ক্ষোভ দিয়ে আর হতাশা দিয়ে। তুমি চিরছ নিজেকে। আর তোমার সে হতাশা ও ক্ষোভ তোমার মস্তিষ্কের কোষগুলোকে রক্ত দিয়ে ভরে তুল্‌ছে, তোমার স্নায়ুগ্রন্থি তার তাপে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। তোমার দেহ এই বিরোধের বোঝায় ভারাক্রান্ত। তোমার আয়ু ক্ষয়ে যাচ্ছে। তুমি আমায় চাও—আর তুমি তা অস্বীকার করতে চাও; আর তুমি আমায় নিচ্ছ না,—আর তাই তোমার এই আত্মপীড়ন।

—যদি আমি তোমার বাগ্‌দত্তা হই, মায়াবিনি, কেন তোমাকে পাই না? কেন তুমি সাড়া দাও না আমার প্রার্থনায়? কেন, বলো, কেন তোমার এই বিদ্রূপ?

—তুমিই আমাকে নেও নি। অনেকদিন আমি এসেছি। অনেকবার আমি তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছি। অনেকবার অনেকদিন। অনেক অনেক বার আর অনেক অনেকদিন। অস্বীকার করো না, অস্বীকার করো না। অস্বীকার তুমি করতে পারবে না—চেয়ে দেখো পিছনে, চেয়ে দেখো তোমার ভেতরে—কত কত বার আমি এসেছিলাম। আমি আহ্বানের অপেক্ষা করি নি, তোমার প্রার্থনার জন্য আমি দেরী করি নি—এসেছিলাম নিজ থেকে প্রথম, এসেছিলাম তোমার দুয়ারে। তুমি ডাক নি তখনো, আমিই তোমাকে ডেকেছি। তুমি চাও নি—

চাইতে বুঝি তখনো জানতে না, সে প্রয়োজনও তোমার ছিল না। আমিই তোমাকে চাইছিলাম। আমিই ছিলাম তোমার সম্মুখে উপযাচিকা। চাইছিলাম তোমাকে—চাইছিলাম তোমার মধ্য দিয়ে আমাকে আর আমার মধ্য দিয়ে তোমাকে। আমি চাইছিলাম আমার প্রকাশ—আর তোমারও তা'তে প্রকাশ। তোমার প্রকাশ, তোমার আত্মপ্রাপ্তি—দলের পর দল ছড়িয়ে তোমার ফুটে ওঠা—এই, এই আমার ছিল তোমার নিকট প্রার্থনা। আর, তাই হ'ত আমারও জীবন, আমারও প্রকাশ, আমারও আবির্ভাব। তুমি আমাকে আবিষ্কার করতে, তুমি নিজকে আবিষ্কার করতে—আমি তোমার জন্য নিয়ে এসেছিলাম সেই আশীর্বাদ। এই বর আমি দক্ষিণ হাতে দেবার জন্য তোমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। আর সে কতবার, কতকাল ধরে সে অপেক্ষা!—উদয়াস্ত অতিক্রম করে আমি এসেছি—জ্যোৎস্না রাত্রিতে তারা-ভরা আকাশের তলে, আর নারকেলের মর্মরায়মান ডালের ফাঁকে, ঝাউএর ব্যথিত গুঞ্জরণের অবকাশে। কত শান্ত সন্ধ্যায়, শান্ত প্রদীপের তলে, নির্জন তোমার নিভৃত নিমেষে। কত হাস্যমুখর দিনে, উৎসবের আলোতে। কত পথের বাঁকে আর পথের ছায়ায়। কত মানুষের মুখে আর মানুষের মায়ায়—মানুষ, যা তোমার বড় নেশা, যা তোমার বড় প্রেম, যা তোমার বড় ভ্রান্তি, বড় হতাশা,—কতবার তার মুখচ্ছায়ায় তুমি আমায় দেখেছ। কত বন্ধুর মুখে, কত বান্ধবীর বুকে। কত পরিচিতের স্নিগ্ধ শিখায়, কত অকস্মাৎ চমকিত বিদ্যুল্লেখায়। কতবার আমি এসেছি, কত সহস্র সহস্রবার। তুমি রয়েছ চোখ বুজে। তুমি আমায় নেও নি। তুমি চোখ ঢেকে রয়েছ, তুমি আমায় চাও নি। আর

আমি গিয়েছি তখন ফিরে, আমি গিয়েছি মিলিয়ে, আমি গিয়েছি বাষ্প হয়ে। তবু আবার ফিরে এসেছি, আবার নির্লজ্জার মতো চেয়েছি তোমাকে; দাঁড়িয়েছি তোমাকে দেবার জন্য, তোমাকে পাবার জন্য। আর, তুমি চোখ তুলে তাকালেও না। তুমি চোখ ঢেকে রইলে, তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে। কতবার এমন হয়েছে—কতবার কত দিন, কত কত বার আর কত কত দিন।

—তখন যে আমার জীবনের প্রভাত—আমার জীবনের সূর্যালোক-ভরা সুন্দর প্রভাত। উজ্জ্বল সেই দিনগুলো। বিধাতার আশীর্বাদ সেই কৈশোর আর প্রথম যৌবন—বিধাতাব আশীর্বাদ, যা বিধাতা সবাইকে দেন। অসীম সে দাক্ষিণ্য, অতুল সে আশীর্বাদ। একেবারের বেশি বিধাতাও তা কাউকে দিতে পারেন না। বিধাতাও তা দিতে অক্ষম—একেবারের বেশি। সেই একবার-পাওয়া একটি প্রভাত আমার জীবনে তখন সবে এসেছে। বিধাতার পরম আশীর্বাদ আমার সম্মুখে তখন—সূর্য্যালোকভরা আকাশ—নীল, ঘন নীল, স্নিগ্ধ আকাশ; আর মায়াঞ্জন মাখা পৃথিবী,—শ্যামল স্নিগ্ধ পৃথিবী। জীবনে অমন নীল আকাশ আর আসে না, আর অমন শ্যামল পৃথিবী। মানুষের মুখ তার সঙ্গীদের চোখে আর অমন সুন্দর হয়ে ফোটে না, অমন রক্তাভ হয় না মানুষের বুক। নিজের অন্তরের ঘ্রাণ আর অমন করে কখনো করে না নিজেকে মাতাল, নিজেকে আর অপরকে। নিজের দেহের শিখা আর জ্বলে না অমন নির্মল আভায়, নিজের চোখের সম্মুখে আর অপরের চোখের পাতায়। সেই আমার প্রথম যৌবন,—বিধাতার আশীর্ব্বাদ। তাকে আমি অস্বীকার করতে পারি নি; তোমার জন্য আমি তা ছাড়তে স্বীকৃত হতাম না—সেই হাসি আর

গান, সেই অকারণের হাসি আর অকারণের উচ্ছ্বসিত কোলাহল; তা আমি কি করে ছাড়ব? জীবনে তা একবার আসে, মাত্র একবার। একটি মুহূর্তমাত্র জাগে আমাদের সমস্ত অঙ্গ ছাপিয়ে সেই কল্লোল, আমাদের সমস্ত মনের তটে তটে সেই জোয়ারের জয়ধ্বনি, এই বিধাতার আশীর্বাদ, দুর্লভ আশীর্বাদ,—আমি কি করে তা ছাড়ি? কেন তুমি তখন এলে? তুমি আমাকে তার থেকে বঞ্চিত করতে এসেছিলে—সেই একটিমাত্র সুন্দর প্রভাতও তোমার সহ্য হল না। সহ্য হল না আমাকে ছেড়ে দিতে বিধাতার সেই সহজ আশীর্বাদ—যা সবাই পায়, যা সবাই ভোগ করে, যা থেকে কেউ তাদের করতে পারে না বঞ্চিত। তাও তুমি আমায় ছেড়ে দিতে চাও নি। কেন তুমি তখন এলে? তুমি হলে বাধা। তুমি আমার জীবন থেকে সমস্ত আলো নিবিয়ে দিতে চাইলে—হাসির আলো, গানের আলো, বন্ধুত্বের আলো, আর প্রেমের আলো। তুমি আমার জীবন থেকে সব রঙ্ মুছে দিতে এসেছিলে—আমার উচ্ছ্বসিত হাসি, অকারণ কোলাহল, আমার বন্ধুত্ব-লোভী মন, আমার ভালোবাসার ভীরু শিহরণ, আমার উদ্দীপ্ত রাগের উজ্জ্বল আগুন। আমার চোখে আনন্দ নেচে উঠ্‌ত, আমার বুকের তলে রক্ত দোলা দিত, আমার সারা দেহে জাগ্‌ত ছন্দ। আর তুমি আমার চোখের তারায় বসে, আমার হৃদ্‌পিণ্ডের উপরে বসে, আমার মস্তিষ্কের কোঠায় বসে আমাকে তোমার কবলিত করতে চাইতে। তুমি চাইতে আমি তোমায় গ্রহণ করি, তোমায় গ্রহণ করি—আমি অস্বীকার করি আমার যৌবন, আমার বন্ধুত্ব, আমার প্রেম, আমার হাসি, আমার কোলাহল, আমার অকারণ উচ্ছ্বাস। তুমি তখন বিধাতার আশীর্বাদকে এসেছিল পঙ্গু

করতে, তুমি জীবনের সেই একটিমাত্র ঐশ্বর্যকেও চেয়েছিলে কেড়ে নিতে। তুমি ভরে তুলতে চেয়েছিলে আমার সেই প্রভাত তোমার মিথ্যা পূজায়। তোমার মায়াজাল ঢেকে দিত আমার নির্মল আকাশ—সে আকাশ তোমার অসহ্য, আমার আনন্দ তোমার অসহ্য, আমি আমার থাকব, এ তোমার অসহ্য। তুমি আমার সব কেড়ে নিতে এসেছিলে, তুমি আমার আত্মাকে চেয়েছিল কবলিত করতে, হত্যা করতে, তোমার জারক রসে নিঃশেষ করতে। সব তুমি মুছে দিতে এসেছিলে। সব তুমি চেয়েছিলে মিথ্যা করে দিতে।

—আমি এসেছিলাম নিজেকে দিতে। আর আমি এসেছিলাম, তাই তোমার প্রভাতে অত রঙ্ ধরেছিল। এসেছিলাম, তাই রঙ্ ধরেছিল তোমার যৌবনে। রঙীন হয়েছিল তোমার মন, উজ্জ্বল হয়েছিল তোমার বন্ধুর মুখ, উদ্বেল তোমার বান্ধবীর বুক। আমি এসেছিলাম তাই, শুধু তাই। শুধু তাই তুমি চিনেছিলে তোমার জীবনের প্রভাতকে, যৌবনের আবির্ভাবকে। আর আমাকে যদি গ্রহণ করতে তোমার সে নতুন প্রভাত আর ফুরোত না, বিধাতাও কেড়ে নিতে পারত না তোমার সেই অক্ষয় যৌবন, তোমার অজেয় সাম্রাজ্য। তাঁর আশীর্বাদ শেষ হত না, আমার আশীর্বাদে মিশে তা অশেষ হত। কৃতার্থ হতেন বিধাতা। বিধাতা কৃতজ্ঞ হতেন তোমার কাছে। তোমার সৃষ্টি তাঁর সৃষ্টিকে দিত অসীমত্ব, তোমার আনন্দ তাঁর ললাটে পরাত ঔজ্জ্বল্যের টীকা। নিষ্প্রভ রইল তাঁর ললাট, ব্যর্থ তাঁর সৃষ্টি—তোমার অচেতনতায়, তোমার অবহেলায়, তোমার নিশ্চেতন ভোগে। তাঁর আশীর্বাদ ক্ষণস্থায়ী হয়েছে, তাঁর আশীর্বাদ অক্ষয় হতে পায় নি। ব্যর্থ হয়েছে তাঁর আশা, তাঁর পরিকল্পনা ভেঙে পড়েছে।

বিধাতা লাজ্জিত, বিধাতা লাঞ্ছিত, ললাট তাঁর ম্লান—যে ললাটে তুমি জাগাতে পারতে আনন্দের অনির্বাণ আভা। বিধাতার আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়েছে। তুমি নিজেকে হত্যা করেছ। তুমি ভাষা পেয়েছিলে,, কথা বলো নি। তুমি কণ্ঠ পেয়েছিলে, গান গাও নি। তুমি আলো পেয়েছিলে, জ্বালো নি। বোবা পৃথিবী তোমার কাছে ব্যাকুল চোখ তুলে আবেদন করেছে, তুমি তাঁর মর্মবাণী শুন্‌লে, বুঝলে না। মানুষের প্রাণ তোমার কণ্ঠে সুর খুঁজ্‌ছিল, তুমি রইলে নীরব। সৃষ্টির রহস্য চাইছিল তোমার প্রাণপ্রদীপের স্পর্শ, তুমি তা দিতে চাইলে না। তোমার হাতে মানুষের আশা-আনন্দ ফুল হয়ে ফুট্‌ত; আমার অধর-স্পর্শে তোমার প্রেম হত রক্ত গোলাপ,—রক্তের মতো লাল, আর সুরার মতো মাদক; তোমার হাতে মানুষের অশ্রু হত অনির্বাণ আগুন, স্বচ্ছ স্ফটিক, তুষার-গলা স্রোত। তুমি পেতে বিধাতার মতো সৌভাগ্য—হাস্‌তে হাসাতে, কাঁদতে কাঁদাতে, মিলন বিরহ ঘটাতে, গড়তে ভাঙ্‌তে। তুমি পেতে সৃষ্টির শক্তি। আমি নিয়ে এসেছিলাম সে আশীর্বাদ—বিধাতার অধিকার।

—কে তুমি, মিথ্যাময়ী?—আমি আনন্দ চেয়েছিলাম, তুমি সে আনন্দের শত্রু। আমি সংগ্রাম চেয়েছিলাম, তুমি সেই সংগ্রামে বিমুখ। আমি সত্য চেয়েছিলাম, তুমি সত্যের বিরোধী। সেই প্রথম যৌবনেই তোমার আবির্ভাবে আমার আনন্দ শূন্যে মিলিয়ে গেল। পৃথিবীর সবাই যা পায় তুমি আমাকে তা দিতে চাইলে না। সবাই হাসে আর গায়, প্রেম করে, ভালবাসে, সবাই সুখী আর সবাই অসুখীও। তুমি আমাকে এই মানুষের সাধারণ ভাগ্যটুকুও দিতে চাইলে না। শুধু সামান্য কয়েকটি দিনের জন্য, যৌবনের দিন

কয়টির জন্য, আমি চেয়েছিলাম এই সুখ আর দুঃখ। সহজ আর মানবীয় এই সুখ দুঃখ—তুমি তা রহস্যময় করে তুল্‌লে। কিছুই সহজ রূপে আমাকে পেতে দিলে না—জীবন নয়, যৌবন নয়, পৃথিবী নয়, মানুষ নয়, বন্ধুত্ব নয়, ভালবাসা নয়—কিছুই সহজ নয়। তুমি সব করে তুল্‌লে বিস্ময়কর, সব করে দিলে রহস্যময়, আমাকে করে তুল্‌লে অস্থির, অ-মানবীয়। আমি শুধু সেই কয়দিনের মত চেয়েছিলাম নিজের আনন্দে নিজেকে পেতে। শুধু যৌবনের কয়টি দিন! কত ছোট সেই দিন কয়টি, আর কত স্বল্প তা। পলক না ফেলতে তা পালিয়ে যায়। তারপর আমি মেনে নিতাম সব, মেনে নিতাম তোমারও দাবি। জীবনের ভাদ্র-রাতে তোমার জন্যই না হয় আমি বসে থাকতাম দুয়ার খুলে, প্রহর গুণে।—তখন আমার দিনগুলো, দেখো, কত ভরাট, কত জমাট হবে। কৈশোরের চাঞ্চল্য আর যৌবনের বিক্ষোভ আমার প্রাণকে তখন আর মথিত করবে না। তখন আমি ভরা-নদীর মতো কানায়-কানায় ভরা। প্রশস্ত, গভীর, প্রশান্ত সেই যৌবনান্তের পরিণত বয়স। তার মর্যাদা আর মাধুর্য সবই আমি তোমার জন্য মনে মনে উৎসর্গ করে রেখে দিতে পারি—সেই পরিপূর্ণ দিনরাত আমি শান্ত আবেগে স্বপ্ন-স্মৃতিতে ভরে তুলব। আমার পরিণত বয়স তোমার নামে থাকবে সঙ্কল্পিত। তবু, তবু তুমি এলে আমার সেই যৌবনের জোয়ারের মধ্যে তোমার স্বপ্ন নিয়ে—সহজ আনন্দের হাট বারে বারে তুমি ভেঙে দিলে। তুমি আনন্দের শত্রু, তুমি বিধাতার শত্রু—যে বিধাতা আনন্দের দেবতা। তুমি মানুষের শত্রু—যে মানুষ সত্য, আর জীবন্ত।

—সেদিন আমি এসেছিলাম বলে তোমার জীবনে আনন্দ

এসেছিল। আমাকে অস্বীকার করলে বলে তোমার যৌবন অসম্পূর্ণ রয়ে গেল—তোমার মানুষের প্রেম হারাল তার ভবিষ্যৎ। আমি এসেছিলাম বলে তোমার জীবনে বিপ্লবের বেদনা জেগেছিল। ব্যর্থ হয়েছে যতবার আমার আগমন, ব্যর্থ হয়েছে তখন তোমারও যৌবন।

—ব্যর্থ হয়েছে আমার যৌবন?—যে যৌবনকে আমি রক্তশতদলের মত ফুটিয়ে তুলেছি, যাকে আমার জীবনের হাতে তুলে দিয়েছি রক্তময় অর্ঘ্য? তুমি জানো না সে কত বড় সৌভাগ্য, সে কত বড় সার্থকতা। সেদিন যৌবন আমার; জানলাম আমি যৌবনের যুবরাজ—আর আমি ভালোবাসি। আমি কথা ভালোবাসি, আমি ভালো-বাসি কবিতা; ভালোবাসি হাসি, আনন্দ; ভালোবাসি রূপ আর রস; গন্ধ আর শব্দ, ভালোবাসি প্রেম আর প্রাণ। জান্‌লাম, আমি আরও কত কিছু ভালোবাসি। কত বেশি ভালোবাসি আরাম আর আলাপ, হাসি আর উৎসব, মান আর মর্যাদা, সুবিধা আর সুযোগ।—কোন কিছুই তবু আমার সেই ভালোবাসার সীমা টেনে দিতে পারল না। আমি ভালোবাসি, দুঃসাহসী সে ভালবাসা আমার। কত বড় সৌভাগ্য সে, কত বড় সার্থকতা। তাকে আমি ছোট করতে দোব কেন? আমার ভালোবাসা দুই বাহু মেলে দিলে—আকাশকে আলিঙ্গনে টেনে নিলে। আমার ভালোবাসা দুই বাহু মেলে দিলে—পৃথিবীকে বুকে টেনে নিলে। দুই হাত পেতে দিলাম আমি—জীবনের ধারা আমার অঞ্জলি ছাপিয়ে গেল। আমি পেলাম—আমার আত্মার আত্মীয়কে, মানুষকে। সে কী দিন! কী আনন্দ আর উৎসবের দিন! কী স্পর্ধার আর সংগ্রামের দিন! বুঝলাম, আমি ভালোবাসি পৃথিবীকে, মানুষকে; বুঝলাম, আমি ভালোবাসি জীবনকে। আমার

যৌবনের মধ্যদিন তখন ; তুমি স্বপ্ন হয়ে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে। বল্‌লে, 'আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।' তুমি কবিতা হয়ে আমার সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌লে—সমুদ্রশিয়রে উর্বশীর মতো,—বল্‌লে, 'আমি তোমাকে চাই।' আরাম এলো, আয়াস এলো, এলো হাসি আর পরিহাস, আমার জন্ম সহচর ; এলো মান আর মর্যাদা, আমার দুর্লভ অতিথি ; এলো স্বাচ্ছন্দ্য আর প্রশান্তি, মানুষের পরম কাম্য ; এলো আমার প্রীতি আর স্নেহ, আমার প্রিয়া আর ভবিষ্যৎ সন্ততিরা, এলো সেই অমৃতের পুত্ররা তাদের জন্মের দাবি নিয়ে—আর এলে তুমি,—কে তুমি মিথ্যাময়ী ? স্বপ্ন লয়ে, কবিতা লয়ে, বল্‌লে, 'না, না, না; তুমি আমার।'—বাইরে তখন পৃথিবীতে বেদনার বান ডেকেছে, মানুষের ইতিহাসে ঝড় উঠেছে, জীবনের জয়পথে নেমেছে আঁধি। আমি বুঝলাম—আমি ভালোবাসি, আর দুঃসাহসী আমার ভালোবাসা। ভালোবাসি পৃথিবীকে, ভালোবাসি মানুষকে। আমি চাই তার নবজন্ম, চাই বিপ্লব, চাই সংগ্রাম। স্বপ্নের অরূপায়তনে আমি আবদ্ধ থাকব না, কবিতার কল্পলোকে আমি পথ হারাব না—আমি পৃথিবীকে অস্বীকার করব না, মানুষকে অস্বীকার করব না, অস্বীকার করব না আমার দেশকে, আমার কালকে ; অস্বীকার করব না পীড়ন আর এই বেদনা ; অস্বীকার করব না ইতিহাস, আর অস্বীকার করব না বিপ্লব আর তার বিজয়। আমি অস্বীকার করব না—অস্বীকার করব না। কে তুমি জানি না,—কে তুমি মায়াবিনী, জানি না আজও,—কিন্তু বিধাতাকে ধন্যবাদ, আমি বিপ্লবের আহ্বান শুনেছি। আমি মানুষকে অস্বীকার করিনি, পৃথিবীকে পেয়েছি, জীবন থেকে পালাই নি। বিধাতাকে ধন্যবাদ, আমি যৌবনের স্বপ্নরাজ্যে বন্দী হইনি,

বন্দী হইনি তোমার স্বপ্ন আর কবিতার কারাগারে; গেয়েছি জীবনের জয়গান; স্বপ্ন দেখেছি মানুষের মহিমার।

—আর আমিই সেই মানুষের মহিমার আভাস, সেই জীবনের জয়গান; আমিই সেই বিপ্লবের উৎসমুখ, অভিযানের অগ্রদূত।

—তুমি? তুমি তো স্বপ্ন, মিথ্যা তুমি, শুধু পলায়ন;—মিথ্যা স্বপ্নলোকের মায়া তুমি, আমি বিপ্লবের যাত্রী সত্যলোকের, যাত্রী বাস্তবের পথে।

—হাঁ, আমি স্বপ্ন—যে স্বপ্ন সত্য হয়ে ওঠে, যে স্বপ্ন সত্যের অগ্রদূত। আমি স্বপ্নদৃষ্টি, আর আমিই সত্যদৃষ্টি—দৃষ্টি অন্ধকারের পারে, সৃষ্টির অন্তঃপুরে। তুমি জীবনকে গ্রহণ করো, আমি সত্যদৃষ্টি হয়ে উঠি; তুমি জীবনকে পাওনা, আমি স্বপ্নদৃষ্টি হয়ে ফিরে বেড়াই। আমি রূপলাভ করি—সত্য জন্মলাভ করে। তুমি সত্যকে নিলে না। জীবনকে তুমি সত্য করে নিলে না। তুমি বস্তুকেই দেখেছ, কিন্তু দেখেছ শুধু তোমার আধ-খোলা চোখে, আধ-বন্ধ চোখে। বস্তুকেও তাই দেখলে ভুল করে, ন্যুব্জ করে; জীবনকে তাই দেখলে ভুল করে, কুব্জ করে। তুমি ভুল করলে। পৃথিবীর মাঝখানে তুমি অন্যায় দেখলে, অসামঞ্জস্য দেখলে, দেখলে মৃত্যুর পীড়া। সত্যই তুমি তা দেখেছ; আর যা তুমি দেখেছ, তাও সত্য। তুমি দেখেছ ইতিহাসের এই পাতাশেষের পাণ্ডুরতা, সভ্যতার আয়ুঃশেষের দীর্ঘশ্বাস, দেখেছ মানুষের ম্লান ললাট। দেখেছ আর ব্যথা পেয়েছ। দেখেছ আর জেনেছ—ইতিহাসের নূতন পাতা খুলছে, সভ্যতা নূতন দেহ ধারণ করছে, মানুষের ললাটে নূতন সূর্যের চুম্বন আঁকা। দেখেছ সত্যই, দেখেছ সে সত্যকে। কিন্তু জানলে না যা তাও সত্য। নূতন সত্য জন্ম নিতে চায়।

আর যেমন আমাকে করলে অস্বীকার, অস্বীকার করলে সেই সৃষ্টিময় সত্য।

—তুমি তো সত্য নও, স্বপ্নময়ী, সত্যের অস্বীকৃতি। তুমি তো বাস্তবকে সহ্য করতে পার না, তুমি যে স্বপ্ন, স্বপ্ন গড়। তুমি এক কথার জগৎ খুলে দাও—সেখানে মানুষ আসে, দুঃখ আসে, সুখ আসে, হাসি আসে, আসে কান্না, আসে বেদনা, পীড়ন, গভীর গ্লানি, দুঃসহ মর্ম্মপীড়া, বীভৎস বিকৃতি, ব্যভিচার। সবই আসে, জীবনে যা যা আছে সবই আসে। কিন্তু আসে না সেই সকলের আশ্চর্য সমাবেশ—এই বাস্তব, আর আসে না তাই জীবন। কথার সেই লোকে তাই আছে ছায়া, জীবনেরই ছায়া—তবু তা জীবন নয়। পৃথিবীরই প্রতিলিপি—তবু পৃথিবী নয়। দেখেছি, তুমি আমার সাম্‌নে ধরো জীবনের মুকুর—কিন্তু জীবন তখনো থাকে আমার পিছনে। যতই মুকুরের ছায়াকে দেখি ততই জীবনের দিকে পিছন ফিরে থাকি। এই তোমার মায়ালোক, তোমার সৃষ্টিলোক—ছলনা; এ তো স্বপ্নলোক, সত্যলোক নয়। যেই হও তুমি, তুমি সত্য নও। তোমার ছায়ালোকের পথ গেছে আরও আরও দূরে, আকাশে, অবাস্তবে। সে স্ফটিকের স্বপ্ন—গজদন্ত-সৌধ-শিখর। তার প্রাচীরে প্রাচীরে জীবনের রূপ-কথা, তার প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে অপার্থিব রূপের হাট, তার ভিত্তিতে শিখরে মানুষের ছায়াদেহ, মোহ আর মায়া। কিন্তু সেখানে জীবন কই? বাস্তব কই? সত্য কই? বাস্তব সেখানে ঢুকলে স্ফটিক-প্রাচীরে কপাল ঠুকে দুর্দশাগ্রস্থ হবে, আর তাতে সেই কল্পলোকের ঝরণায় ঝরণায় কাব্যকাকলি বেজে উঠ্‌বে হাসিতে পরিহাসে। সে যে অবাস্তব লোক,—সে তো সত্য নয়। আমি যে সত্য চেয়েছি।

প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে, কঠিন কর্মের মূল্য দিয়ে আমি সত্যকে সঞ্জীবিত করছি। বিধাতাকে ধন্যবাদ, আমি তাঁকেও অস্বীকার করেছি, সত্যকে অস্বীকার করি নি; বিধাতাকে অস্বীকার করেছি, মানুষকে অস্বীকার করি নি।

—তুমি সৃষ্টিকে অস্বীকার করেছ, আর তাই অস্বীকার করেছ সত্যকে, জীবনকে, মানুষকে—আর তাই বিধাতাকেও। এই জীবনের যাত্রাপথে তুমি পা বাড়িয়েছ—কিন্তু পথ দেখে নয়, লক্ষ্য চিনে নয়, পাথেয় জেনেও নয়। পথ তার অভিযানের। তার প্রতি ধূলি-কণায় সংগ্রাম আর সংগ্রাম,—বিধাতার হাত থেকে মানুষের রাজ্য জয় করে নেবে সে, প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে সে। পাথেয় তার সৃষ্টিশক্তি। সে শক্তি তার তীর হয়ে দেখা দিয়েছে, পশুপতি হয়ে উঠেছে মানুষ। সে শক্তি তার হল-রূপ নিয়েছে, বলদেব রূপে দেখা দিয়েছে মানুষ। সে শক্তি তার চক্ররূপে চল্‌ল, দেখা দিল চক্রেশ্বর মানুষ। সে শক্তি বিদ্যুৎশিখাকে করলে বশ, দেখা দিলে বজ্রধর মানুষ। সৃষ্টি এমনি করে গড়েছে সত্য, সৃষ্টির স্বপ্ন এমনি করে হয়েছে বাস্তবের সত্য। সৃষ্টি সার্থক হয়েছে তাই তীরে আর হলে, চক্রে আর বিদ্যুতে। তীরের স্বপ্ন মানুষ দেখেছে, তাই তীর দেখা দিল। শস্যের স্বপ্ন সে দেখল—দেখা দিল হল। স্বপ্ন দেখেছিল, তাই সত্য হল চক্র, সত্য হল বিদ্যুৎ। সৃষ্টির শক্তি ফুটল সৃষ্টির স্বপ্নের মধ্য দিয়ে।—সেই সৃষ্টির শক্তি ছিল তোমার বুকে, আর আমি এসেছিলাম সৃষ্টির এই স্বপ্ন নিয়ে, বাস্তবের আগে আগে সত্যের আহ্বান নিয়ে—যেমন এসেছিল বাল্মীকির প্রাণে রাম জন্মাবার পূর্বে রামায়ণ-স্বপ্ন। আর তাই জন্মালেন রাম, দেখ্‌ল পৃথিবী রামরাজ্য।

আমি স্বপ্ন রচনা করতাম, আমি সৃষ্টি বিকাশ করতাম—তাই হত সত্য। আমি আভাস নিয়ে আসি,—আর বাস্তব অমনি তার আদর্শ পায়। এই পাথেয় আমি নিয়ে আসি, নিয়ে এসেছি বরাবর।—দেখ্‌ছ কত জটিল হয়েছে আজ সংসার—ছোট বড়, লোভী ধনী, ক্ষুধিতের হতাশের সংসার। কত বিচিত্র মানুষ, আর কত বিচূর্ণ মানুষ, আর কত তার বিচূর্ণ বৈচিত্র্য। সব চূর্ণ, সব শূন্য। তাই সৃষ্টি চাই, সত্য জন্ম নিচ্ছে; আলো চাই, সূর্য উঠ্‌ছে। আর আমি এলাম সেই সূর্যের স্বপ্ন, আলোর আগমনী।

—কিন্তু আমি নিশীথের যাত্রী, আমি স্বীকার করেছি আলোর দাবী, কিন্তু আমি অন্ধকারের অস্তিত্ব। আর বিধাতাকে ধন্যবাদ—আমি আমার মনুষত্বকে খণ্ডিত করিনি। সংগ্রামকে অস্বীকার করি নি, বিপ্লবকে মেনেছি।

—তুমি আপন আত্মাকে খণ্ডিত করেছ। দেখো নি প্রভাতের দাবী, অন্ধকারের সাক্ষ্য। সত্য, তোমার সাম্‌নে ছিল পৃথিবী—দশজনের পৃথিবী,—এই ভাঙা-চোরা, ছেঁড়া-টুক্‌রা, অন্যায়-ভরা, অচল-পারা—এই তো সকলের পৃথিবী। সে পৃথিবীর মানুষ তুমিও, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ঘরেরই সন্তান—পড়েছ ইংরেজি, পড়েছে সেক্‌সপীয়র, মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথ। জেনেছ পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরকে, দেখেছ ইউরোপের জয় আর বিজ্ঞানের বিস্ময়। এই দশজনের পৃথিবীর মানুষ তুমিও—যেমন মানুষ বাংলাদেশের ভদ্র সন্তান। কিন্তু তোমারও নিজের ছিল এক বিশিষ্ট সত্তা—জন্মসূত্রে পাওয়া সেই বিশিষ্টতা। সেখানে তুমি ছিলে আমার জন্য উৎসর্গ করা, বাগ্‌দত্ত। তোমার সে সত্তাও মুহূর্তে-মুহূর্তে দশজনের পৃথিবীর সঙ্গে নূতন নূতন পরিচয়ে আবার আপনার কত কত

স্বরূপ জানতে পেয়েছে, দশজনের পৃথিবীর ঘাত-প্রতিঘাতেই সে সত্তাও হয়েছে সমৃদ্ধ। তাই দেখেছ—বিচিত্র বিস্ময় জীবনের। দেখেছ ছোট ছোট মানুষের জীবনের বড় মুহূর্ত—যখন সে নিজেকে দেয় নিঃশেষে। দেখেছ বড় বড় মানুষের জীবনের ছোট মুহূর্ত—যখন সে নীচ হয় নিঃসঙ্কোচে। দেখেছ—তোমার আপনার আদর্শবাদিতা আর তেমনি ভীরুতা। দেখেছ এই দেয়াল-ঘেরা সমাজের মধ্যে তোমার পঙ্গুতা, সকলের পঙ্গুতা আর সকলের ব্যর্থতা। আর দেখেছ—সুমহৎ সম্ভাবনা, শুনেছ রুশদেশের কথা, জেনেছ মানুষের নবজন্মের বার্তা। আর তাতেও সমৃদ্ধ হয়েছে আবার তোমার সত্তা, আর গড়ে উঠেছ তোমার ব্যক্তিস্বরূপ। তারই সমৃদ্ধিতে আবার দশজনের জগৎকে তুমি দেখছ নূতন আর এর আয়তনে, নূতন রহস্যে। দেখছ পৃথিবীর কেমন দেহান্তর ঘটছে। এ দেখাও বাস্তব, কিন্তু আবার তা স্বপ্ন দেখাও। পৃথিবী দশজনেরই জগৎ এখনো, কিন্তু তোমার উপলব্ধিতে তা আবার নূতনও। সে দশজনেরই জগৎ এখনো, তোমার সত্তার মধ্য দিয়ে কিন্তু সে আবার রূপান্তরিত হয়েও চলেছে। তুমি তোমার এই সমৃদ্ধ সত্তাকে ভাষা দাও—যে তুমি সেক্সপীয়র পড়েছে, রবীন্দ্রনাথ পড়েছ, জেনেছ রুশদেশের কথা,—তুমি আত্মপ্রকাশ করো, দশজনের পৃথিবী অমনি তোমার সেই সৃষ্টিকে করে নেবে অঙ্গীকার, করে নেবে অঙ্গীভূত—পৃথিবী রূপান্তরিত হবে। তুমি আত্মপ্রকাশ করতে থাকো, আর অমনি তুমি করবে আমাকেও আত্মদান; তুমি দশজনের পৃথিবীকে আত্মসাৎ করবে, আর করবে অমনি পৃথিবীকেও আবার আত্মদান। আমার দু হাত ভরা দান আর পৃথিবীর অবদান, স্বপ্নের স্বাক্ষর আর পৃথিবীর প্রমাণের পুঁজি—

সব মিলে জন্ম নেবে তোমার সৃষ্টি। আর, তার ফলে সৃষ্টির পুঁজিতে তুমিও জোগাবে এক মুঠো সোনা। আর এই সোনা সত্য, মানুষ তা পড়বে আর তার অন্তরলোক তাতে মথিত হয়ে উঠ্বে—তাতে নূতন আশা জন্মাবে, নূতন স্বপ্নে রূপ নেবে তোমার সৃষ্টি, তাদের ঘুমন্ত প্রাণাবেগকে করবে সৃষ্টিমুখী—করবে আনন্দে দুঃসাহসী, সংগ্রামে উন্মুখ, আর সৃষ্টিতে দৃঢ় সঙ্কল্প। তুমি সৃষ্টি করবে—আর ইতিহাস আরও সৃষ্টিমুখী হয়ে উঠ্বে। সৃষ্টি এমনি বিপ্লবী শক্তি, এমনি বিপ্লবী সম্পদ সত্য—মানব মহাকাব্যের বাল্মীকি-স্বপ্ন।

—কোথায় আমার সেই শক্তি? কোথায় সেই ঐশ্বর্য? লেখা ফোটে কই? না, না, মিথ্যা তোমার মন্ত্রণা। কেই বা নিবে আমার কথা? কতখানি নেবে তারা? সবাই কি সব নিতে পারে? পারে না। আমার যে জন্মবন্ধু মানব-সমাজের জন্মতত্ত্ব দেখেনি—সে তোমার এই দান নেবে কি করে? যে মানব-সন্তান বিজ্ঞানের বিজয়যাত্রা বোঝে নি, সে বুঝবে কি করে মানবমহিমার কথা? যে কবি দেখে নি মানুষের শিকল ছিঁড়ে পড়তে, সে মহামানবের মুক্তির আশ্বাস মানবে কি করে? যে কবি পদে পদে ভয়চকিত, ফিরে যেতে চায় অতীতে—মন-গড়া অতীতে,—আচারে, সংস্কারে, জাতীয় 'রক্তের গর্ব' ও মোহতে,—সেই বা মহামানবের মিলন-গাথায় কান দেবে কেন? আর যে হতভাগ্য চিনে পয়ার আর পাঁচালি, কি বড় জোর পুরাণের গল্প, সেই বা আমার কথা আর সঙ্গীতের ভঙ্গিতে ও আঙ্গিকে স্বস্তি পাবে কি করে?

—সবাই নেবে না। সবাই তো তারা মুক্তি-পথিক নয়। আর সর্বাংশে তুমিও মুক্তিযাত্রী নও। তুমি যে পরিমাণে মুক্তিপন্থী

হবে সে পরিমাণে মুক্তির পথিক তোমাকে বুঝবে। তোমার ভাষা ভাবভঙ্গি যতটা সৃষ্টিধর্মী হবে ততটাই তবু একেবারে গিয়ে নাড়া দেবে তাদের অন্তরাবেগে—নাড়া দেবে জীবনমূলে। আর যত গভীর হবে তোমার সেই সৃষ্টিবেদনা, তত তা ছাড়িয়ে যাবে তোমার চারদিক্‌কার পরিধি, তত স্পর্শ করবে প্রাণবান মানুষকে, সৃষ্টিধর্মী মানুষকে, এ জগতের কারুবিদ্‌কে কারিগরকে।—গণ্ডীর বালাইও তত যাবে চুকে। তুমি যতটুকু চক্ষে দেখো, ততটুকু শুধু দেখে তোমার গণ্ডীর বন্ধুরা। যতটুকু দেখো, ততটুকুই যদি তোমার উপলব্ধি তা হলে গণ্ডীর বাইরে তোমার স্থান নেই—সে সৃষ্টিও সকলকার হয় না। সকলকার হয় তা যেখানে থাকে তাতে সর্বমানুষের সহজ প্রেরণার কথা—মৃত্যুর কথা, জন্মের কথা, প্রেমের কথা; আর কথা জীবনের অভিযানের আর মানুষের মুক্তির—যেখানে তুমি জেনেছ জীবন, চেয়েছ মানুষকে, দেখেছ বাস্তবের ইঙ্গিত—দেখেছ স্বপ্ন, বুঝেছ সত্য। যেখানে আমি এসেছি, সেখানে তুমি মানুষকে পাও। আর তাই সে স্বপ্ন হয় বিপ্লবী—সৃষ্টিমুখী। আর কথা ও লেখাও হয় বিপ্লবী।—তুমি লেখো—সেই লেখা লেখো। আমাকে নাও, নিজেকে দাও। আমাকে নিলে একদিন তোমার যৌবনের উদ্বেল সত্তার সাক্ষী হতাম আমি। তারপর, তোমার জীবনের উদ্বুদ্ধ চেতনার ভাষা হতাম আমি। আর শেষে, তোমায় আত্মদানের সংশুদ্ধ আনন্দের বাণী হতাম আমি।—আর আমাকে নিলে না, মানুষকে নিলে না, সৃষ্টিকে নিলে না, নিলে না সত্যকে বারবার।

—না, না। তখনো আমি ত্রিশের নীচে, তখনো আমার মন অস্থির আবেগে আত্মহারা তখনো তো লেখার স্বপ্ন দেখেছি,

লেখাকে রূপ দিতে পারি নি। সে কথায় বাণী ছিল কি? সে স্বপ্নের মানে ছিল কই?—সে শুধু অকারণে ফুটে ওঠা ফুল, শুধু রঙ, শুধু রঙ্!—মিথ্যাময়ী, সে তোমার ছলনা।—আমি তখনো ত্রিশের নীচে, আজ আমি ত্রিশের এপারে। আর আমি প্রতারিত হব না,—আমি কাজ চাই। আজ আমি পঁয়ত্রিশের সীমায় দাঁড়িয়ে, আজ আমি চল্লিশের চূড়াও দেখতে পাচ্ছি। তা অধিরোহণ করতে পারব কিনা জানি না। আমার পা ভেঙে পড়ছে, দেহ অবসন্ন। কিন্তু শ্রান্ত আমার মন শুধু দেহভারে। নইলে তার তীক্ষ্ণতা সে হারায় নি। তার প্রার্থিত গভীরতা সে লাভ করেছে। তার ধ্যান-নেত্রে সে দেখেছে মানুষের বিশ্বরূপ। এই পরম পরিণতির জন্যই আমি অপেক্ষা করেছি, তা তুমি জানো। ছয় বৎসর পূর্বে, ষোল বৎসর পূর্বেও জানো—জীবন-রহস্য আজ আমার অনুভূতিতে উপলব্ধিতে সত্য হয়ে উঠছে। অস্থির আবেগে তা পাক খাচ্ছে না, যৌবন-মত্ততায় তা ফেনিয়ে যাচ্ছে না, আমার প্রেমে আর কামনায় তা বিক্ষুব্ধ নয়। আমার চিত্ত আজ সচেতন। আমার প্রেম আর কামনা আজ আপন সীমানায় আপনি সম্পূর্ণ। ইতিহাসের ইঙ্গিত আজ আমি স্পষ্টতর পড়তে পাচ্ছি। আমার হাসি তাই আজ করুণায় উজ্জ্বল, অভিজ্ঞতায় শান্ত, সংকল্পে শুভ্র। মানুষের আলিঙ্গন আজ আমার বুকে। কিন্তু মায়াবিনী, ভাষা কই? কথা কই? তুমি স্বপ্ন হয়ে আস, সোনার হরিণ হয়ে আস, ঘুমন্ত রাজকন্যা হয়ে থাক—মানুষ হয়ে তো আস না, ফুটে ওঠ না আমার মনে, রূপ গ্রহণ করো না আমার চেতনায়। আমি শুধু খুঁজি আর খুঁজি —তুমি মায়াই থাক, সত্য হও না। এসো, মায়াময়ী তুমি রূপময়ী হও।

আমাকে স্বপ্নে ভাসিয়ে দিও না, ভাষায় রূপ দিতে দাও। আনন্দময়, সংগ্রামময়, সকরুণ গরিমায় আমার জীবনকে এবার করি প্রকাশ —প্রকাশে প্রেরণায় সমুচ্ছ্রিত পতাকার মত হোক আমার জীবন।

—আমি তাই অনেকবার এসেছি,—অনেকবার, অনেকবার। অস্বীকার করো না, অস্বীকার করতে পারবে না। মনে করো, ছ' বছর আগেকার কথা। মনে করো সেই সমুদ্রতীরের দিন, 'পল্লব'-পাষাণের পদচ্ছায়া, মনে করো কন্যাকুমারী, মনে করো নীলগিরি। আর মনে করো সেই শীত-বসন্তের প্রভাত-সন্ধ্যা—যখন শিমূলের ডাল লাল হয়ে উঠেছিল। লাল হয়ে উঠেছিল তোমার মন ছন্দের ফুলে, গীতে, গানে গন্ধে। সেদিন প্রতি পদক্ষেপে তোমার কবিতার লাইন মনে আসছিল। সেদিন শব্দের সঙ্গে শব্দ উঠ্‌ছিল তোমার মনে ছন্দে ভরে। সেদিন তুমি ভাবতে পার নি, কথা বল্‌তে পার নি, ক্লাশের পড়া পড়াতে পার নি—তোমার মনে ছন্দের কাকলি, তোমার আত্মায় আনন্দ-শিহরণ, ছাপার অক্ষরে স্বপ্নমায়া। সেদিনও তুমি আমাকে নিলে না। মাত্র ছ' বৎসর পূর্বে। তখনও তোমার হাত রাখলে ঢেকে। তোমার হাতে সেদিন আমি ফুল হয়ে উঠ্‌তে পারতাম, আমি প্রদীপ হয়ে উঠ্‌তে পারতাম, আমি মশাল হয়ে উঠ্‌তে পারতাম। তুমি আমাকে অস্বীকার করলে, তুমি আমাকে অস্বীকার করলে। আমি এলাম আবার তোমার দুয়ারে আগুনের আহ্বান হয়ে—তোমার শিরায় শিরায় বিপ্লবের আগুনের ধারা আমি ঢেলে দিলাম। তোমার চোখে ছোঁয়ালাম—আমার বিপ্লবী স্বপ্ন। তুমি মেতে উঠলে, পৃথিবীকে দেখলে, মানুষকে চাইলে, চিনলে জীবন। চিনলে না তখনো আমাকে, চিনলে না তোমার নিজ পরিচয়, চিনলে না মানুষের ভবিষ্যৎ।

—কে তুমি? সে তো স্বপ্ন ছিল, ছিল অসম্ভব আশা। কন্যা-কুমারীর সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি হিমাদ্রি দুহিতাকে,—কুমারী ভারতবর্ষ সে, সে সাত সমুদ্রের তীরে কুমারীর ধ্যানে অপেক্ষমাণা। সে স্বপ্নের মূল্য আমি দিয়েছি—দোব। কিন্তু স্বপ্নকে রূপ দান করি কি করে?—অপরূপা, কোথায় রূপ? কোথায় রূপ? তুমি জানো তার রহস্য? তবে রূপ দাও, এসো আজ। এসো আজ। আমার দেহ বোধ হয় শুকনো ডালের মতো তোমার হাওয়ায় ভেঙে পড়বে। আমার স্নায়ু, শিরা-উপশিরা ছেয়ে বোধ হয় তোমার স্পর্শ তুলবে তীব্র উত্তেজনা। আমার শ্রান্ত হৃদ্‌পিণ্ড তোমার মুঠোর মধ্যে হয়ত সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। তবু তুমি এসো—মায়া থেকো না। আমার মন, দেহের বিদ্রূপে আর বিরোধে ক্লান্ত; আমার মন চায় রূপ। তার সঞ্চয় তুমি গ্রহণ করো, তার আহরণ আর তার ঐশ্বর্য। তুমি বাণী হও, তুমি বাণী হও। তুমি রূপ গ্রহণ কর। আমার ভাষা যেন স্বচ্ছ হয়, স্থির হয়, দীপ্ত হয়। আমার ভাষা যেন ক্লিষ্ট না হয়, বেঁকে না যায়, টলে না পড়ে। মন যেন পরাজিত না হয় দেহের কাছে। ভাঙা দেহ যেন ভেঙে চুরে না দেয় তার কথা। স্নায়ু যেন কবলিত না করে সত্তাকে।—কে তুমি? স্পষ্ট হও, স্বচ্ছ হও, স্থির হও, আলো হয়ে জলে ওঠ, ফুল হয়ে ফুটে ওঠ, ঝর্ণা হয়ে ঝরে পড়। —দেবে তুমি আমাকে এই রূপদৃষ্টি? দেবে আমাকে এ বিধাতার বর? আমাকে বিধাতা করবে, স্রষ্টা করবে—সৃষ্টির দেবতা, কে তুমি?—আমার দৃষ্টিকে বারবার করেছ স্বপ্নময়,—সে স্বপ্ন হবে সত্য? কে তুমি চিরদিনকার মায়াময়ী?—উর্বশী না শ্রী? কে তুমি? রাজকন্যা না মায়াবিনী? স্বপ্ন না সত্য? কে তুমি?

—স্বপ্ন আর সত্য। আমাকে না চিন্‌লে আমি স্বপ্ন হয়ে থাকি, আমাকে চিন্‌লে আমি সত্য হয়ে উঠি। তুমি জীবনকে গ্রহণ না করলে আমি স্বপ্ন হয়ে আকাশে উড়ে যাব, তুমি জীবনকে গ্রহণ করলে আমি সত্য হয়ে রূপলাভ করব।

—কে তুমি, রহস্যময়ী?

—আমি কল্পনা।

বক্‌সা,
১৯৩৩